ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

Ebong Prantik

এবং প্রান্তিক

An International Refereed Multi-Disciplinary Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Vol. 7th Issue 1st, January, 2020

বিশ শতকের সমাজ সাহিত্য

সম্পাদক
আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

An International Refereed Multi-Disciplinary Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Vol. 7th Issue 1st, January, 2020

সম্পাদক

আশিস রায়

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
An International Refereed Multi-Disciplinary Journal (ISSN : 2348-487X), Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150, Vol. 7h Issue 1st, Jan. 2020, Rs. 250/-
E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com
Website : http://ebongprantik.wordpress.com

প্রকাশ
৭ম বর্ষ ও ১ ম সংখ্যা
৬ জানুয়ারি, ২০২০

ISSN : 2348-487X

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য
২৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, ড. সনৎকুমার নস্কর,
ড. বিকাশ রায়, ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক

ড. আশিস রায়

সহ-সম্পাদক

টুম্পা রায়

সম্পাদনা সহযোগী

ড. অচিন্ত্য চ্যাটার্জি (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. অলকেশ দত্ত রায় (বৈজ্ঞানিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, বোস্টন),

ড. তানিয়া হোসেন (ওয়েসদা বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. সৌমিত্র বসু (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. হোসনে আরা জলী (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. মোনালিসা দাস (কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. চন্দন আনোয়ার (নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়),

ড. দীপঙ্কর মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন: ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৬০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website : http://ebongprantik.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

দ্বন্দ্বসংঘাতময় আধুনিক মানুষের কাব্যনাটক : বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা'
হোসনে আরা জলী ৯

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে মিথ
প্রসূন মাঝি ২১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও বিশশতকের মধ্যবিত্ত
স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায় ৩০

সংস্কৃতির রাজনীতি ও ভারতের জাতীয়তাবাদ : নব চিন্তাবিদ গোপাল হালদার
অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬

চল্লিশের প্রেক্ষাপটে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা
উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল ৪৫

মনন, প্রতিরোধ ও কবিত্বের এক টুকরো রবীন্দ্র-প্রাঙ্গণ
নির্মাল্য মণ্ডল ৫২

রহিমের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকট
টুম্পা রায় ব্যাপারী ৫৮

স্বাধীন ভারতের ঔপন্যাসিকদের কথায় আদিবাসী জনজীবন
মাধব মোহন ঘরামী ৬৪

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে যাত্রাপালাকার অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চা
টুনুরানী বেরা ৭০

লৌকিক দৃষ্টিতে ওয়ালিউল্লাহ
সৌগত চট্টোপাধ্যায় ৭৮

হাটেবাজারে: বিহারের অবাঙালি অন্ত্যজশ্রেণির জীবন আলেখ্য
অশোক মণ্ডল ৮৩

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী নারী
অরুণাভ মুখার্জ্জী ৯০

ওড়িয়া হরফে রবীন্দ্রসাহিত্য : বিবরণ উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ
শান্তনু দলাই ১১৩

সুন্দরবনের পীর পালার গান
মলয় দাস ১৩০

বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ
মিজানুর রহমান ১৩৬
'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের অন্তর্গঠন
সোমা ভদ্র রায় ১৫০
বিভূতিভূষণ ঃ কথাসাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষ
মাধব সরকার ১৬১
স্বর্গীয় হসনম্ ঃ রাজনৈতিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত বিশ শতকের সংস্কৃত প্রহসন
অর্ণব পাত্র ১৬৮
নজরুল ইসলামের ছোটগল্পে প্রেমভাবনা
ব্যাসদেব ঘোষ ১৭২
বাংলা ছোটগল্পে নিম্নবর্গ : প্রসঙ্গ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দেবশ্রী সাহা ১৮৩
সময়চক্রে-সংশয়ে-সংকটে দাম্পত্য জীবন : বিংশ শতকের আলোকে
সায়ন মুখার্জ্জী ১৮৯
উজানে মৃত্যু : দ্বন্দ্বময় জীবন
আশিস রায় ১৯৫
বাংলার মুখ: পথের পাঁচালীর গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর
মনোজ মণ্ডল ২০১
দেশভাগের সত্তর বছর ও দেশছাড়া বাঙালি
সুখেন্দু বিশ্বাস ২০৯
হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানে বাংলা ও বর্ধমান জেলা: (১৯১৫-১৯৪৭)
শচীন্দ্র ঘোষ ২১৭
বিশ শতকের বাংলা আধুনিক গানে নজরুলের অবদান
মধুমিতা সরকার ২২৬
ছেঁড়াতার ও কৃষিজীবী মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
সুমন্ত মণ্ডল ২৩১
বাংলা উপন্যাসে তৃতীয় লিঙ্গের আত্মকথা
অমল মোদক ২৩৭
উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রমানস - ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য
কৌশিক পাত্র ২৪৬
The Modern Age and T. S. Eliot
Aniruddha Sarkar ২৫৯

সম্পাদকীয়

পালা বদলতো চলতেই থাকে। ভাবনায়, চিন্তায়, চেতনায়, মননে। কখনও সময়ের সঙ্গে হাত ধরে, কখনও সমাজের সঙ্গে যোগসাজসে। সময় আর সমাজ যেন অনেক বেশি করে সাহিত্যকে বদলাতে সুযোগ করে দেয় অথবা বদলানোর জন্য আহ্বান জানায়। প্রতিটি শতক তার নিজস্ব ধ্যান ধারণায় সমকালীন সমাজ সাহিত্যকে তুলে ধরে। সমকালীন সময়ের সৃষ্টি কর্মে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সময়ের ঢেউ যে সাহিত্যিকদের উদ্বেল করবে সেটাই স্বাভাবিক। এই উদ্বেলতা কখনো আসে প্রত্যক্ষে, কখনো পরোক্ষে। প্রচার মনস্কতাও একটি অভিপ্রায় যা সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ আন্দোলন তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ছাত্র সাহিত্যব্রতীরা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সাহিত্য ও রাজনীতিকে আলাদা করা যাবে না। সেজন্য বিশ শতকের সাহিত্যের মধ্যে একটি মিশ্র ভাবধারার প্রকাশ পায়। এখানে প্রাবন্ধিকরা তাদের লেখার মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন যা কিছুটা হলেও নতুন চিন্তা চেতনার ফসল হবে।

৬ জানুয়ারি, ২০২০

দ্বন্দ্বসংঘাতময় আধুনিক মানুষের কাব্যনাটক : বুদ্ধদেব বসুর 'কালসন্ধ্যা'

হোসনে আরা জলী*

বুদ্ধদেব বসু মূলত একজন কবি ও কথাসাহিত্যিক। কিন্তু কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তাঁর বিচরণ রয়েছে। পরিণত বয়সে যখন তিনি দেশি-বিদেশি পুরাণ কথা ও কাহিনির প্রতি মনোযোগী হন তখন তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন কবিতা ও নাটকের সমন্বয়ে সৃষ্ট কাব্যনাটককে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কাব্যনাট্যের ধারা সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, রামবসু, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের রচনায়ও এই ধারার বিকাশ বিচ্ছিন্নভাবে লক্ষ করা যায়।[১] চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে উল্লিখিত লেখকদের সাধনায় কাব্যনাট্য একটা নিজস্ব রূপ পেতে শুরু করলেও এর বিকাশ ঘটে ষাটের দশকে। শুধু বিকাশই ঘটেনি, তা রীতিমতো একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল যা 'কাব্যনাট্যচর্চা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ষাটের দশকের এই কাব্যনাট্যের ধারাকে যিনি সযত্নে লালন করেছেন, চর্চা করেছেন তিনি হলেন বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্য জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কাব্যনাট্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন বলে আধুনিক কাব্যনাট্যধারার পুরোধাও বলা হয়ে থাকে বুদ্ধদেব বসুকে। আধুনিক কবিতা যখন পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে তখন পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করতেই রচনা করেন কবিতার দৃশ্যরূপ। কবিতার দৃশ্যরূপ সম্ভব কাব্যনাট্যের মাধ্যমে। কবি তখন কবিতা-বিমুখ পাঠককে কবিতার দিকে ফিরিয়ে আনতেই রচনা করেন কাব্যনাটক। কবি তাঁর অস্তিত্বের সংকট, বেদনাকে উদ্ভাসিত করতে চান নাট্যচরিত্রের মধ্য দিয়ে। আর সেজন্যে তিনি বেছে নেন রামায়ণ, মহাভারত; কখনোবা গ্রীক পুরাণের কাহিনি এবং কিছু চরিত্রকে। অস্তিত্বের সংকট ও যন্ত্রণার পৌরাণিক চরিত্রগুলো কবির রচনায় পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব-বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত আধুনিক মানুষের প্রতিচ্ছবি।

'কালসন্ধ্যা' বুদ্ধদেব বসু রচিত দ্বিতীয় কাব্যনাটক। নাটকটি ১৯৬৮ সালে রচিত। ১৯৬৯ সালে নাটকটি ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম নাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র (১৯৬৬) মতো তাঁর এ নাটকও পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

রচিত। মহাভারতের 'মৌষল'পর্বে যদুবংশের ধ্বংস হওযার কাহিনি অবলম্বনে বুদ্ধদেব রচনা করনে 'কালসন্ধ্যা' কাব্য নাটক।

'মৌষল' পর্বের কাহিনিকে পূর্বরঙ্গ, উত্তরকথন এবং দুই অঙ্কে তুলে ধরেছেন বুদ্ধদেব বসু। পূর্বরঙ্গের শুরুতেই দুই বৃদ্ধের সংলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে দ্বারকানগরীর দুর্যোগের লক্ষণের শঙ্কা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছত্রিশ বছরে দ্বারকানগরে কৃষ্ণ অনেক কিছু নতুন করে স্থাপন করেছেন— পথ, অট্টালিকা, পুষ্করিণী, কানন, মন্দির, আরো কতো কি! সবাই ভেবেছিল সুখে-শান্তিতে সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাঁচবে। পূর্বরঙ্গের শেষ সংলাপে বৃদ্ধের কথায় যেমন আছে এই শান্তির ইঙ্গিত, তেমনি আছে শঙ্কা—

''আমরা ভেবেছিলাম কুরুক্ষেত্রে শোণিতক্ষরণ এঁকে দেবে দুঃখের অক্ষরে এক মহত্তর শান্তির ইঙ্গিত, উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে অর্থ পাবে বীভৎস অতীত। কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?''[২]

পূর্বরঙ্গের বৃদ্ধের সংলাপে এই দুর্লক্ষণের কারণ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

''কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন: 'তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে পুত্রহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে— আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি। কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'দেবী, আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই-ই উক্ত হলো।''[৩]

গান্ধারীর এই অভিশাপের পর কীভাবে কৃষ্ণের অপমৃত্যু হলো, অর্থাৎ কীভাবে গান্ধারীর অভিশাপ বাস্তবায়িত হলো- মহাভারতের 'মৌষল' পর্বে তা বর্ণিত আছে। আর বুদ্ধদেব এই 'মৌষল' পর্ব অবলম্বনেই রচনা করেন কাব্যনাটক 'কালসন্ধ্যা'।

পূর্বরঙ্গে দুইবৃদ্ধের সংলাপে যে দুর্লক্ষণের আভাস এবং অশুভসূচক কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছিল। প্রথম অঙ্কেই ভূমিকম্পের গুরু গুরু শব্দ, সমুদ্রের জলে সমস্ত নগরীকে গ্রাস করার লক্ষণ কিংবা মধ্যদুপুরেই নেমে আসা সন্ধ্যার লক্ষণের মধ্য দিয়েই তা বোঝা যাচ্ছিল। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সত্যভামা ও সুভদ্রার সংলাপে—

সত্যভামা : গুরু গুরু শব্দ, যেন ভূমিকম্প, জায়মান ঝঞ্ঝার অগ্রিম গর্জন বন্যার আয়োজন জনতার চীৎকার।[৪]

শুধু জনতার চিৎকারই শোনা যায় না, দ্বারকার নারী-পুরুষের আচার-আচরণের নেই কোনো কৌলীন্য। অভিজাত মাতাল নারী-পুরুষরা আসন্ন দুর্যোগের আভাসে শুধু বিভ্রান্তই নয়, মতিভ্রংশও। দ্বারকার নারী-পুরুষের এমন আচরণ বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল সুভদ্রার। উৎকণ্ঠিত সুভদ্রা তাই বলছেন—

সত্যিই কি ওরা সব আমাদেরই আত্মীয়
অভিজাত যদুরাজ বংশ?
কুৎসিত উল্লাসে উন্মাদ হলো আজ
তোমার আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠী—
সত্যি, একি সত্যি?[৫]

সত্যভামা ও সুভদ্রা যেন এ নাটকে শাশ্বত জননী ও ধাত্রীর প্রতীক দুই নারী। অন্য নারী ও পুরুষরা যথেচ্ছাচারে উন্মুক্ত, শাশ্বত মূল্যবোধ বা মানবিক বোধ-বুদ্ধি, ভালোমন্দ, ধর্মজ্ঞান সবকিছুই বিবর্জিত এক নির্ভয় ধ্বংসনৃত্যে সবাই উন্মাদ, উল্লসিত।

মহাভারতের যদুবংশের ধ্বংস হওয়ার কাহিনি অবলম্বনে ষাটের দশকে এই নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু আসলে তাঁর সমকালের সামাজিক বিপর্যয়কেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গে উগ্র মতাদর্শে বিশ্বাসী কিছু যুবক প্রচলিত অনেক কিছুকেই অস্বীকার করেছিল। নবজাগরণের প্রভাবে তাদের চিন্তা-চেতনায় যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি প্রচলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও শুরু হয় ভাঙন।[৬] আর এই ভাঙনেই দেখা দেয় বিপর্যয়। ইয়াংবেঙ্গলদের উগ্র মতাদর্শ, চিন্তা-চেতনা এবং ঐতিহ্যকে অস্বীকার করায় হতবিহ্বল হয়ে পড়েন বয়স্ক বুদ্ধিদীপ্ত প্রাজ্ঞজন এবং সাধারণ মানুষেরা। সমকালের এই বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্রই নাট্যকার তুলে ধরেছেন এ নাটকের সাধারণ মানুষ এবং অসীম বীর্যশালী কৃষ্ণ ও অর্জুন চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ইয়ংবেঙ্গলদের অধঃপতন শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাদের উগ্রতায় সমাজে নেমে আসে বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ে সমাজের সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে ব্যাকুল, ভোগবিলাসীতায় মত্ত। তেমনি নাটকের চরিত্রগুলোও বড় বেশি উচ্ছৃঙ্খল, উগ্র-আচার-আচরণে এবং কথাবর্তায়। আনন্দ যেমন তাদের কাছে স্বাভাবিক তেমন দ্বারকায় ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডও স্বাভাবিক। এমন কি নির্বিকার আবেগহীন ক্লান্ত, উদাস কৃষ্ণের কাছেও তা স্বাভাবিক। যেন যা ঘটেছে তা ঘটারই কথা ছিল, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই কৃষ্ণ বলেন—

এ নয় নতুন কিছু, নয় আকস্মিক।
শৃঙ্খলিত ঘটনা পর্যায়ে
বিধিবদ্ধ, নিশ্চিত অন্তিমমাত্র।[৭]

কিংবা সুভদ্রা যখন বলেন—

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হলে
বিধবার আর্তনাদ, মাতার ক্রন্দন,
ভীষ্মের অনুশাসন, মৈত্রীর স্বাক্ষর;

তারপর অশ্বমেধ, বানপ্রস্থে গেলেন বৃদ্ধেরা,
কেটে গেলো ছত্রিশ বছর।
তবুও কি স্থিতি নেই— ক্ষমা নেই?
তবু— প্রতিহিংসা?[৮]

সুভদ্রার এমন প্রশ্নের জবাবে সহজ-সরল, নিয়তিবাদে বিশ্বাসী কৃষ্ণ উচ্চারণ করেন শাশ্বত সত্য—

যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ অসমাপ্ত;[৯]
কিংবা—
দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব,
যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন—
সব দ্বন্দ্ব;
পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে, বংশে বংশে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে
এবং ফলত—
ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ, সবই স্বাভাবিক।[১০]

কৃষ্ণের একটি বাক্য 'যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ অসমাপ্ত' এর মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার এক শাশ্বত সত্য বাণীই প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকের ভাষায়—

"প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই মানব সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে দ্বান্দ্বিক ঘটনা স্রোতের মধ্য দিয়ে। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বের মীমাংসা ঘটেছে যুদ্ধের মাধ্যমে— রক্তস্রোতে ভেসে। সেখানে, সেইসব যুদ্ধেও ঘটেছে ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ। ফলে এক-একটি ক্ষণিক সভ্যতার পতনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন ক্ষণিক সভ্যতা। এটা-ই অনিবার্য। দ্বারকার সম্বন্ধে সভ্যতার বিনাশের মধ্য দিয়ে কালের একটি বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে। এবার শুরু হবে নতুন সভ্যতার নতুন কালবৃত্তের নতুন রেখার অঙ্কন।"[১১]

সত্যভামা যখন কৃষ্ণের কাছে জানতে চায়—
কৃষ্ণ, আমি জেনেছি তুমিই বিষ্ণু,
নিয়ামক, বিধায়ক, অক্ষর, ঈশ্বর,
তা-ই যদি, তবে কেন যুদ্ধ হতে দিয়েছিলেন?
কেন থামালে না
ধার্তরাষ্ট্র পাণ্ডবের আত্মরক্তপাত?
কেন শুধু দর্শক ছিলে,
যাদবের আত্মনিধনে?[১২]

সত্যভামার এমন প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ জানিয়ে দেন আরেক চরম সত্য—
নিশ্চেষ্ট?.... না তো!

... .
ফলত, কিঞ্চিতমাত্র পরিশ্রমে
শেষ করে দিলাম আমার
অবশিষ্ট যা দায়িত্ব ছিল।[১৩]

ছত্রিশ বছর পূর্বে গান্ধারীর অভিশাপে যা উক্ত হয়েছিল 'তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ধ্বংসের কারণ হবে তুমি'— যা ছিল কৃষ্ণের কাছে অবশ্যাম্ভাবী- কৃষ্ণ নিজ হাতে তাই করলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো দিনে যে রক্তপাত হয়েছিল, ছত্রিশ বছর পর কৃষ্ণ 'কিঞ্চিতমাত্র পরিশ্রমে এক মুহূর্তেই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ধ্বংস করে গান্ধারীর অভিশাপের বাস্তবায়ন ঘটান। কৃষ্ণের এমন অস্বাভাবিক ভয়ানক আচরণে সত্যভামা, সুভদ্রা ভেঙে পড়লেও কৃষ্ণ নির্বিকার, নিরুত্তাপ। স্বাভাবিক কণ্ঠেই তাই বলেন—

মহিলারা, বিলাপ কোরো না
এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট, অলঙ্ঘনীয়।[১৪]

কৃষ্ণের কাছে সাত্যকির নৃশংসতা কিংবা পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রের নারকীয় হত্যাকাণ্ড, বলা যেতে পারে পুরো যদুবংশের ধ্বংস সবই স্বাভাবিক, নিয়তির বিধান বলে মনে হয়। এরপর কৃষ্ণ বিদায় নিয়ে চলে যান। যে পথে ধায় সর্বজন। পার্থের সন্ধানে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়েই সমাপ্তি ঘটে প্রথম অঙ্কের। কৃষ্ণ বার বার যে দ্বন্দ্বের কথা বলছেন, সে দ্বন্দ্ব আসলে ষাট-সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া নানা বিদ্রোহে কথা।[১৫] ষাট-সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তের ভোগবিলাসিতা, বিকারগ্রস্ততায় বিপর্যস্ত যে সমাজ দেখেছেন নাট্যকার, পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই সমাজের চিত্রই উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন নাটকে। দ্বিতীয় অর্থে যে কৃষ্ণকে দেখা যায় সে এক অন্য কৃষ্ণ। যে অর্জনের সারথী ছিলেন কৃষ্ণ, সেই অর্জুনেরও তাকে প্রথম দেখায় চিনতে কষ্ট হয়। প্রথম অঙ্কের বীর কৃষ্ণ, যদুবংশকে যিনি সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, আবার গান্ধারীর অভিশাপ বাস্তবায়ন করতে নিজেই নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে হত্যা করেছেন। সেই বীর্যবান কৃষ্ণ দ্বিতীয় অঙ্কে বলহীন, বীর্যহীন এক অসহায় কৃষ্ণ। নাট্যকার কৃষ্ণের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

''দ্বারকার রাজপথ। পিছনে রাজপুরীর সিংহদ্বারের আভাস। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। তাঁকে প্রথম অঙ্কের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধ দেখাচ্ছে।"[১৬]

শুধু কৃষ্ণ নয়, অর্জুনেরও একই অবস্থা। মুখে পথশ্রম ও প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন, চলার ভঙ্গিতেও নেই আর সেই আগের মতো বীরোচিতভাব। দ্বারকায় এসে জনহীন রাজপথ, গৃহের রুদ্ধ বাতায়ন দেখে অর্জুন জানতে চান—

আছেন তো কুশলে ক্ষত্রিয়বর্গ
বসুদেব, বলরাম, মহিলারা?[১৭]

কিংবা যখন আসার পথে সীমান্তের রটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চান, তখন দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে কৃষ্ণ জানিয়ে দেন ঘটে যাওয়া সত্য—

শোনো পার্থ,
জনরব সর্বদাই মিথ্যা নয়।
পথে পথে যে-রটনা শুনে এলে
সব সত্য।[১৮]

বঞ্চিত হন অর্জুন। মানতে চান না কৃষ্ণের কণ্ঠে উচ্চারিত সত্যকে। চীৎকার করে জানান- এ অসম্ভব। কিন্তু কৃষ্ণ অর্জনকে বলেন যে, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ—

জন্ম থেকে সকলেই মৃত, চিরকাল সকলেই মৃত,
জীবিত ও মৃতের কোনো ভেদ নেই।[১৯]
কিংবা,
যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,
যা নেই, তা কখনো ছিলো না।[২০]

যাদববংশের এমন নির্মম পরিণাম এবং কৃষ্ণের নির্বিকার কথা শুনে অর্জুন অস্থির হয়ে উঠলে কৃষ্ণ তাকে এই অস্থিরতা, ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিতেই অর্পণ করেন এক গুরু দায়িত্ব। বলেন—

বহুকাল নিরাপত্তা ও বিশ্রামে তুমি
সম্প্রতি হয়েছো ক্লান্ত। নাও তবে
আরো এক দুঃসাধ্য কর্মের ভার। আরো একবার
বীর্যের পরীক্ষা দাও।[২১]

প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে নারীদের আর্তনাদের স্বর ভেসে এলে কৃষ্ণ অর্জুনকে আজ্ঞা করেন—

''রাজকন্যা, রাজমাতা, রাজবধূ—
সুভদ্রা, রুক্মিনী, সত্যভামা
ষোড়শ সহস্রনারী,
শিশু, বৃদ্ধ, অসংখ্য সেবক,
আর স্বর্ণমাণিক্যের বিরাট ভাণ্ডার—
সব নিয়ে যাত্রা করো তুমি।
গন্তব্য— হস্তিনাপুর।[২২]

কৃষ্ণের আজ্ঞা পালনে আরেকবার বীরত্বের পরীক্ষা দিতে চান অর্জুন। যাবার সময় কৃষ্ণকে তার সঙ্গে যেতে বললে কৃষ্ণ বলেন—

আমি আছি
অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। তুমি যাত্রা করো।
এই দেশ বাসযোগ্য নেই আর।[২৩]

বলেই অদৃশ্য হলেন কৃষ্ণ। অর্জুনও দেখলেন আর সময় নেই। অতঃপর অর্জুন কৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করতে সবাইকে নিয়ে রওয়ানা দেন হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বারকাপুরী সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হবে। আর তারপরেই সত্যে পরিণত হয়- কৃষ্ণকে দেওয়া গান্ধারীর অভিশাপের শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়। গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেন— আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে পুত্রহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় কৃষ্ণের অপমৃত্যু হবে। এক সাধারণ ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরের আঘাতে বীর পরাক্রমশালী দেবতা কৃষ্ণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গান্ধারীর অভিশাপ সত্যে পরিণত হলো। এমন মৃত্যু যতোটা না কৃষ্ণের জন্যে অপমানের, অসম্মানে তারচেয়ে বেশি অসম্মানের ছিল তারই অনুসারিরা যখন তার বিরুদ্ধাচরণ করে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

''পার্থিব দেহের অধিকারী অতিসাধারণ এ ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরে দেবতা-কৃষ্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি হচ্ছে তিনি যে যদুবংশকে নিজে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে পরাক্রমশালী করে গড়ে তুলেছিলেন, তারা এক সময়ে হিংসা-দ্বেষ, রিরংসা-জিঘাংসা এবং ভ্রষ্টাচারে নিমজ্জিত হয়ে উগ্র-উন্মত্তায় তাদের রক্ষাকর্তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন।''[২৪]

অর্জুন যখন দ্বারকার নারী-বৃদ্ধ-শিশুদের নিয়ে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন যাত্রাপথে নারীদের সংলাপে বসবাসের অযোগ্য যে দ্বারকার কথা বলা হচ্ছিল, তার মধ্যদিয়ে নাট্যকার সমকালের পশ্চিমবঙ্গের অস্থির, বিশৃঙ্খল-বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। চতুর্থ নারী তার সংলাপে যখন বলে—

এবার অন্যদেশ, আমরা বাস্তুহীন,
কে জানে কী রয়েছে ভবিষ্যৎ![২৫]

অর্জুন সবাইকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ভয়াল কালসন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি শেষে সূর্যের আলো উদ্ভাসিত হলে সকালে এক বনভূমিতে প্রবেশ করে সবাইকে নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে যাত্রাবিরতি করেন। এরপরের ঘটনা নাট্যকার বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''অতর্কিতে একদল দস্যুর আক্রমণ। অর্জুনের অনুচরবৃন্দের প্রতিরোধের চেষ্টা। নেপথ্যে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ।''[২৬]

কৃষ্ণ যতোটা ছিলেন সহজ-সরল নিয়তিবাদে বিশ্বাসী, অর্জুন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিগতবীর্য হলেও অহংবোধ ছিলো অর্জুনের প্রবল। ডাকাতদের প্রতিরোধ করতে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দস্যুপতি যখন বলে—

কেন রে যমের ভিটে মাড়াবি,

সাধ্য কী আমাদের তাড়াবি?[২৭]

তখন গর্জে উঠেন অর্জুন। প্রবল অহংবোধ থেকেই উচ্চারণ করেন—

কী, এত স্পর্ধা!

দুরাশয়, পাপাত্মা, পামর,

জানিস, আমি কে?

আমি পার্থ, সব্যসাচী, অজেয় অর্জুন।[২৮]

অর্জুনের এমন অহংকারপূর্ণ শৌর্য-বীর্য, বীরত্বের কথা শুনে দস্যুদল যখন অর্জুনের বীরত্বকে ব্যঙ্গাত্মক সুরে উপহাস করে অর্জুন তখন আবার গর্জে উঠেন—

পাপিষ্ঠ, এই নে, তবে তোর মৃত্যুবরণ।[২৯]

কিন্তু ডাকাতদের দিকে কয়েকবার শর নিক্ষেপ করেও অর্জুন ব্যর্থ হন এবং একসময় ভূতলে শয়ন করেন। ডাকাতরা তখন ব্যঙ্গ সুরে বলে— 'হায় পার্থ, আজ ব্যর্থ'। এরপর অর্জুনের সামনেই তারা লুণ্ঠন করে ধন-সম্পদ এবং নারীদের। দস্যুদের কাছে এমন শোচনীয়, গ্লানিময় পরাজয়ে অর্জুন বুঝতে পেরেছেন কৃষ্ণহীন অর্জুনের কোনো শক্তি নেই। অর্জুন ব্যর্থ, ব্যর্থ তার অতীতের বীর্য, বীরত্ব। কৃষ্ণহীন অর্জুনের কাছে নিজেকে মনে হয় অন্তহীন মহাশূন্যে তিনি যেন এক মজ্জমান শরীর সর্বস্ব জড়। এমন বোধ জাগ্রত হবার পর অর্জুন নিজেকেই ধিক্কার জানাতে জানাতে পরিসমাপ্তি ঘটে নাটকের।

গ্রীক নাটকে শুরুতেই যেমন সমস্ত কাহিনি বা ঘটনার পরিণতির একটা আভাস দেয়া হয় কোরাসের মাধ্যমে তেমনি 'কালসন্ধ্যা' নাটকেও প্রথম অঙ্কের শুরুর আগেই পূর্বরঙ্গ নামে একটি অংশে সংক্ষিপ্তভাবে দুই বৃদ্ধের কথোপকথনের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু নাটকের শেষ পরিণতির একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। দ্বারকার সাধারণ মানুষ যে এক অজানা শঙ্কায় উদ্বিগ্ন এবং দ্বারাকানগরীও যে আসন্ন ধ্বংসের মুখোমুখি- দুই বৃদ্ধের সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনি শুরুর আগেই নাট্যকার গ্রীক নাটকের মতো সেই আভাস দিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, পূর্বরঙ্গের দেয়া এই আভাসের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু পূর্বরঙ্গের আভাসকৃত মূল ঘটনার সমাপ্তি ঘটলেও ঘটনার পরেও যে ঘটনা আছে নাট্যকার সেই ঘটনাকে তুলে ধরতে যুক্ত করেন 'উত্তরকথন' নামে আরেকটি অংশ।

উত্তরকথনের শুরুতেই দেখা যায়, ঘোর কৃষ্ণকায়, কুদর্শন ব্যাসদেব তাঁর আশ্রমে গ্রন্থরচনায় ব্যস্ত। তাকে দেখে বোঝা যায় না, তিনি যুবক না বৃদ্ধ। যেন সব বয়সের অতীত ধীর স্থির একটি শিলাখণ্ড। এমন অবস্থায় ধীরপদে দস্যুদের কাছে সদ্য পরাজিত এক সময়ের বীর অর্জুন প্রবেশ করেন এবং পথমধ্যে দস্যুদের কাছে পরাজয়ের জন্য অনুতাপ করতে করতে বলেন—

আমি অর্জুন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী

চিরকাল জয়ে নিঃসংশয়
অবশেষে, জীবস্মৃত-জীবন্মৃত।
কেন এই অক্ষমতা, যার তুলনায়
মৃত্যু ছিলো শতগুণে বরণীয়?[৩০]

গম্ভীর ও কর্কশ কণ্ঠে জানান যে, তিনি আগেই এসব জানতে পেরেছেন এবং এটাও বলেন যে, এতোদিন যা কিছু ঘটেছে তা দেবতার ইচ্ছেতেই ঘটেছে, এমন কি অর্জুনের শৌর্য-বীর্য, ভয়ে সবকিছুই ছিলো দেবতার ইচ্ছেয়। আর সেই দেবতা কৃষ্ণ। ব্যাসদেব বলেন—

আপাতত কৃষ্ণের প্রচ্ছদে
ছিলেন তোমার সঙ্গী, সহকর্মী, নির্দেশক।
তোমার রথাগ্রে তিনি শত্রুকূল দ্বন্ধ করেছেন,
তুমি শুধু নিক্ষেপ করেছো শর
যারা হত, তাদের উদ্দেশ্যে।
তুমি নও ধনঞ্জয়, বিষ্ণু, পরন্তপ
সব তিনি।[৩১]

এরপর তিনি অর্জুনকে বীরত্ব, যুদ্ধ, জয় ভুলে গিয়ে অস্ত্রধারণ করতে নিষেধ করেন। যারা আছে হৃতাবশিষ্ট তাদের হস্তিনায় যথাযথ ব্যবস্থা করে পাঞ্চালি ও পঞ্চভ্রাতাসহ যাত্রা করতে বলেন —

প্রস্থান সুন্দর হোক তোমাদের
জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হলো,
অন্য এক বৃত্ত এর পরে—
হয়তো বা আরব্ধ এখনই।[৩২]

ব্যাসদেবের কথা শেষ হলে অর্জুন বেরিয়ে যান নিজ দেশের উদ্দেশ্যে। ব্যাসদেব আবার লিখতে বসেন। মঞ্চে আলো ম্লান হতে থাকে। এখানেই শেষ হয় উত্তরকথন।

দ্বিতীয় অঙ্কে দস্যুদের কাছে পরাজিত হয়ে অর্জুন বুঝতে পারেননি তার পরাজয়ের কারণ। উত্তরকথনে ব্যাসদেবের কাছে এসে অর্জুন নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হন যে, কৃষ্ণহীন অর্জুনের কোনো শক্তি নেই। আর এটাও সত্যি যে অর্জুন বরাবরই ছিলেন কৃষ্ণের হাতের ক্রীড়ানক। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য—

''কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের প্রতিটি যুদ্ধের সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণ; কোন সময় কাকে আক্রমণ বা রক্ষা করতে হবে, কখন কোন্ অস্ত্রের ব্যবহার সমীচীন, কখন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে স'রে পড়া ভালো, কী-উপায়ে মহাযোদ্ধারা বধ্য হতে পারেন— এইসব প্রতিটি অনুপঙ্খ, কৃষ্ণ ব'লে দিয়েছেন, অর্জুন শুধু আজ্ঞাপালন

করেছেন ভৃত্যের মতো। কৃষ্ণ সারথি- ব্যাপকতম, সম্পূর্ণতম অর্থে তা-ই, তিনিই পরিচালক ও অধিনায়ক।"[৩৩]

কৃষ্ণহীন অর্জুনের বীর্য, বীরত্ব ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকা অর্জুনের কাছে মনে হয় মৃত্যুতুল্য। অর্জুনের এই যন্ত্রণা নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বের কথা ভেবেই হয়তো সমালোচক বলছেন—

''নাটকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, জীবিতের যন্ত্রণা, এই মূল্যবোধের আর্জি যেন পুরাণের গণ্ডিকে অতিক্রম করে এক নতুন পথে যাত্রা করেছেন।"[৩৪]

'কালসন্ধ্যা'র কাহিনী পৌরাণিক এবং চরিত্রগুলো অন্য জগতের হলেও বুদ্ধদেব কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সমকালের এবং বর্তমানের আধুনিক মানবমনের আনন্দ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অনুভব-অনুভূতিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণ যখন বলেন, 'দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের শ্রোত অসম্ভব'— তখন স্পষ্টই বুঝতে হবে যে, সেই দ্বন্দ্ব কেবল মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের দ্বন্দ্বই নয়, এই দ্বন্দ্বে কেবল যদুবংশই ধ্বংস হয়নি এ দ্বন্দ্ব যেমন ছিলো দেবলোকে, দেবকূলে তেমনি এখনো আছে মনুষ্যজগতে। মানুষে-মানুষে। আর এই দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে এক অলৌকিক শক্তি যাকে বলা হয় নিয়তি। পৌরাণিক চরিত্রগুলো যেমন ছিলো নিয়তির অধীন তেমনি আধুনিক মানুষও নিয়তির অধীন নিয়তির অমোঘ নির্দেশেই কৃষ্ণ, অর্জুনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নিঃশেষ হয় দ্বারকাপুরি, যদুবংশ, ধ্বংস হয় একটি সভ্যতার। আবার দস্যুদলের জয়ের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় আরেকটি নতুন কালের, নতুন সভ্যতার। সমালোচকের ভাষায়—

''কালসন্ধ্যায় একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসের কথাই উচ্চারিত হয়নি— বরং একটি সভ্যতার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এখানে অন্য একটি নতুন সভ্যতার সূত্রপাতের কথাও প্রতীকায়িত। মানব-ইতিহাসের আদি সত্য এই যে, প্রতিটি সভ্যতার মানবকীর্তি অবিনশ্বর হয়ে থাকে ইতিহাসের পাতায় পাতায় বর্জাইস অক্ষরে আজ যে সভ্যতার অবলুপ্তির কালবৃত্ত সম্পূর্ণ করলো— সেটিই মানব সভ্যতার শেষ চিহ্ন নয়। নতুন সভ্যতার কালবৃত্তের নতুন চিহ্নও সেদিন থেকেই শুরু হয়।"[৩৫]

পুরান কাহিনীতে ভাইয়ে ভাইয়ে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি, তা কোনো দেবতা বা মানুষের কারোরই যে কাম্য নয় উত্তরকথনে ব্যাসদেবের সংলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্জুনকে অস্ত্রধারণ না করতে বলা, বীরত্ব, যুদ্ধ জয় ভুলে যেতে বলার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব আসলে সমকালের মানুষের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী মানবিক চেতনার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। ষাটের দশকের অস্থির বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একজন আধুনিক বিপর্যস্ত মানুষ যেমন তার অস্তিত্ব রক্ষায় প্রতিমুহূর্তে লড়াই করছিল তেমনি বুদ্ধদেবের পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণ, অর্জুনকেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কঠিন লড়াই করতে হয়েছে। অসীম ক্ষমতা, বীর্য-শৌর্যের

অধিকারী হয়েও তারা অবশ্যাম্ভাবী পরিণতির হাত থেকে তারা রক্ষা পাননি। কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় আধুনিক মানুষের প্রতিকৃতি হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন।

আধুনিক মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। পেয়েও তৃপ্ত নয় কেউ। এক অতৃপ্তি নিয়ে পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, শক্তি এসব আঁকড়ে ধরে রাখতে যেমন পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে মানুষ তেমনি নিজেরাও অস্তিত্বের সংকটে হচ্ছে দগ্ধ। আধুনিক মানুষ বুঝতে চায়না যে, পার্থিব জীবনের সবকিছু একটি নির্দিষ্ট সময় ও গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়— একদিন পতন অনিবার্য এবং নিয়তিই মানুষকে তার অবশ্যাম্ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ক্ষমতা, শৌর্য-বীর্য দিয়েও মানুষের যে কিছুই করার থাকে না কৃষ্ণ ও অর্জুনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমকালের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অস্তিত্বের সংকটে ভোগা আধুনিক মানুষকে সেই সত্যটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক; বুদ্ধদেব বসু: মননে অন্বেষণে, পুস্তক বিপণী, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১১৭।

২. বুদ্ধদেব বসু; কালসন্ধ্যা, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ১১।

৩. পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৬. বেলা দাস (সম্পাদনা), বুদ্ধদেব বসু, কাল থেকে কালান্তরে, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৬০

৭. বুদ্ধদেব বসু: কালসন্ধ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

১১. মাহবুব সাদিক: বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫১।

১২. বুদ্ধদেব বসু : কালসন্ধ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

১৫. বেলা দাস (সম্পাদনা), বুদ্ধদেব বসু, কাল থেকে কালান্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

১৬. বুদ্ধদেব বসু, কালসন্ধ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

২৪. উত্তম দাশ (সম্পাদিত); শতবর্ষের আলোকে বুদ্ধদেব বসু, মহাদিগন্ত, পদ্মপুকুর, বারুইপুর, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩৭।

২৫. বুদ্ধদেব বসু : কালসন্ধ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৩৩. বুদ্ধদেব বসু; মহাভারতের কথা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪০৮, পৃ. ১৮০।

৩৪. বেলা দাস (সম্পা.), বুদ্ধদেব বসু; কাল থেকে কালান্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৫. মহবুব সাদিক, বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে মিথ

প্রসূন মাঝি*

ইউরোপীয় সংজ্ঞায় মিথ এবং আমাদের পুরাণ যদিও ঠিক সমার্থবোধক নয় তবু ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাধারণভাবে আমরা এই দুটিতে পরস্পরের প্রতিশব্দ বলেই ধরে নিই। ইংরাজীতে পুরাণ, ইতিহাস-পুরাণ বা লোক-পুরাণ এই জাতীয় দুটি শব্দ মূলত পাওয়া যায়— 'মিথ' এবং 'লিজেন্ড'-এর মধ্যে। Maria Leach-এর "The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legend"- 1950 গ্রন্থে লিজেন্ড বলতে বোঝানো হয়েছে— "Originally something to be read at religious service or at meals, usually a sanit's or marthyr's life.... Legend has since come to be used for narrative supposedly based on fact, with an inter-mixture of traditional materilas told about a person, place or incident."[১]— এই সংজ্ঞা অনুসারে লিজেন্ডে কোনো অলৌকিকতা বা অতিলৌকিকতা নেই। সন্তদের কথায় কোথাও কোথাও সে ব্যাপার ঘটলেও মুখ্য বক্তব্য মানুষের জীবনকথা। তাই একে লোক-পুরাণ বা ইতিহাস-পুরাণ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

অন্যদিকে মিথ-এর কথা বলতে গিয়ে ঐ একই অভিধানে বলা হয়েছে— "A story, presented as having actually occured in previous age, explaining the cosmological and supernatural traditons of a people, or their gods, heroes, cultural trians, riligous beliefs etc."[২] এই দৃষ্টিতে মিথ-এর আলোচ্য বিষয় ভারতীয় পুরাণের মতই। সৃষ্টিতত্ত্ব, অতিলৌকিক বিশ্বাস— এরাই মিথ-এর বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় পুরাণে ইউরোপীয় মিথ এবং লিজেন্ড দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-তত্ত্ব দেব বা দেবায়ত চরিত্র বৈশিষ্ট্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাই এগুলিকে কেবল পুরাণ না বলে দেব-পুরাণ বা ধর্ম-পুরাণ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। আবার C.Annandeb-এর "The Concise English Dectionary" গ্রন্থটির মতে মিথ হচ্ছে— "A fable or legend of natural upgrowth embodying the convictions of a peopel as to their gods or their divine personages, their own origin and early history and the heroes connected with it, the origin of the world etc. in a

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ।

looser sence, an invented story, somthing purely fabulous or having no existence in fact."[৩] এই অভিধানের মতে— কোন এক জনগোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত বাস্তবে নিরস্তিত্ব গল্পই মিথ। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে কোনও গল্পই কোনও এক বিশেষ যুগে এক বিশেষ, জনগোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত হয়ে চিরকাল একই আকারে থাকে না। অর্থাৎ অন্যান্য লোককাহিনীর মতো মিথও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনার সংমিশ্রণে নবগঠিত হতে হতে এগিয়ে চলে।

একথা সর্বজনবিদিত যে ভারতীয় বা ইউরোপীয় আর্যদের প্রাচীনতম বাসভূমি মধ্যপ্রাচ্য। সেই মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন জরথুষ্টীয় ধর্মের পারস্য দেবতার নামও মিথ্র বা মিথ্রস। ভারতে বৈদিক ধর্মে ইনিই হয়েছেন মিত্র অর্থাৎ সূর্য। পরবর্তীকালে পৌরোহিত্যের ব্যাখ্যায় রূপান্তরতি হলেও মূলে ইনি ছিলেন অর্ধনারীশ্বর বা মিথুন— দেবতা : "The Parasian Mithra was a god and goddess combined. Herodotus, in fact, appears not to have known that he was other than a female deity. He says, the parsians worshipped Urania, which they borrowed from the Arbians and Assyrians. Mylitta is the name by which the Assysians know this godess, whom the Arabians call Alitta, and the Parsians Mithra."[৪]

হেরোদোতাস এবং ম্যাকেঞ্জির এই সাক্ষ্যকে যদি ধর্ম পুরাণ না বলে ধর্মের ইতিহাস বলি, তবে 'মিথ্র' বা 'মিথ্রস', ভারতের মিথুন (যার ধাতু মূল মিথ্) গ্রীসের 'মিথোস' একই ভাবদ্যোতক হয়ে যায়। অন্তত ''The Persian Mithra was a god and goddes combined."— এই সাক্ষ্যের আলোকে। আর তা যদি সত্য হয়, তবে সর্বত্রই এর অর্থ পারস্পরিক মিলন, আদান-প্রদান। এবং যেহেতু এই তিন সভ্যতার মধ্যে পারসীয় জরথুষ্ট্রীয় এবং ভারতীয় বৈদিক, প্রাচীনতম সভ্যতা, তাই নিঃসন্দেহেই বলা যায়, 'মিথ' শব্দের উৎস গ্রীক ভাষা নয়, তার থেকে অনেক বেশি প্রাচীন।

ভারত, চীন, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, দূরপ্রাচ্য অথবা আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই আজ মিথ-এর ঘটনা, কাহিনী বা তার চরিত্রদের আচার-আচরণ সবই অতিপ্রাকৃত, অবিশ্বাস্য এবং কাল্পনিক মনে হয়— একথা অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু প্রত্যেক দেশেরই মিথ বা দেব/ধর্ম-পুরাণের সংজ্ঞায় বারেবারে স্বীকার করা হয়েছে যে, পুরাকালে বা সুদূর অতীতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এইসব প্রত্যক্ষ বাস্তব বলেই জানত যারা দেবতা, তাঁদের ক্রিয়াকলাপ অথবা তৎসংক্রান্ত বর্ণনা আজ অতিজাগতিক বা কল্পরাজ্যের বলে মনে হয়। তাঁরাও কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে এককালে প্রত্যক্ষ বাস্তব ছিলেন। কিন্তু আজ তাদের অবাস্তব, কাল্পনিক অথবা অতিলৌকিক বলে মনে হয়। এর কারণ কী?

প্রথমত, মনে রাখা দরকার সভ্যতার ক্রমবিকাশের যে স্তরে এদের জন্ম, তাকে আজকের মানুষ এতখানি পেছনে ফেলে এসেছে যে, তাকে ভাবতেও সে পারে না। দ্বিতীয়ত, সেই জীবনযাত্রার লোকাচার-লোকাচরণ এমন পর্যায়ে ছিল, যার সম্বন্ধে আজকের সভ্যতা চিন্তাই করতে পারে না যে আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতৃপুরুষেরা তেমন জীবনযাত্রাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তৃতীয়ত, দেব/ধর্ম পুরাণগুলির উপর আবহমান কালের এত বৈচিত্র্যময় হস্তাবলেপন পড়েছে যে হাজার বছরের পুরোনো বটগাছের মত মূল শেকড়টি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে এককালে তার একটিই মূল ছিল, আর আজ সে শতমূলী হয়ে পড়েছে। চতুর্থত, মূলকাহিনী বা অভিজ্ঞতার মিথ-কথার উপর পৌরোহিত্যের সুপরিকল্পিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, সেই ব্যাখ্যার খোলস ভেঙে সত্যকে স্বরূপে প্রকাশ অত্যন্তই দুরূহ।

সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার মিথের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থাকেই ধারণ করে আছে কতকগুলি মিথসমষ্টি। তাঁর মতে মিথ বলতে বোঝায়— ''কতগুলি মূল্যবোধ-নিহিত বিশ্বাস, যেগুলি মানুষ পোষণ করে, সেগুলির দ্বারা বা সেগুলির জন্য মানুষ জীবন ধারণ করে।''[৫] কোন সমাজই স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে না যদি না তার ভিত্তিস্বরূপ মিথগুলি— যেমন, আইন-সংশ্লিষ্ট মিথ, স্বাধীনতা-সম্পর্কিত মিথ প্রভৃতি মানুষের মূল্যবোধের মূলকেন্দ্র হয়। এইসব কারণে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। ''মন্দির, রাষ্ট্র, আইন বা ঈশ্বর আদিম যুগের মানুষের কাছে অনেক দূরবর্তী ভাবনা হতে পারে, কিন্তু মন্দিরের রীতিনীতি, রাজার অভিষেক, বিচারের বিশেষ কায়দা, কবরখানা বা বিবাহ বাসরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুগমন মানুষকে ঐ সমস্ত দূরের বিষয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে।''[৬]

সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধানে মিথের প্রয়োগ হলেও ক্রান্তিকালের পরিপ্রেক্ষিতেই মিথের সৃষ্টি। মিথ শুধু কাল্পনিক গালগল্প নয়। স্টিথ টমসনের ভাষায় ''এগুলি এক পবিত্র কাহিনী যা পবিত্র সত্তা বা আধা-ঐশ্বরিক বীরদের বা সমস্ত কিছুর সৃষ্টির কথা বলে যাদের মূলে আছে ঐ পবিত্র সত্তার মধ্যস্থতা।''[৭] কিন্তু মিথের জাতীয় চরিত্রই বুঝিয়ে দেয় কী করে এক অবস্থা অন্য অবস্থার সঙ্গে জড়িত, কী করে জনবিহীন পৃথিবী জনসমৃদ্ধ হয়, কী করে অমর মরণশীল হয়, কী করে আদিম ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজ বহুধাবিভক্ত উপজাতি ও জাতিতে রূপান্তরিত হয়। মিথ তাই একটি প্রান্তিক ঘটনা, পরিবর্তিত ঘটনার মধ্যস্থলেই এর অবস্থিতি।

মিথের প্রান্তিক চরিত্র সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্নল্ড ভ্যান জেনেপ সেখানে রীতিনীতির প্রয়োগ সম্পর্কে পদ্ধতিগত আলোচনা করেন।[৮] সেখানে তিনি মিথ সম্পর্কে অনুসন্ধানে এমন সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলি আগে কখনও প্রতিফলিত হয়নি। জেনেপ

আচার-অনুষ্ঠানের তিন ধরনের পর্যায় উল্লেখ করেন, যেমন- বিভাজনী, প্রান্তিকী ও সাঙ্গীকৃতি। যদি কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তবে পূর্বের সমাজের সমস্ত বিশেষ ও নির্ভরশীল অঙ্গগুলির অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অবয়বের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংসের মত প্রান্তিকী প্রতীকগুলি মাঝে মাঝেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে সমাজের বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন স্তরের জটিলতা যাজক ও যজমানের অন্তর্বিরোধের মতো হতে থাকে, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি পরিবর্তিত হয়ে নতুনভাবে পরিচালিত অন্য এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, আত্মীয়তা, সম্পত্তি ও পদমর্যাদার চিরাচরিত পার্থক্য অবলুপ্ত হতে থাকে। প্রচলিত পদমর্যাদার অবলুপ্তি বা অবয়ব পরিবর্তনকে ধ্বংস ও 'মৃত্যু' বলা হয়, আবার নতুন অবস্থার উদ্ভবের বা গ্রন্থিবন্ধনকে 'সৃষ্টি' বা 'শৈশব' বলা হয়। এই মিথগুলিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা আদর্শসৃষ্টিকারী।[৯] বা যেগুলি মর্যাদা বা নৈতিক নিয়মগুলির সমর্থন ও পারম্পর্য দান করে থাকে।[১০] মিথ ও প্রান্তিক নিয়মগুলিকে নিরপেক্ষ আচরণের আদর্শ বলে গণ্য করা উচিত নয়, আবার অন্যদিকে এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত গল্প বা নঞর্থক আদর্শ বলেও মনে করা ঠিক নয়। পৃথিবীর প্রারম্ভিক সৃষ্টিশীল শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক উন্নত ও গভীর রহস্য বলেই এগুলি অনুভূত হয়। এগুলি সমাজের মত নিরপেক্ষ আচরণের উত্তরণকারী এক শক্তি সমবায়, কারণ মিথে আছে এক অসীম-স্বাধীনতা যা আচার-বদ্ধ সামাজিক সংগঠনের অবস্থিতিতে কোন সময়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন বলেছেন, অগ্রজদের মধ্যে সতীনাথ, বিভূতিভূষণ, অমিয়ভূষণ এবং মহাশ্বেতা দেবী বিভিন্নভাবে মিথ ব্যবহার করেছেন তাঁদের লেখায় এবং নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। ইদানিংকালে অমিয়ভূষণ ও মহাশ্বেতা দেবী ছাড়া আর কোনো বয়োজ্যেষ্ঠকে এসব নিয়ে নতুন কোনও চিন্তা করতে দেখিনি বা শুনিনি। মহাশ্বেতা মিথ ব্যবহার করেছেন এক বিস্ময়কর দৃষ্টিকোণ থেকে। মঙ্গলকাব্যের মিথ-এর ব্যবহারের একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৪) উপন্যাস।

'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের শুরুতে মহাশ্বেতা দেবী নিজেই বলেছেন— ''আমার লেখার কাজে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাছে আমার ঋণের কথা বারবার স্বীকার করেছি।" মহাশ্বেতার 'ব্যাধখণ্ড' পড়ে মনে হয় এ হল তাঁর মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব পাঠকৃতি। ব্যাধখণ্ডের ভূমিকায় মুকুন্দের প্রতি সশ্রদ্ধ উল্লেখই করেছে মহাশ্বেতা। মুকুন্দকে সেখানে পথপ্রদর্শক 'ঐরাবত'-এর তুল্য বলা হয়েছে। মুকুন্দের কবিসত্তায় যেভাবে ইতিহাস চেতনা বিধৃত হয়েছিল তেমনটি সে যুগে প্রায় দুর্লভ। ব্যাধখণ্ডের ভূমিকায় মহাশ্বেতা লিখেছেন, 'ব্যাধজীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের অন্তরঙ্গ পরিচয় তো তাঁর 'অভয়মঙ্গল' পাঞ্জালীর 'ব্যাধখণ্ড' অংশেই বিবৃত। মুকুন্দ উদার সংবেদনশীল, প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন

অবশ্যই, কিন্তু উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবীয় উচ্চমন্য ভাবধারার শরিক ছিলেন তিনিও। তাঁর কাব্যে তার প্রমাণ আছে। হয়তো সে যুগের প্রেক্ষাপটে এই স্বাভাবিক। প্রয়োজন হয়ে পড়ে উচ্চবর্গের তৈরি করা ইতিহাস-পুরাণের ভাঙচুর। বিনির্মাণ তো যেকোনো পুনির্নির্মাণেরই পূর্বশর্ত সুতরাং মহাশ্বেতার ইতিহাস এবং পুরাণের ভাঙচুর আসলে নব নির্মাণেরই প্রয়োজন।

মুকুন্দ তাঁর কাব্যে সামাজিক বিন্যাসের দিক থেকে বর্ণগত অবস্থান বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। গুজরাত নগরীতে নানা জাতির আগমন প্রসঙ্গের বিস্তৃত এবং খুঁটিনাটি তথ্যক্রম দেখে বোঝা যায় মুকুন্দ এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন মুকুন্দের মন আসলে বৈষ্ণবের মন। ব্রাহ্মণরাই যে নরোত্তম, পশুরাজ সভায় পশুচরিত্রের জবানিতে মুকুন্দ তা প্রতিপন্ন করতেই চেয়েছেন—

''শরভ কুলীন তুমি সকল পশুর স্বামী
ব্রাহ্মণ যেমন নর-মাঝে।''

গুজরাত-রাজ কালকেতুর সুখ্যাতি করতে গিয়ে অন্যতম যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে যে কালকেতু ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের সেবক।

''কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ দ্বিজে দেয় নানা ধন''

কিংবা আড়রা যে কবির প্রিয়স্থল তার অন্যতম কারণ—

''আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।''

ব্যাধ সমাজকে যে মুকুন্দ 'অন্তরঙ্গ' ভাবে চিনতেন কাব্য পড়ে তা মনে হয় না। আদর্শায়িত বীর চরিত্র কালকেতু এক জায়গায় অভিমান করে সংকুচিত হয় এই বলে, 'অতি নীচ জাতি আমি জাতিতে চুয়াড়।' জাতপাতের সামাজিক সংঘর্ষ কালকেতুর ভালো করেই জানবার কথা। অথচ এই কালকেতু খল ভাঁড়ুদত্তকে তিরস্কার করবার সময় জাত-পাতের অস্ত্রই হাতে তুলে নিয়ে। কালকেতু বলে—

''হয়্যা বেটা রাজপুত বোলহ কায়স্থ
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।''

যে মুকুন্দ ষোড়শ শতকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে উদার এবং সহিষ্ণু মন নিয়ে মুসলমান বিধর্মীদের কথা বলতে পারেন হিন্দুদের সমান ওজনে, যে মুকুন্দ কালকেতুর মুখে আদর্শ রাজার মতো বলাতে পারেন 'ডিহিদার না-বসাব' কিংবা 'যত খুশি চাষচষো তিনসন বহি দিয়ো কর'— সেই মুকুন্দের আধুনিকতাও তো কম ছিল না। মহাশ্বেতা সেই 'আধুনিক মুকুন্দের সূত্রেই একজন সম্পূর্ণ মুকুন্দের রূপরেখা রচনা করেছেন। আমরা মনে করি, মহাশ্বেতার 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের মুকুন্দ চরিত্রটি সেই রূপরেখার পরিণত রূপ।

মঙ্গলকাব্যের মুকুন্দ চরিত্রের ফাঁকফোকরগুলি ভরাট করে মহাশ্বেতার এই মুকুন্দ চরিত্র গড়ে উঠেছে। এভাবেই মহাশ্বেতা হয়তো নিজেরই অজান্তে মঙ্গলকাব্যকারের একরকম সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন তাঁর নির্মিত উপন্যাসে।

মহাশ্বেতার মুকুন্দ তাঁর কাব্য (ব্যাধখণ্ড) রচনা করে একেবারে উপন্যাসের শেষে। তার বর্ণনা মহাশ্বেতা দিয়েছেন এইভাবে— ''কাল্যাকে কালকেতু করে দিব। ফুলিকে ফুলরা। স্বর্ণগোধা তোরে দিব রে কাল্যা। কলম স-ব পারে। আটদিন ধরে আমার মঙ্গলকাব্য গান হবে। মূল গায়ক হয়ত ঘুঙুর দেওয়া ফাঁপা পিতলের কঙ্কন পরে হাতঠুকে, তাল দিয়ে আমারচণ্ডী উপখ্যান গাইবে। কালকেতু আর ফুল্লরাকে জানবে সবাই, তোরা জিয়ে থাকবি। চোখ খুলল মুকুন্দ। মা অভয়া! এসো, আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন দিনে রাতে লিখে এ কাব্য সমাপ্ত করতে পারি। মুকুন্দ প্রথম তালপত্রে লিখল 'অভয়ামঙ্গল'। তারপর, বালির পুটলিতে সযত্নে কালি শুকিয়ে পাতা উলটোল। বড়বড় করে লিখল 'ব্যাধখণ্ড'। প্রথম দিবস। ব্যাধ নইলে অরণ্যানীকে প্রতিষ্ঠা করবে কেমন করে? মুকুন্দ লিখতে থাকল।' (পৃ. ১২০) কাব্যরচনায় স্বপ্নাদেশের কোনো যোগ নেই। শবর জাতি হারিয়ে যাওয়ার কারণ যে উচ্চবর্গের নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসন, এটা উপলব্ধি করে মহাশ্বেতার মুকুন্দ। উচ্চবর্গের একজন হিসেবে তার যে অপরাধবোধ, তার থেকে, সেই 'পাপস্খালন'-এর ভাবনা থেকেই তার ব্যাধখণ্ড লেখা। ইতিহাসের মুকুন্দকে প্রতীকপুরুষ হিসেবে গ্রহণ করে মহাশ্বেতা তাঁকে নিজের মনে মতো করে এঁকেছেন।

মহাশ্বেতা বাস্তবানুগ করেই প্রতিনির্মাণ করেছেন ব্যাধখন্ডের কাহিনীটি। পুরাকল্পিত প্রসঙ্গকে তিনি নামিয়ে এনেছেন ইতিহাসের মাটিতে। ফলে কালকেতু ফুল্লরা এ উপন্যাসে ষোড়শ শতকের এক ব্যাধ-দম্পতি মাত্র। তাদের সঙ্গে মুকুন্দের বেশ ঘনিষ্ঠ চেনা-জানার সম্পর্ক। মুকুন্দ তাদের 'জামাইদাদা'। কিংবদন্তির ছলে এক পুরাকল্পিক প্রসঙ্গও আছে উপন্যাসে। তার প্রতীকী তাৎপর্যই মুখ্য। শবরদের রাজা হবে সে, যে দুর্গাষ্টমীর দিন, স্বর্ণগোধার দেখা পাবে। স্বর্ণগোধা আসলে স্বর্ণময় বা সমৃদ্ধিময় ভবিষ্যৎ। সেই স্বর্ণগোধার দেখা মিলল না শেষ পর্যন্ত। কারণ শবরদের তো কোনো স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ নেই। 'শবর দিয়ে তিভূবন ছাঞে' দেওয়ার স্বপ্ন তাই আর দেখেনা কাল্যা। 'নগর আগালে শবরেরা ছিটা ভিটা' হয়।

মহাশ্বেতা দেবী একটি সম্পূর্ণ কৌম্যজীবনকে উপস্থাপিত করেছেন 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে। মঙ্গলকাব্যে বলাই বাহুল্য, তেমন কোনো কৌম্য জীবনের পরিচয় নেই। কারণ মঙ্গলকাব্যের ব্যাধ জীবনের কথা আসলে চণ্ডীর পূজা মাহাত্ম্য প্রচারের উপায়। মহাশ্বেতার কাছে এই মহাশ্বেতার মুকুন্দের ব্যাধখণ্ড আসলে মহাশ্বেতারই 'ব্যাধখণ্ড'। শুরুতেই বলা হয়েছিল মহাশ্বেতা দেবী মিথ ব্যবহার করেছেন এক বিস্ময়কর দৃষ্টিকোণ থেকে। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর মিথ-এর ব্যবহার মহাশ্বেতাদেবী তাঁর 'ব্যাধখণ্ড'

উপন্যাসে করেছেন এক বিস্ময়কর দৃষ্টিকোণ থেকে।

মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর মিথের ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মহাশ্বেতা দেবীর 'বেনে বউ' (১৯৯৪)। মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' যেমন চণ্ডীমঙ্গলের 'আখেটিক খণ্ড' অবলম্বনে লেখা, তেমনি 'বেনে বউ' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে চণ্ডীমঙ্গলের 'বণিক খণ্ড' অবলম্বনে। 'বেনে বউ' কাহিনীর মূলে আছে ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। বণিক খণ্ডের ধনপতি সদাগর ও খুল্লনার কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের একটি পরিচিত কাহিনী। উপন্যাসে কাহিনী এবং ধনপতি, খুল্লনা ও লহনা প্রত্যেকেরই নামের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। তারা হয়েছেন যথাক্রমে গণপতি, অহনা ও কণকা। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দের ও তার বউ-এর কথপোকথনের মধ্য দিয়ে গণপতি অহনা ও কনকার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসে অহনার জীবন কাহিনীর মধ্য দিয়ে যেন একাদশ বঙ্গাব্দের সমাজের নারীর অবস্থানটি মহাশ্বেতা দেবী চিহ্নিত করে দেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে চণ্ডীমঙ্গলের বা বলা ভালো মঙ্গলকাব্যের মিথ সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মিথ ব্যবহৃত হলেও এ উপন্যাস চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে লেখা এক আধুনিক উপন্যাস।

উপন্যাসের শুরুতেই মুকুন্দ স্ত্রীকে বলেছে— ''কত, কত রাত অবধি কান্না শুনি ওর, কত রাত অবধি। মাগো মনে হয় বউ। দামিন্যা গ্রামের লক্ষ্মী যেন কাঁদছেন। যেন বিচার চাইছেন। বিচার পান না, সেই দুঃখে কাঁদেন।" এরপর লেখিকা এইরকম বিবরণ দিয়েছেন— ''শুয়েও ঘুম আসে না মুকুন্দের। আজ অনেক দিন ধরে মুকুন্দ বেনে বউ অহনার নিচু গলায় অসহায় কান্না শোনে। শুধু সে শোনে? আর কেউ শোনে না? শোনে আর মনে হয় এ বড় অবিচার এ বড় অবিচার!" (পৃ. ৩) এখানে লক্ষ্যণীয় অহনা তথা গণপতির অবস্থান মুকুন্দের গ্রাম দামিন্যায় করেছেন লেখিকা।

একাদশ বঙ্গাব্দের সমাজের আর্কেটাইপটি মুকুন্দকে দিয়ে দেখিয়েছেন মহাশ্বেতা— ''দুধে সরে মানুষ করে অহনাদের বাবারা স্বচ্ছন্দে সতীন ঘরে বিয়ে দেয় ওদের। এমন তো হয়ই ননদ। অহনারা জলে ঝাঁপ দেয়, গলায় দড়ি দেয়, বিষ খায়। এতো চলে আসছে। এরকম তো ঘটেই সমাজে। কিন্তু অহনার চোখে যে বিলাপ ছিল দামিন্যাতে মানুষ নেইরে। মুকুন্দ কি করবে? গণপতির ওপর রাগ হল। বাঘিনীর হাতে ছাগলছানার ভার দিয়ে বিদেশে গেলে বা কেন?

'নিম তিতা, নিসুন্দা তিতা, তিতা মাকাল ফল
সবার অধিক তিতা কন্যা, বোন সতীনের ঘর।'
এ-কথা কি অহনার বাবা জানত না? (পৃ. ১৫)

চণ্ডীমঙ্গলের মূল কাহিনীর তথা চরিত্রের নামের যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন মহাশ্বেতা তা পূর্বেই বলা হয়েছে। উপন্যাসে গণপতি বেনের প্রথম স্ত্রী কনকাই স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ

দেবার উদ্যোগ নেয়— ''কনকা যে তার বিয়ের জন্য উদ্ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, এ কথা গণপতি বেনে সমাজে পাঁচজনের মুখে শুনছে এখন।'' (পৃ. ২৭) তবে কনকা স্বপ্নেও ভাবেনি যে গণপতি, নিজের বিয়ে নিজে ঠিক করে আসবে। কেমন করে হল, সে এক এক রূপকথা বটে— ''গণপতি বেনে, সে সপ্তগ্রাম, ফুলিয়া, শান্তিপুর থেকে কাপড় আনে, হাটে হাটে বেচে। গণপতির খুব সাধ, সে পুঁজি পেলে বাসন বেচবে। উৎকৃষ্ট কাঁসা, পিতল, তামার বাসনে খুব লাভ।.... কাপড় বেচতেই গিয়েছিল সে ত্রিনয়নীর বিখ্যাত বুড়োশিবের মেলায়। সেই মেলাতেই আসে কনকার মামা শচীপতি। মামা ভাগ্নী জামাইকে খাইয়ে, মাখিয়ে, নতুন ধুতি চাদর, কনকার শাড়ি দিয়ে গণপতিকে বশ করে ফেলল। তারপরেই পেড়ে বসল অহনার কথা।'' (পৃ. ৩০)

''বাড়ি কাছে আসছিল, গণপতি কনকাকে মানাবার কথা ভাবছিল। সন্তান, সন্তান চাই। গণপতি ভিখারি বাউল বোষ্টমকে প্রথম ভিক্ষা দিতে চায়। আট কুঁড়োর ঘর থেকে কোন ভিক্ষার্থী দিনে প্রথম ভিক্ষা নেয় না। এ দুঃসহ সামাজিক অশ্রদ্ধা থেকে গণপতি বাঁচতে চায়।'' (পৃ. ৩৬) দামিন্যাতে অহনা পর্বের সূচনা এভাবেই শুরু হয়।

মুকুন্দর বউ-এর কথাতেই গণপতির বিয়ের কথা জানা যায়— ''শুনেছ?....গণপতি বেনে নাকি কোন টুকটুকে সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করছে।'' (পৃ. ৬০) দামিন্যাতে এমন জাঁকজমকে কোন বউ আসেনি শ্বশুর ঘরে। ''ভিড় করে দাঁড়িয়ে সবাই অবাক হয়ে দেখল অহনার রূপ। শান্ত, ধীর, অপরূপ সুন্দরী অহনা।'' (পৃ. ৭৬) কনকার মনের ঈর্ষা তীক্ষ্ণ হতে পারল না। কারণ অহনা তার কোলে মাথা গুঁজে নীরব কান্নায় কনকার কোল ভিজিয়ে দিল। কনকা ও অহনার মধ্যে মিলমিশও ছিল বেশ। ''গণপতির বাড়িতে দুই সীতনে কেন মিলে মিশে আছে এ কথা সবাই বলে। গণপতির বড় চিন্তা অহনাকে নিয়ে কনকা এখনো কোন অশান্তি করেনি, যদি করে।'' (পৃ. ৮৯) এরপর গণপতি বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করতে তৈরি হয়। তাদের অত টাকায় দরকার কি? প্রশ্নের উত্তরে গণপতি বলে— ''দরকার তো হবে কনকা। ঘরে ছেলেমেয়ে আসবে.... খাওয়ার মুখ বাড়বে।'' (পৃ. ৯৭)। ''যদি হয়, তবে আমার বিদেশ থাকা কালে ওকে খুব সাবধানে রেখো। ছেলের জন্যই বিয়ে, নচেৎ বিয়ে কে?'' (পৃ. ৯৭)। কনকাও স্বামীকে কথা দিয়েছিল বুকে করে রাখবে।

কিন্তু কনকার স্নেহমমতার বাতাবরণ একদিন ছিঁড়ে গেল। অহনাকে দাঁড় করিয়ে দিল অগ্নিবলয়ের মধ্যে। সহসা অহনা সব হারিয়ে ভিখারিণী। গণপতির বালিশের মুখ খুলে তুলো নেড়ে ছেড়ে দিতে গিয়ে কনকার হাতে কি একটা ঠেকল। ''ছোট এতটুকু লাল কাপড়ের পুঁটলি। চারদিক সেলাই করা। কি আছে ভেতরে। কনকা দাঁতে সেলাই ছিঁড়ল। কটুগন্ধ ভস্ম। কনকা কেঁপে উঠল।'' (পৃ. ১১৮) এরপর থেকে যেন কনকার ভেতর ঝড় বয়ে যায়। এ নিশ্চয় কোনো কাউর কামিখ্যে জানা গুণীনের দেয়া জিনিস

হবে। পুটলিটি নিয়ে কনকা যায় গ্রামের গুণীন তেগুনার কাছে। পুটুলি দেখে তেগুনা বলে— ''আমার অষুদ.... তখনো কাজ করে নাই, এখনো করবে না।" (পৃ. ১২২)

এরপর দামিন্যার আকাশ চিরে পুটুলির নেকড়াটি হাতে নিয়ে কনকা বলতে থাকে— ''অহনা আমারে মারা করাবে বলে পিচাশ্যা অষুদ করেছে গো... বান্যার বালিশে সে অষুদ গুঁজা দিল গো! পিচাশী আমারে মারা করবে গো....' (পৃ. ১১২)। এই সময় থেকেই শুরু হয় অহনার উপর কনকার নির্যাতন। কনকা যেন এক বাঘিনী— ''ঘুমন্ত অহনার চুল ধরে তাকে মাটিতে ফেলে কনকা, ঝাঁটা দিয়ে মারতে থাকে।" (পৃ. ১২৩)। অহনার ভীষণ, ভয়াকুল আর্ত চীৎকার দিকে দিকে চলে যায়। মুকুন্দর বউ মনে মনে বলে— ''পিচাশের মত কেউ কারে মারে, সইতে পারি না। হে ঠাকুর। অহনারে বাঁচাও।" (পৃ. ১২৫)। ''কিন্তু একাদশ বঙ্গাব্দে ঠাকুর দেবতার কান নেই, হৃদয় নেই, ক্ষমতা নেই।" (পৃ. ১২৫)। এই উক্তিটির মাধ্যমে সেই সময়ের সমাজের অমোঘ সত্যটি যেন প্রকাশ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাই তখন শোনা যায় অহনার আর্ত মিনতি, মেরো না দিদি গো! আমাকে ছেড়ে দাও। এখন, দামিন্যার রাতের আবহসঙ্গীত এক অসহায়া নির্যাতিতা বালিকার করুণ কান্না।

তথ্যসূত্র:

১. Leach Maria: The standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend/Basil-1950.

২. Do

৩. Annandeb, C: The Concise English Dictionary/London 1914

৪. Mackenzie A. Donald: Create and pre Hellenie Eurpe/London- 1950.

৫. R.M.Maclver: The Web of Government/Macmillan, London- 1960.

৬. R.M.Moclver and C.H.Page:Society/Macmillan London-1969

৭. Stith, Tomson: The Folklore/London-1946.

৮. Arnold Van, Gennep: The Rites of Passage- 1960 London.

৯. Eliade, Mircea: The Sactred and the Profane- 1960 London.

১০. B, Malinowski: Magic Science and Religion- 1948 London.

১১. মহাশ্বেতা দেবী : ব্যাধখণ্ড

১২. মহাশ্বেতা দেবী : বেনে বউ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও বিশশতকের মধ্যবিত্ত

স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায়*

'মধ্যবিত্ত' এই শব্দটির মধ্যে দিয়ে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণির পরিচয়ই ফুটে ওঠে। ভারতের সামাজিক ইতিহাস থেকে জানা যায় মূলত মূঘল যুগেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূচনা হয়। মূঘল যুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই একটি শ্রেণির আবির্ভাব হয়। এরা প্রধানত বণিক ও পেশাদারি মানুষ। ইংল্যান্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে ভারতীয় মধ্যবিত্ত বলতে তা বোঝায় না। কে. এন. রাজ মনে করেন– উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সংগঠক ও অন্যান্যরা মধ্যবিত্ত, এদের সামাজিক অবস্থান ও পরিচয় এক। মার্কস বলেছেন –বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে দুটি পরস্পর বিরোধা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত সামাজিক গোষ্ঠী হল মধ্যবিত্ত। ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদ, সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাসের মধ্যবর্তী স্তরকে মধ্যবিত্ত বলেছেন। মূঘল যুগে এই শেষ পর্যায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়, তাদের পৃথক সত্তা স্বীকৃতি পায়। তারা এক পেশা থেকে স্বচ্ছন্দে অন্য পেশায় চলে যেত, জাতি বা প্রথা বাধার সৃষ্টি করতো না, পেশা পরিবর্তনের জন্য তারা ভৌগোলিক স্থানও পরিবর্তন করতো।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকে। মধ্যযুগে সামাজিক স্তর বিন্যাসের মূলেই ছিল ভূসম্পত্তি। এর ফলে স্থিতিশীল সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের আচরণও ছিল স্থিতিশীল। ব্রিটিশ আমলে আঠারো শতকেই নানা শ্রেণির উদ্ভব হতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্যই বৃদ্ধি পায়। ১৭৯৩ এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর উপরে জমিদার ও নিচের কৃষকদের মধ্যে বিশাল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়। যদিও নাগরিক জীবনের আকর্ষণে গ্রামের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ক্ষীণ ছিল। কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যে নগরজীবন তার মূল আকর্ষণের কারণই ছিল অর্থনৈতিক। বিনয় ঘোষ তাঁর 'কলকাতার মন' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন–

> ''যে মন নিয়ে যোব চার্নক সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন কররে ভবিষ্যৎ কলকাতা মহানগরের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মন হল পাশ্চাত্য বণিকের সজাগ ব্যবসায়ীর মন। তারপর ধীরে ধীরে কলকাতা হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের শহর কলকাতা। কলকাতার মন মধ্যবিত্তের মন।''[১]

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ, শ্রীরামপুর, হুগলী।

ইংরেজদের নানা প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের জন্য গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি নগরাভিমুখী হতে থাকে। এর ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালির যে যে রূপ প্রকাশ পেল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'কেরানী', 'সরকাবাবু' প্রভৃতি। ১৮৫৭-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরথেকে ইংরাজি শিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে থাকে এবং সাধারণ মধ্যবিত্তের শিক্ষালাভের আগ্রহ ও সুযোগও বাড়তে থাকে। সামাজিক বিবর্তনের ধারায় ইংরাজি শিক্ষার ফলে এই যে মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণির উদ্ভব হল তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সম্ভ্রমবোধ, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মানবিকবোধের প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তি নির্ভরতা এবং চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম ও জাতি সম্পর্কে উদার দৃষ্টি। রাজা রামমোহন রায় তাঁর ( ) গ্রন্থে এই সদ্যোজাত বাঙালি মধ্যবিত্তের চরিত্র প্রথম বিশ্লেষণ করেন। তিনি লেখেন–

> ''বাংলাদেশে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। এরা বিদেশি ইউরোপীয়দের আদব-কায়দা ধ্যান ধারণা অনুকরণ করছে। এদের পূর্বেকার ধর্মীয় বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে অথচ এর স্থান গ্রহণ করার মতো নতুন কিছু গড়ে ওঠেনি। চরিত্রে এদের বেশিরভাগ কৃষকদের চেয়ে নিম্নস্তরের, অনেক সময় এরা ছল-চাতুরি ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে আর একটি স্তর আছে যাদের মূলধন নেই বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে যায় না। এঁরা 'হোয়াইট কলার জব' পছন করে, অফিসে চাকরি করে এবং জীবিকার জন্য ধূর্তোমির আশ্রয় নেয়। নৈতিকতার মনদণ্ডে বিচার করলে দেখা যায় এরা অনেক নিম্নস্তরের মানুষ। যখন এরা দেখে সৎভাবে রোজগার করে সমাজে সম্ভ্রম, অর্থ বা প্রতিপত্তি লাভ করা যাবে না। এরা অসাধুতার পথ ধরে।''[২]

নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির পশ্চিমি শিক্ষার প্রভাবে পৃথক যে আর একটি সত্তা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা হল–ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সমাজ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও পরিবারের প্রবাব দুর্বল হয়ে গিয়ে প্রবল হয় ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতা বিবর্তিত হয়েছে নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে। এরপর এসেছে গুরুত্বপূর্ণ বিশ শতক।

বিশ শতক বাঙালীর সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই শতকেই বিশ্বের ইতিহাসে ঘটে গেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। তার প্রভাব পড়েছে বাঙালী জীবনে ও জাতীয় ইতিহাসে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় প্রথম যে আঘাত বাঙালী সমাজ পেলো তারই সমাপ্তি ঘটলো ১৯৪৩-এ মন্বন্তর, ১৯৪৬-এ সাম্প্রায়িক দাঙ্গা এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭-এ দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে। এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলি বাঙালীর

সমাজ জীবনেও প্রভাব ফেলেছে। মধ্যবিত্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন রূপে। মধ্যবিত্তের দ্বিচারিতা, অহমিকা, নৈরাশ্য, বিষন্নতা, আত্মতুষ্টি, ভোগ প্রবণতা, ব্যক্তিস্বার্থবোধ, মূল্যবোধের নিম্নগামীতা তাকে সমাজে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর্থ-সামাজিক কারণেই নারী পুরুষ উভয়েই বিবর্তিত হয়েছে, শুরু হয়েছে নতুন দ্বন্দ্ব।

বিশ শতকের এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বময় সমাজের অন্যতম সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্প গুলিতে প্রকাশ করেছেন এই বিশ শতকের মধ্যবিত্ত নারী পুরুষের এক জীবনবোধকে। যে জীবনবোধ পরিচালিত সমসাময়িক নানা ঘটনার দ্বারা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটগল্পের আলোচনা করলে বিশ শতকের মধ্যবিত্ত সমাজে সম্পর্কে একটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় তাঁর ১৯৩৯-এর ১৭ আগস্ট প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'-এর 'সরীসৃপ' গল্পটির কথা। গল্পের দুই নারী চারু ও পরী পরস্পর সম্পর্কে বোন হলেও এক পুরুষকে নিয়েই তাদের দ্বন্দ্ব। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী নারীর মূল্যবোধ ধ্বংশ হয়ে যায় প্রবৃত্তির কাছে। চারুর শ্বশুড় রামতারণের বিশাল সম্পত্তি স্বামীর মৃত্যুর পর চারুর পক্ষে আর রক্ষা করা সম্ভব হল না। অত্যন্ত সুকৌশলে সেই সম্পত্তির সবই গ্রাস করে তাদেরই আশ্রিত বনমালী। বয়সে বনমালী তার থেকে দু-বছরের ছোট হলেও তাকেই চারুর শ্বশুড় বউমাকে পাহারা দেওয়ার কাজে লাগাতেন। স্বামী জীবিত থাকতেও তাদের শোবার ঘরের পাশেই বনমালীর বিছানা হতো এবং মাঝখানের দরজা খোলা থাকতো। উভয়েরই উভয়ের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও তা কেউ কোনও দিনই প্রকাশ করেনি। চারু সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য–

> ''চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।...হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন–এরকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।''[৩]

মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই চারু সংযত করেছে নিজের অতৃপ্ত প্রবৃত্তিকে। আবার বণমালীর চারু সম্পরের্ক মূল্যায়ন বোঝা যায় লেখকের এই বক্তব্যে–

> ''চারু তার প্রথম বয়সের নেশা; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে, চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহমন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে নিয়া খেলা করিত। ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক

গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন মাসের পর মাস।"[৪]

বনমালী তাঁর মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকেই চারুর প্রতি তার এই আকর্ষণকে প্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু চারুর বোন পরী অল্প বয়সে বিধবা হয়ে চারুর বাড়ীতে আশ্রয় নিলে বনমালীর প্রতি পরীর আকর্ষণ দেখে চারু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার অন্তরের সুপ্ত প্রবৃত্তি জগ্রত হয়ে ওঠে এবং সমস্ত মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে চারু পরীকে কৌশলে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। নিজের সন্তান এর ভবিষ্যত, নিজের সুপ্ত কামনা বিষাক্ত হয়ে তার নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে একদিকে মূল্যবোধ অন্যদিকে চিরন্তন প্রবৃত্তি এই দুই এর দ্বন্দ্বে মধ্যবিত্ত নারী চারু নিজেকে হারিয়ে ফেলে এই দ্বন্দ্ব দেখা যায় পরি চরিত্রেও। পরি নিজের মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে বনমালীর কাছে বারবার নিজেকে সমর্পণ করতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত নিজের সন্তানের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে চারুর কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে ভুবনকে বহুদূরের ট্রেনে চাপিয়ে দেয়। পারিপার্শ্বিক ঘটনা কীভাবে মধ্যবিত্ত সমাজকে মূল্যবোধ থেকে মূল্যবোধহীনতায় নিয়ে যায় তারই প্রমাণ পরি চরিত্রটি। ঠিক এইভাবেই ভুবনের চলে যাওয়া সম্পর্কে বনমালী যখন বলে 'আপদ গেছে যাক' তখনই যেন প্রকাশ পেয়ে যায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর নির্লিপ্ত চরিত্রটি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৌ' নামক গল্পগ্রন্থে বেশ কয়েকটি পেশার পুরুষের বউদের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তার মধ্যে 'কেরাণীর বৌ' উল্লেখযোগ্য। কেরাণী পেশাটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সরসী। 'অস্থি মাসের বিন্যাসে' যে আকর্ষণীয়। ছেলেরা তার সাথে অপকর্ম করতে চেয়ে তার কামড় খেলে সমাজের নিয়ম অনুযায়ী দোষ হয় তারই। ষোল বছর হওয়ার আগেই রাসবিহারী নামক কেরাণীর সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়। রাসবিহারী যে পরিপূর্ণ ভাবেই মধ্যবিত্ত বাঙালী তা তার বর্ণনাতেই পাওয়া যায়–

''রাসবিহারীর সাইজ মাঝারি, চেহারা মাঝারি, বিদ্যা মাঝারি, বুদ্ধি মাঝারি। যাকে বলে মধ্যবর্তী, তাই। সরসীকেও সে মাঝারি নিয়মে ভালোবাসিল।"[৫]

বিয়ের পরও সরসীকে থাকতে হয় নিয়মের বাঁধনে। তার ছাদে ওঠা, রাস্তা দেখা সব কিছুতেই সকলেই সন্দিহান হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে সব বাঁধা মেনে নেয় অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। তার ইচ্ছা হয় আত্মহননের, মনে হয়–

''কে অনুমান করিতে পারিবে সকলের সামনে আত্মোন্মচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না বলিয়া, আঘাতের ভয়, অপমৃত্যুর ভয়ের চেয়ে সকলের সামনে মরিবার ভয় প্রবলতর ছিল বলিয়া, সে এ কাজ করিতে পারিয়াছে? নিজের অনন্ত দুর্বলতার

বিরুদ্ধে এ শুধু তার একটা তীব্র প্রতিবাদ, আপনার প্রতি তার শেষ প্রতিশোধ।"[৬]

কিন্তু প্রতিবাদ সুপ্তই থেকে যায়। নিজের মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই পুনরায় ব্যাপৃত হয়ে যায় স্বামীকে খুশী করার জন্য সংসারের কাজকর্মে। রাসবিহারীর মধ্যবিত্ত মানসিকতা স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিতে পারেনি আর তার স্ত্রী সরসী অন্তরের অদম্য বাসনাকে চাপা দিয়েছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েও পুনরায় মিশে গেছে গতানুগতিকতার স্রোতে। এই গতানুগতিক পথ বেছে নেওয়া মধ্যবিত্তের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থের 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পটিতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজ, যাদের সাধ থাকলেও সাধ্য কম। এই গল্পগ্রন্থের ভূমিকাতে 'লেখকের কথা' অংশে লেখক লিখেছেন–

> ''ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদ' এর গল্পগুলি লেখা।...মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না বটে, তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি।''৭

. 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পটি এই সংকলনের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। নীলার সমুদ্র দেখার সাধ বহুদিনের। কিন্তু কেরাণির পিতার পক্ষে সে সাধ সহজে মেটানো সম্ভব নয়। তার বাবা তার মা-কে নিয়ে একাকী সমুদ্র দর্শন করে এলে নীলা ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ে। তার পিতা পরবর্তীকালে তাকে সমুদ্র দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তার আগেই তিনি স্বর্গে চলে যান। এরপর তার বিয়ে হয়ে গেলেও সমুদ্র দেখার স্বপ্ন ও সাধ তার অন্তরে গভীর ভাবে থেকেই যায়। কিন্তু সে নিরুপায়, তাই সমুদ্রের কথা মনে পড়লেই তার চোখেও সমুদ্রের নোনা জলের মতই অশ্রু নামে। তার এই যন্ত্রণা বোঝার মত ক্ষমতা শ্বশুড় বাড়ির কারোরই ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই কান্না তার ব্যারাম বলে প্রতিপন্ন হয়। শাশুড়ী তার ছেলেকে বলে–

> ''আগে ভাবতাম, বউ বুঝি বড্ড অভিমানী, এখন দেখছি তাতো নয়, এ যে ব্যারাম। আমাদের কিছু বলতে কইতে হয় না, নিজে নিজেই কাঁদতে জানে। ওবেলা ও বাড়ির কানুর মা মহাপ্রসাদ দিতে এল, বসিয়ে দুটো কথা বলছি বউ কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে, বলা নেই, কওয়া নেই ভেউ ভেউ করে সে কী কান্না বউয়ের! সমুদ্দুরে চান করার গল্প থামিয়ে কানুর মা তো থ বনে গেল। যাবার সময় চুপিচুপি আমায় বলে গেল, বউকে মাদুলি তাবিজ ধারণ করাতে। এ সব লক্ষণ নাকি ভালো নয়।''৮

এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ-কাল-পরসুর গল্প' সংকলনের 'যাকে ঘুস দিতে হয়' গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ধ্বংসের চিত্র। যেখানে স্বামী নিজের

স্ত্রীকে ব্যবহার করে কাজে কনট্রাক্ট পাওয়ার জন্য অথবা 'টিচার' গল্পের গিরীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই রায়বাহাদুরের প্রতি প্রতিবাদ জানায়। এক অভিনব পদ্ধতিতে। যার পর থেকে তার মনে হয়েছিল সে বরখাস্তের নোটিশ পেলেও–

> ''রায়বাহাদুর ভুলতে পারবে না, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্রের মাতাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা। দয়ামায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।''[৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ শতকের এই মধ্যবিত্ত সমাজকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্তের আত্মকেন্দ্রিকতা মতানুগতিকতা যেমন– প্রকাশ পেয়েছে সেরকমই মধ্যবিত্তের প্রতিবাদী চরিত্রও তার রচনাতে প্রকাশ পেয়েছে।

গ্রন্থসূত্র:

১। কলকাতার মন, বিনয় ঘোষ
২। রামমোহন রায়
৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩
৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৯
৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৩
৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৬
৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯৪
৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১০০
৯। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২৮

সংস্কৃতির রাজনীতি ও ভারতের জাতীয়তাবাদ : নব চিন্তাবিদ গোপাল হালদার

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়*

সমাজ সচেতন প্রাবন্ধিক রূপে গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর পাণ্ডিত্য, স্বাধীনচিত্ততা ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্মোচন ঘটেছে তাঁর দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়নে। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির বহুধাবিস্তৃত এষণা, সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় নব দিকনির্মাণ, সৃষ্টিশীল কথাসহিত্য গ্রন্থনে নূতনতর প্রয়াস, সাহিত্য সমালোচনা, মনীষী সমীক্ষা, অভিভাষণ প্রভৃতি নানা পরিমণ্ডলে তাঁর দূরদর্শিতা অবশেষে মানবমহিমা ও মানব কল্যাণ কামনায় এসে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পেরেছে। তাঁর দূরদর্শিতা অবশেষে মানবমহিমা ও মানব কল্যাণ কামনায় এসে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পেরেছে। তাঁর কর্মসাধনা সমগ্র বাংলা তথা বৃহত্তর ভারতের মানব জীবনাদর্শের উপলব্ধি, যা তাঁকে কার্যত স্বতোপ্রণোদিত করেছে আধুনিক ভারতের আর্থ-সামাজিক তথা আর্থ-রাজনৈতিক নানা পরিবর্তনের দিকচিহ্ন নির্মাণে। সে হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও লেখকদের লেখক আখ্যায় আখ্যায়িত হতে পারেন।[১] লেখক হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বোধীর স্পষ্টতাকে তিনি তাঁর রচনার আঙ্গিনায় নানাভাবে তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি বিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের সংগ্রামী জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত সম্যক অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রকৃত অর্থে মানবপ্রেমিক করে তুলেছে। তাই হয়তো তিনি বলতে পেরেছেনঃ–

''আমাদের কাল শান্ত জীবনের কাল নয়। সুন্দরের ধ্যান সম্ভব হয়নি আমাদের। বিংশ শতাব্দীতে মানুষের তপস্যা একটা সীমান্তে এসে পৌঁছুচ্ছে–হয় সিদ্ধি নয় পতন। চারিদিকে মারের মোহ, তাড়না, বিভীষিকা। মানুষে বিশ্বাস না হারানো এ যুগে দুঃসাহসের কথা।...সাধারণ মানুষের অসাধারণতা আর অসাধারণ মানুষেরও সাধারণতা আমাদের এই শতাব্দীর একটা বড় আবিষ্কার। তাই আমার কাছে পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয়েছে মানুষের মুখ। সাধারণ মানুষের, অসাধারণ মানুষের, সকল মানুষের।"[২]

নিজেকে সকল রাজনৈতিক প্রবক্তা বা মতবাদের উর্ধ্বে স্থাপন করে ফলপ্রসূ সমাজে সাধারণ মানুষের মুখের অনুসন্ধানে ব্রতী হতে চেয়েছেন তিনি।

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।

বিশ শতকের বিশের দশকের গোড়া থেকেই ভারতে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' এবং ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার (১৯২৭-২৮) সুবাদে তা ত্বরান্বিত হয়। তিরিশের দশক ছিল বিশ্বব্যপী অর্থনৈতিক মন্দার দশক। এ সময় থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের একাধিপত্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলও আলোড়িত হয়। এ ছিল 'কল্লোল'-এর কাল। বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে সামাজিক অস্থিরতা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের লবণ আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১), সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্যতম নজির স্বরূপ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০) এ সময়েই সংঘটিত হয়। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাসের প্রথম উপন্যাস 'একদা'। অন্নদাশংকরের 'সত্যাসত্য' ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাসেও সাম্যবাদী চেতনা সহ, শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য রাজনৈতিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকীয় ভারতবর্ষ তথা বাংলার নবজাগরণ মনস্বী ভাষাবিদ গোপাল হালদারের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এক নবায়ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তৎসহ তাঁর লেখা 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' (১৯৫৬), 'বাঙালা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি' (১৯৫৬, 'ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্য' (১৩৭১), 'জাতীয় সংহতি ও ভারতের ভাষা সমস্যা' (১৯৮৫), 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' (১৯৮৬) প্রভৃতি পুস্তিকা ও মারাঠী, অসমীয়া, হিন্দী, তামিল, কন্নড় ভাষায় অনুদিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি থেকে তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনার মূলসূত্রগুলিও চোখে পড়ে। ইসলামি আরবি কালচারের রূপান্তর প্রসঙ্গে মধ্যযুগের ভারত তথা বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি একসময় যে যৌথ সৃষ্টির অবয়ব গঠন করে সে সম্পর্কেও তাঁর মতামতগুলি প্রণিধানযোগ্য। একদিকে হিন্দু ঐতিহ্যের ধারাস্বরূপ হিন্দুদর্শন, হিন্দু পুরাণ সহ হিন্দুর আচার-বিচার প্রভৃতি ও অন্যদিকে মুসলমানী কোরাণ, হাদিশ সহ আরবী-ইরানী-তুরানী মিশ্রিত ইসলামী ধর্মকাহিনীগুলি মধ্যযুগ থেকেই বাঙালী মানস তথা ভারতীয় জনতার যৌথ জীবনের প্রধান ও প্রশস্ত বনিয়াদ—ভারতীয় সংস্কৃতির এমন মিশ্র বুনোট তথা বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁর ন্যায় কৃতবিদ্য ও সমাজ-সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী প্রাবন্ধিকের লেখনী থেকেই উঠে আসে। প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে যৌগিক জাতীয়তাবাদী সামাজিক রূপান্তরের যে সাংস্কৃতিক ধারাটিকে প্রবাহিত হতে দেখেছিলেন তা আজকের একবিংশ শতাব্দীতেও এসেও খুব বেশী প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। বিশেষ করে, ভেদভাব মুক্ত যৌগিক জাতীয়বাদী চিন্তার সম্প্রসারণে লেখক নির্দেশিত পথে লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি সংগ্রহণের দিকেই আজ আমাদের বেশী করে যত্নশীল হতে হবে।

ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু আগে অর্থাৎ বিশ বা তিরিশের দশক থেকেই শোষক ইংরাজ ভারতের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজনের নানা কুটিল প্রয়াস চালিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের জটিলতার প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে উঠলেই শোষিত সর্বহারার ঐক্যের অপরিহার্যতার মার্কসবাদী ধারণাটি যে গৌণ হয়ে গেছে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এমন নজির আমরা বারংবার দেখতে পাই। কেতাবী মার্কসবাদ অনুসরণকারীদের ন্যায় গোপাল হালদার কখনই একথা ভাবেন নি যে, শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরসনের সঙ্গে অবিচল থেকে তিনি একথা ভাবতে ও ভাবাতে সমর্থ হয়েছেন যে, উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে শ্রেণীবিভাজনজনিত রূপান্তরের দ্বারা কখনই হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সমাজ-বাস্তবতাটি প্রত্যাশিত অর্থে প্রভাবিত হয় না। এখানেই কট্টর মার্কসপন্থার সাথে গোপাল হালদারের আদর্শের বিরোধের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলামের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তদোদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের দিকটি প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিপথে উঠে এসেছে। তিনি বলেছেনঃ

''ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল না; তাহার কারণ ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ তত্ত্বের বেশি পরোয়া করে না, কোনো বিচার বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না। ইসলাম সেমিটিক গোষ্ঠীর ধর্ম—তাহার হিসাবপত্রও সে গোষ্ঠীর মতো একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুধর্ম বলিতে পারে 'একমেবাদ্বিতীয়ম', 'সর্বংখলিদং ব্রহ্ম'। আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু দ্বিতীয় কেন—গাছ, পাথর, পশু, মানুষ যে কোনও জিনিসকেই দৈবশক্তির আধার বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইসলামে এইরূপ তত্ত্বকথার, গোঁজামিলের স্থান মুখে বলিবে 'তত্ত্বমসি' এবং কার্যক্ষেত্রে সকলকেই অধিকারভেদ পৃথক কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই দুই ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলনের পূর্বাপরই দুর্ঘট রহিয়াছে।''[৩]

গোপাল হালদারের মতে 'ধর্ম' হিসাবে 'ইসলাম' যেখানে যেখানে প্রাধান্য ও বিস্তৃতি লাভ করেছে, সেখানকার প্রচলিত ও পবম্পরাগত সংস্কৃতিকে তা কিছুটা পরিমাণে প্রভাবিত করলেও তা তার মৌলিক প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলিকে কখনই সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে পারেনি। ফলে প্রাচীন ইরান তার ইরানি সংস্কৃতির প্রাধান্যকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে তুর্কিস্থান ও আজারবাইজানের মতো দেশগুলির ক্ষেত্রেও। ইন্দোনেশিয়া অথবা মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলির দিকে তাকালেও দেখা যায়, সেখানে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও প্রাচীন সংস্কৃতির আপন আপন বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের কোনোরূপ অন্যথা ঘটে নি।

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতার বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোপাল হালদার একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সমাজের 'নির্বিরোধ প্রতিরোধ'[৪] বা 'কর্মঠ বৃত্তি'[৫]-র কথা বলেছেন তেমনই অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের লৌকিকীকরণের প্রসঙ্গটিও তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগের বিজয়ী মুসলমান শাসক যখন রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাজিত হিন্দু সামন্তদের উপর ইসলামের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে তখন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা কোণঠাসা হলেও উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ শাসিত গ্রামগুলিতে 'নির্বিরোধ প্রতিরোধ' কর্মসূচীর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তখন বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের উচ্চবর্ণাশ্রিত বহু গ্রামেই হিন্দু সমাজপতিদের দাপট ছিল চরমে। ঐ সকল অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দুবর্গের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দু স্বধর্মারোপিত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনগুলি যেমন সুতীব্র ছিল তেমনই প্রায় সম্পূর্ণতঃ গ্রামকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের মানুষের সমাজচ্যুতির ভয়ও ছিল প্রবল। অন্যদিকে উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতের (যথাঃ পূর্ববঙ্গ) অব্রাহ্মণ অধ্যুষিত বহু গ্রামেই ইসলাম ধর্মের বাড়বাড়ন্ত ও মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

গোপাল হালদারের মতে, বাংলা মুলুকে সমাজের নিম্নস্তরে শ্রমজীবী হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কায়ণে একসময় এক নতুন বিন্যাস সৃষ্টি হয়। যদিও এই নতুন বিন্যাস বা রূপান্তরকে তিনি কখনই বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির জয়যাত্রা বলে স্বীকার করে নিতে চান নি। তথাপি এই রূপান্তর তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের তৃণমূল স্তরের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তাদের মৌলিক ভাষা সহ সামাজিক ও সাস্কৃতিক বহু ক্ষেত্রে এক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ইসলাম ধর্মবাহিত তথাকথিত বিদেশী আরব কালচার ভারতবর্ষের বুকে তার উত্তরাধিকার লাভ না করলেও ইরানী ও তুর্কী জাতিদের হাতে কিছুটা ইরানী-তুরানী মিশ্রিত হয়ে সেই ইসলামী আরব সভ্যতা তরঙ্গের পর তরঙ্গে নানা পরিবর্তিত রূপ নিয়ে ভারতে এসেছিল। ইসলামী সংস্কৃতির সেই বিমিশ্রণের রূপ লেখকের ভাষায়ঃ-

''তারপর এদেশের বিবিধ ক্ষেত্রে তা বিবিধ স্থানীয় দানকেও গ্রহণ করেছে, আবার যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের দরবারি কালচারের রূপটিও ছিল এরূপ আরবী-তুরানী-তুর্ক মিশ্রিত ভারতীয় রূপ—প্রধানত তা ফার্সি। আর তার লৌকিক রূপ ছিল আরও সহজ এবং ভারতের প্রত্যেক ভাষা ও প্রদেশের ছাঁচে আরও বেশি ঢালা। তার একদিকে ছিল সুফী ও সাধকদের অধ্যাত্ম প্রভাব, অন্যদিকে জীবনের দশ আনা জুড়েই ছিল গতানুগতিক লোকজীবনের আচার-নিয়ম অনুষ্ঠানের চিরায়ত ধারা—যাতে পিতৃপূজা হয়ে উঠত স্তূপ-পূজা, আর স্তূপ হয়ে উঠতে থাকে পীরের দরগা; যাতে সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ মিলে যান; কালু রায়, দক্ষিন রায় পূজা পান। মুসলমান এসে দেয় গাছতলায় তেল-সিঁদুর আর হিন্দু এসে নেয় মসজিদের জলপড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।''[৬]

ইসলামের শরিয়তি আচার-বিচারের ধারা কিংবা হিন্দু দর্শন এবং পুরাণের ধারা এক স্বতন্ত্র গতিপথ প্রাপ্ত হলেও প্রাবন্ধিকের মত হলো, মধ্যযুগের বঙ্গসংস্কৃতির প্রধান অঙ্গটি ছিল হিন্দু-মুসলমানের যৌথ অথবা যৌগিক সৃষ্টির ধারা। সে কারণেই হয়তো তিনি বলেনঃ

''মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান এবং প্রশস্ত কোঠাটি সমস্ত বাঙালির যৌথ সৃষ্টি; তার বুনিয়াদ সমগ্র বাঙালি জনতার যৌথ জীবন।''৭

বাঙালীর যৌথ অথবা যুগ্ম জনজীবনের রূপাকার হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে গোপাল হালদারের পরবর্তী উপলব্ধিটি আরো বেশী আবিষ্কারী এবং অভিনব। আদি যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে যে বৌদ্ধধর্ম কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক উদাহরণ হলো চর্যাপদ। প্রাবন্ধিকের মত হলো—মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে এই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমান কখনই সেভাবে একাকার হয়ে যেতে পারেনি। অন্যদিকে আচার-বিচার ও ধর্মাচরণে পার্থক্য থাকলেও মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙালী সমাজে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিরোধ সেভাবে কখনই দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে শাসক মুসলমান ও প্রজাগণ হিন্দু হওয়ায় শাসকের উপদ্রব ও উৎপীড়ন হতো ঠিকই, কিন্তু তা সাধারণ বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান প্রজার মধ্যে বিভেদের দেওয়াল তুলে দেয়নি। ফলে লোকজীবনে তারা যেমন নিজ নিজ ধর্মাচরণ করেছে তেমনই একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানির পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ যৌথ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও করে গিয়েছে। লেখকের ভাষায়ঃ- ''বিচিত্রের মধ্যে তাই ঐক্যই হয়েছে জয়ী।''৮

'জাতীয়তাবাদ' শব্দটিকে বিশ শতকের গোড়া থেকেই আমরা আরো ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করতে শুরু করেছি। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল তো বটেই, স্বয়ং জাতীয় কংগ্রেসেই জাতীয়বাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে অজস্রবার। ঐক্যবদ্ধ জাতীয়বাদী আন্দোলনকে ভঙ্গ করতে ইংরাজ সরকার রোপণ করেছিল সাম্রদায়িকতার বীজ। তাই মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলিম অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষণগুলি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ক্রমশঃ মুছতে শুরু করে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ছিল এই বিভেদের প্রথম আয়োজন। গোপাল হালদারের ব্যাখ্যায় এই সময়ের বর্ণনাঃ

''দিনটা সেই ১৯২৩-২৫ থেকে নোয়াখালিতে যে অবস্থাটা ঘনিয়ে তুলেছিল তাতে আর যাই হোক আমার অস্বস্তি বাড়ল। আমার চারিদিকে আঁধি। অবশ্য সারা ভারতবর্ষ জুড়েই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়ছিল।....আসলে যে জাতীয়তাবাদের উপর আমাদের রাজনৈতিক চেতনা—সেই রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কিমের আমল থেকে গড়ে উঠেছিল —সেই জাতীয়তাবাদের গোড়া ধরে টান পড়েছিল। যতই মুসলমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী সংখ্যায় বাড়ল আর আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সচেতন হতে

লাগল, ততই তারা তাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের রূপ দেখে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। ঠিক যে জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি বিমুখ হল তাও নয়। তবে তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় রন্ধ্র বেড়ে গেল।"[৯]

এই প্রসঙ্গেই ভারতীয় সংস্কৃতির সাপেক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দাঁড় করিয়ে প্রাবন্ধিক বলেনঃ—

''যদি ভারতীয় 'কম্পোজিট কালচার'-এর উপর কোনো 'কম্পোজিট জাতীয়তাবাদ'-এর পলিটিকস্ প্রথম থেকে দেশে গড়ে উঠত তা হলে হয়তো 'তৃতীয়পক্ষের' ভেদনীতির খেলাতে এত সুবিধা হত না। কিন্তু কার্যত যা হয়, তাতে কী যে হতে পারে ভারতের জাতীয়তার সূত্র তা মুসলমানরাও বুঝে উঠতে পারে নি, হিন্দুরাও না।"[১০]

মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থার ইতিহাসে প্রাবন্ধিক যে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবকে লক্ষ্য করেছিলেন তা বিংশ শতাব্দীতে এসে গাঢ়বদ্ধ হয়ে এক নতুন জাতীয়তাবাদের জন্ম দিতে পারতো, কিন্তু ইংরাজের ভেদনীতির ফলস্বরূপ বাস্তবে তা ঘটেনি, ফলে মিশ্র জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে ভারতবাসী অবহিত হবার কোনো সুযোগ পায়নি।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী বাঙালী-সমাজ মিশ্র জাতীয়তাবাদের সূত্রটা ধরতে পেরেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে মানব-মিলন ও মহা-সম্প্রীতির কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন মানবতাবাদই তার গোড়ার কথা। অথচ, ভিন্ন সম্প্রদায়ের এই যৌথ সম্পাদন যে মধ্যযুগ থেকেই প্রচলিত ছিল এবং তা যে ভারতের এক বিশেষ ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা—একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সে সত্যটি বুঝতে আমাদের যথেষ্ট সময় লাগছে। জাতীয়তাবাদের উল্টো কথাটিকে যদি সাম্প্রদায়িকতা বলা যায় তবে ভারতবর্ষের ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক রাজনীতিতে তা বারে বারেই এসেছে। কোনো শ্রেণীশক্তি যখন রিলিজিয়নকে ব্যবহার করে এক অনুগত ও ব্যাপক সমর্থন সৃষ্টি করতে চায় তখন তা ঐ রিলিজিয়ন ও তার রাজনীতিক ঐক্যকে সাম্পদায়িক রূপেও চিহ্নিত করে। অতীতের ভারতবর্ষে এর অস্তিত্বটিও ছিল নানা মোড়কে। উনবিংশ শতকে যেমন বাবু কালচারের সাথে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক ছিল তেমনই তা ছিল মিঞা কালচারের সাথেও। তবু আজও আমরা শুধুই মিঞা কালচারকে এই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করে থাকি। আজ তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকরাও মধ্যযুগের তৈরী ইসলামিক ঐতিহ্যের অবদানকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে অথবা হিন্দুধর্মান্তর্গত জাত-পাত-শ্রেণী-বর্ণ নিয়ে রাজনীতির অন্য কারিগরেরা মানবিকতার প্রাসঙ্গিকতাটি নিয়ে ভাববার চেষ্টাই করছেনা। অথচ, ভারতের মতো বৃহৎ দেশের সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী দুটি সম্প্রদায়ের মিশ্র জাতীয়তাবাদী সম্পর্কের

উপযোগিতা নিয়ে প্রাবন্ধিকের গড়ে তোলা ভাবনাটিকে আজ ভারতের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার রূপকল্প হিসাবে গ্রহণ করাই যায়। বিংশ তথা একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের 'ধর্ম' থাকবে, কিন্তু তা সাম্প্রদায়িক ভেদ অথবা বিরোধ ডেকে আনবে না, সৃষ্টি করবে না সাম্প্রদায়িক হানাহানি অথবা দাঙ্গা; এটাই হলো মিশ্র জাতীয়তাবাদের মূল কথা। প্রাবন্ধিক গোপাল হালদারের মতে, বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতি থেকে একদা মিশ্র সংস্কৃতির যে ধারাটি সৃষ্টি হয়েছিল, মিশ্র জাতীয়তাবাদী ধারণার রক্ষণে তা থেকে সহায়তা ও শিক্ষা নেওয়া যেতেই পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশ তথা বাংলার লোকসংস্কৃতি এতটাই সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যশালী এবং তা একাদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক সামাজিক ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে যা ভারতের মতো দেশে পূর্ণ জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে সক্ষম। চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিংবা লালন ফকিরের চিরন্তন ধর্মসমন্বয়ী ভাবনাগুলিকে আজও নিরন্তর ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অতীতের নানা সমাজের গণতান্ত্রিক ও মানবিক সংস্কৃতিগুলিকে বর্তমান কলের শ্রমিক আন্দোলন ধারাকৃত আন্তর্জাতিকতার সাথে যোগ করাটিকেই কমিউমিনিস্টরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য বলে মনে করেন। আন্তোনিও গ্রামশ্চির মতে, শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্টদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনই তাদের শ্রমজীবী আপন শ্রেণীর অর্গানিক ইন্টেলেকচ্যুয়াল করে গড়ে তোলে। লুনাচারস্কি একেই বলেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-আন্দোলন। মার্কসীয় ধারণার বশবর্তী হয়ে গোপাল হালদারও একসময় ভেবেছিলেন, কম্যুউনিজম্ নির্দেশিত নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে হয়তো একদিন লোকসমাজ অভ্যন্তরস্থ ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিলুপ্তি ঘটবে, যা থেকে তারা একদিন নিজেরা—আপনা-আপনিই সকল বিদ্বষ ও সর্ব ভেদমুক্ত হবে। শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সরকারী নিয়ন্ত্রণ করে একসময় কম্যুউনিস্ট দেশ সোভিয়েত রাশিয়ায় নাস্তিক্যবাদ প্রচারের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু সে দেশের বৃহদংশের মানুষের প্রবল ধর্মোন্মাদনা সরকারী সেই প্রয়াসে জল ঢেলে দিয়েছিল। আর ভারতবর্ষের মতো আমূল ধর্মাশ্রয়ী দেশে এমন নাস্তিক্যবাদী বাতাবরণ সৃষ্টি করা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। আবার তত্ত্বগতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদে পৌঁছোনো সম্ভব হলেও বহুশ্রেণীবিভক্ত আধুনিক ভারতীয় সমাজে আজ আর তা সম্ভব নয়। ভারতীয় রাজনীতিতে আজ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীসমাজ তাদের নিজস্ব জাতিগত স্বীকৃতি নিয়ে উঠে আসছে এবং অন্য শ্রেণীসমাজ তাদের নিজস্ব জাতিগত স্বীকৃতি নিয়ে উঠে আসছে এবং অন্য শ্রেণী সমাজের প্রতি তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছে। এমতাবস্থায় সাম্যের পরিবেশ আজ আর শুধুমাত্র ধর্মেই সীমাবদ্ধ নেই। সব মিলিয়ে, কম্যুউনিজম প্রযুক্ত তথাকথিত নাস্তিক্যবাদী ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদ

যে কোনোভাবেই তার প্রার্থিত আন্তর্জাতিকতাবাদের লক্ষ্যে পৌঁছোবে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গোপাল হালদার বিধৃত মিশ্র জাতীয়তাবাদের ধারণাটি একবিংশ শতকের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেও নতুনভাবে এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। কম্যুউনিস্ট গোপাল হালদার সম্ভবতঃ যে শ্রেণী সমাজের সাপেক্ষে মিশ্র জাতীয়তাবাদের রূপরেখা নির্মাণ করেছিলেন একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এসে তা গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী অথবা গোঁড়া মুসলিম মৌলবাদী রাজনীতির প্রভাবে কীটদষ্ট হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ সুগম-শ্রেণীস্বার্থের অনুকূল হওয়ায় জাতীয় সংহতি ক্ষুন্ন হচ্ছে। একাধিক সম্প্রদায়ের একত্র সহাবস্থান থাকবে অথচ তাদের মধ্যে কোনোরূপ ভেদ ও বিদ্বেষভাব থাকবে না এমন পরিবেশ সৃষ্টিই কম্পোজিট ন্যাশনালিজম্ বা মিশ্র জাতীয়তাবাদের মূল কথা। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে মিশ্র লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিও আর তেমনভাবে মানব ভাব-সম্মিলনের সহায়ক হয়ে উঠছে না। লোকধর্মের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লালন অথবা চৈতন্যদেব সহ অন্যান্য গৌণধর্মের নেতৃবৃন্দ মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় স্থাপন করে গিয়েছিলেন, কালের প্রভাবে তার অনেকগুলিই আজ বিলুপ্তপ্রায়। ধর্ম সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক সচেতনতা ও স্পর্শকাতরতাও ক্রমেঃই অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাই চরম ভয়ের কথা! এমতাবস্থায় জাতীয়তাবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পুনরায় লোকধর্মগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। লোকধর্মগুলির সহিত লোকসংস্কৃতির যথাযথ যোগসূত্রস্থাপনও এ প্রসঙ্গে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্রঃ

১. গোস্বামী অচ্যুত, বাংলা উপন্যাসের ধারা, ২য় সং, পৃঃ ৩৮৪
২. হালদার গোপাল, রূপনারায়ণের কূলে (১ম খণ্ড), পৃঃ ২
৩. হালদার গোপাল, সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃঃ ১১৪-১১৫
৪. তদেব, পৃঃ ১১৪-১১৫
৫. তদেব, পৃঃ ১১৪-১১৫
৬. তদেব, পৃঃ ২২৯
৭. তদেব, পৃঃ ২৩৫
৮. হালদার গোপাল, বাংলার লোকসাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য, পৃঃ ১৭৬
৯. হালদার গোপাল, রূপনারায়ণের কূলে (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৮৩-১৮৪
১০. হালদার গোপাল, রূপনারায়ণের কূলে (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৮৩-১৮৪

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, গোপাল হালদার রচনা সমগ্র ১
২. গোস্বামী অচ্যুত, বাংলা উপন্যাসের ধারা, ২য় সংকলন

৩. হালদার গোপাল, রূপনারায়ণের কূলে (১ম খণ্ড), মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম আগস্ট ১৯৬৯

৪. হালদার গোপাল, রূপনারায়ণের কূলে (২য় খণ্ড), পুঁথিপত্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৮

৫. গোপাল হালদার সংখ্যা, কলকাতা, ৪৯ বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা, ১৯৮০

৬. হালদার গোপাল, লেখকের কথা, আর একদিন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতি, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫৮

৭. হালদার গোপাল, সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৬

৮. হালদার গোপাল, বাংলার লোকসাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য, বৈশাখী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৩

চল্লিশের প্রেক্ষাপটে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা

উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে সুকান্ত ভট্টচার্য (১৯২৬-৪৭) বাংলা কাব্যের এক পরম বিস্ময়। মাত্র একুশ বছর বয়সেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়। পারিবারিক দারিদ্রের মধ্যে তাঁর বাল্য- কৈশোর প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। পরিবেশ তাঁর প্রতিভা বিকাশের পক্ষে অনুকূলে ছিল না, ছিল না অন্ন, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছলতা, একজন সাহিত্যিকের মতে ''দারিদ্র ছিল একুশ বছরের নিত্যসঙ্গী, তার ওপর ছিল মার্কসবাদের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ, মতবাদের পদতলে তাঁর প্রতিভাকে ডালি দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরো কিছুদিন জীবিত থেকে স্বাভাবিকভাবে কবিতার ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারলে তাঁর কাছ থেকে দেশ অনবদ্য সৃষ্টি লাভ করতে পারত।''[১] বাংলা কবিতার ধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের সময়ে অর্থাৎ চল্লিশের দশক যতটা বাস্তব অর্থে ইতিহাসের আলোড়নকে ধারণ করেছে তেমন বোধহয় অন্য কোনো সময়ে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পৃথিবীর প্রথম থেকে সচেতন ভাবে সরে এসেছিলেন যে-কবিরা সেই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সমাজ-প্রেক্ষাপটগত পরিবর্তনের কথায় নির্যাস পান করেছিলেন বলেই হতে পেরেছিলেন আলাদা। কোনো কিছু সংক্ষেপে বলতে গেলেই অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে তা কিছুটা সরল হয়ে পড়ে। সেই সরলতার ঝুঁকি নিয়েও বলা যেতে পারে এই সময়ে কবিতার প্রধান পরিচয় এই যে তা তীব্রভাবে এবং অত্যন্ত গভীর অর্থে সমকাল-সচেতন ও ইতিহাস মনস্ক। চল্লিশের কবিতার প্রেক্ষাপট সেই সমকালীন ইতিহাস সর্বজনজ্ঞাত হলেও তার প্রাসঙ্গিক ঘটনা-বিন্দুগুলি উল্লেখিত থাকা মনে হয় এখানে প্রয়োজন। কেননা ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধ, ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তরকালীন অর্থনৈতিক সংকট; বেকারত্বের বৃদ্ধি, খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যা এরই মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের চেতনা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাঙালি মানসে দেশচেতনার ধারায় সাম্যবাদের সুর লেগেছে বিশের দশক থেকেই।

চল্লিশের দশকের আলোচনায় সাধারণত এই সমাজমনস্ক সমকাল পৃষ্ট, উদ্দীপ্ত প্রতিবাদী কবিতায় ধারাটাই প্রাধান্য পায়। তার যুক্তিও আছে। কিছুটা সংখ্যার বিচারেও, আর কিছুটা অভিনবত্ব ও আন্তরিকতার জোরে। সেই সঙ্গে বিশিষ্ট কয়েকজন কবিপ্রতিভার আর্বিভাবে এই ধারাটি সেই সময়ে এতটাই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে অন্য

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ।

ধারাটি কিছুটা পাঠকদের দৃষ্টি এড়িয়েই গিয়েছিল। এখন, অর্ধশতক সময়ের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে যখন দেখা হয়, তখনও মনে হয় চল্লিশের দশকের বাংলা সাহিত্যে ওই প্রতিবাদী ও দায়বদ্ধ কবিতার ধারাটিকেই প্রধান নির্ণয় করতে হবে। অকালমৃত সুকান্ত ভট্টাচার্যের (মৃত্যু ১৯৪৭) অর্থাৎ ২১ বছরের জীবন-পরিচিতির প্রথম কবিতা-সংকলন 'ছাড়পত্র' যদিও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই তবু ১৯৪১-৪২ থেকেই এই প্রতিভাবান কিশোর বাংলা কবিতায় পরিচিত নাম হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছিল এমনিই রচনা-''জনগণ হও আজ উদ্‌বুদ্ধ/শুরু প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।''[২] এই রচনাটি খুব পাকা হাতের না হলেও ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যেই ঈর্ষণীয় প্রাকরণিক কুশলতা আয় ও করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলার চল্লিশের কবিতার আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে যদি না উল্লেখিত হয় 'বোধন', 'রাণার', 'ছাড়পত্র', ঠিকানা', 'কলম', 'হে-মহাজীবন', 'প্রিয়তমাসু'র নাম। সর্বজন পরিচিত এই কবিতাগুচ্ছ চল্লিশের দশকের স্বাদেশিকতাবাদী কবিতা হিসেবে সকলের মন জয় করেছে, সেই সঙ্গে কবিতার সর্বায়ত আন্তবিকতার ঘণীভূত উদ্দীপনাকে সুমিত প্রায়োগিক কুশলতায় ধারণ করেছে-তাঁরপর বহুশত যুগ পরে / ভবিষ্যতের কোনো যাদুঘরে / নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রাণ হয়ে মুছবে কপাল তার / মজুতদার ও মানুষের হাড়ে কিল খুঁজে পাওয়া ভার। (বোধন) ''এই অভিব্যক্তির যথার্থতা, তীক্ষ্ণতা ও তির্যকতা মিলিত হয়ে যে শিল্পযৌন্দর্য নির্মাণ করেছে তার নিহিত ব্যক্তিটিতে কবির স্থির বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই চল্লিশের দশকের প্রতিবাদী কবিতা স্থায়িত্ব পেয়েছে।''[৩]

মূলতঃ সুকান্তের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে যাঁদের মেলে তাঁরা তাঁকে নির্বিচারে শ্রেষ্ঠ কবির শিরোপা দিয়েছেন আর যাঁরা তাঁর বিপরীত আদর্শে তাঁরা সুকান্তকে কবি হিসেবে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন সুকান্ত শুধু স্লোগান লিখেছেন কবিতা নয়। বলাবাহুল্য এর কোনোটাই সঠিক মূল্যায়ন নয়। সুকান্ত বলেছেন- ''কবি বলে নির্জনতা প্রিয় হবো আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কিকরে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড়ো কথা আমি কম্যুনিষ্ট, কম্যুনিষ্টদের কাজ করবার জনতা নিয়েই।'' সুকান্তের কাব্যবিচারে এই উক্তিকে স্মরণে রাখতে হবে। স্বাধীনতার দশকের যন্ত্রণাবিদ্ধ জনতা ও জীবন সুকান্তের কবিতার মর্মমূলে নিহিত আছে। একনিষ্ঠ একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণে তিনি জনতা ও জীবনকে দেখেছেন। আপন বিশ্বাসে অটুট থেকে তিনি নির্মাণ করেছেন প্রতিবাদের, প্রতিরোধের কবিতা, সঙ্কটের সংগ্রামের কবিতা। রাজনৈতিক আদর্শে সোচ্চার থেকেও সমকালীনতাকে যেখানে তিনি চিরন্তনের দিকে প্রাণিত করেছেন সেখানে তিনি কবি হিসেবে কালজয়ী হয়েছেন। কিন্তু আত্যন্তিক তার সংবেদনশীলতায় আলোড়িত কবি স্বদেশের, বিদেশের সমকালীন সমস্যায় এত বেশি বিচলিত হয়েছেন যে, সমকালের

প্রতিলিপি অঙ্কন তাঁর কাছে কর্তব্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি তাৎক্ষণিকতার চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি বলে তাঁর কবিতা, কবিতা না হয়ে স্লোগানে পরিণত হয়েছে। সুকান্তের রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর কবিতার শিরায় শিরায় জড়িয়ে আছে বলে কবিতাগুলি স্বদেশিকতাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে যুগের ক্লান্তি, হতাশা, অবসাদ, আর্তি তাঁর কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে জীবনের হীনতার কাছে তিনি আত্মসম্পর্ণ না করে, সাম্যবাদে আস্থা ঘোষণা করে কবিতার মুক্তিকে ভিন্ন পথে ত্বরান্বিত করতে চান। একজন কবি বলেছিলেন- ''সুকান্ত এসেছিল (পার্টিতে) কবিতা নিয়ে। ফলে কবিতাকে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।''[৪]

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ফলে শাসকের দমননীতিও নির্মম থেকে নির্মমতর হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে বামপন্থীচেতনা ক্রমশঃ ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদী-জার্মানী-নির্মমভাবে গ্রাস করে চলেছে এক একটি রাষ্ট্র। ভারতে কম্যুনিষ্টপার্টি ফ্যাসিবাদ বিরোধীতায় যেমন সক্রিয় তেমনি অন্যদিকে ভারতের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে গান্ধীজীর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন। সুভাষচন্দ্রের বিদেশ গমন, জাপানের সাহায্যে স্বাধীনতালাভের প্রয়াস, আজাদ হিন্দ ফৌজের দিল্লী অভিমুখে যাত্রা ভারতবাসীকে আলোড়িত করেছে। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী মিছিল পরিচালনা কালে ঢাকায় সোমেন চন্দ নিহত হলেন। ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ সংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন নিষ্ঠাবান কর্মী গ্রগতি সংঘের সদস্য এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁর কবিতা সংগ্রামের কবিতা, প্রতিরোধের কবিতা। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের মনীষী, বুদ্ধিজীবী, বিবেকবান মানুষদের যে সংগ্রাম সুকান্ত সেই সংগ্রামের সৈনিক। কবি একার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন জনতার পৃথিবীতে। বিপন্ন সভ্যতার ডাক কবির কানে এসেছে-'তাই রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে/ডাক এল- সভ্যতার ডাক'। কবি বুঝেছেন ফ্যাসিবাদী যেভাবে সভ্যতার প্রাণ হরণ করছে তাতে একমাত্র জনতাই পারে সেই প্রাণকে রক্ষা করতে। তাই তিনি জনযুদ্ধের আহ্বান জানান। ফ্যাসিবাহিনীর কাছে যাঁরা স্বাধীনতা আশা করেছেন তাঁদের প্রতি কবির সাবধান বাণী এভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপি চুপি আসছে/ যাদের চোখেতে আজো, স্বপ্নের ছায়াছবি ভাসছে।/ তাদেরই যে দুর্দিনে পরিণামে আরো বেশী জানবে/ মৃত্যুরই সঙ্গীণ তাদেরই বুকে হানবে।' জাগবার দিন আজ পূর্বাভাস)

চারিদিকে মৃত্যুর অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসুক, সুকান্ত বুঝেছিলেন, জীবন কাজকে পালাতে দেয়না, অতএব মৃত্যুর মাঝখান দিয়েই চলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। সৌমেন চন্দ্রের হত্যার বিরুদ্ধে কবির তীব্র প্রতিবাদ 'শহীদ খুন আগুন জ্বলে শপথে অক্ষুন্ন/... এ জনতার অন্ধ চোখে আনব দৃঢ় লক্ষ্য' (ছবি-ঘুম-নেই)-এ কবিতা কোন শোকগাথা নষ্ট এক উদ্দীপনা প্রেরণা। ১৯৪৫ সালের ৮ই মে বার্লিনে জার্মানীর বিনাশর্তে আত্মসর্মপণ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে কবি সুকান্তকেও আনন্দে বিহ্বল করেছে। ৯ই মে পালিত হয় বিজয়োৎসব। সুকান্ত সেদিন স্মরণ করেন রবীন্দ্রনাথকে, কেননা রবীন্দ্রনাথই তাঁকে কৈশোরে প্রেরণা ও প্রতীতী দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে 'রবীন্দ্রনাথের সেই ভুলে যাওয়া বাণী/অকস্মাৎ করে কানাকানি/ দামামা ঐ বাজে, দিন বদলের পালা।"[৫]

একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টির আলো ছড়িয়ে আছে সুকান্তের ফ্যাসিবাদ বিরোধী কবিতায়। বিশ্বের প্রতিটি সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর মানস-সংযোগ। এবার ঘরে ফেরার পাল। বিশ্বের প্রতিটি সৈনিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন আজ পরাধীন ভারতের দিকে তাঁর নতুন সংগ্রামের পালা। সে যুগের অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন সমালোচকের মতে- ''সুকান্ত শুধু একজন কবি হিসেবেই তঁদের সমব্যথী হলেন না- একজন রাজনৈতিক কর্মী, আদর্শনিষ্ঠ সমাজসেবক, বিবেকবান মানুষ হিসেবে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।" এই মন্তব্যের সূত্রধরে বলা কবি তাঁর অভিজ্ঞতার অনুভবকে রূপ দিয়ে তৈরি করলেন তাঁর অনেক কবিতা। মন্বন্তর পীড়িত মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে উঠেছেন এভাবে 'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি/প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখে মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিছবি।/ আমার বসন্ত কাঁদে খাদ্যের সারিতে পতীক্ষায়? (রবীন্দ্রনাথের প্রতিঃ ছাড়পত্র) 'আকাল' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় সুকান্ত লিখেছেন-''তেরশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয় নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে পড়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা, গ্রামছাড়া ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।" দুর্ভিক্ষ পীড়িত বিধ্বস্ত মানুষের প্রতি কবির সীমাহীন মমতা এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসহায় মানুষের দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন নিজের কান্না এবং ভালবাসা। অন্তরের গভীর ভালোবাসা থেকে কবি উচ্চারণ করেন-'আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে/জমে ভীড়, ভ্রষ্ট নীড় নগরে ও গ্রামে/ দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল।' (বিবৃতি/ছাড়পত্র)

প্রকৃতপক্ষে কবি মানুষকে পথ দেখাতে চেষ্টা করেছেন, দিতে চেয়েছেন লক্ষ্যের নিশানা। তাঁর মতে 'ইতর-ভদ্র-হিন্দু-মুসলমান' ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে আসবে মুক্তি। সংঘবদ্ধ ভাবেই বাঁচার সংগ্রাম করে যেতে হবে। অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ, নির্যাতনের

বিরুদ্ধে সুকান্তের দৃপ্তকণ্ঠ সর্বদা সোচ্চার। কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ইংরেজ সরকার এবং তারই মদতদার মুমাফাখোর কালোবাজারীর দল কিভাবে অসহায় মানুষগুলিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে, বোমার আতঙ্কের মাঝখানে কলকাতার পথে পথে তিনি দেখেছেন কত ঘৃণ্য চিত্র, মানুষের দুঃসহ অপমান, তীব্র যন্ত্রণা। কবি ধিক্কারে ফেটে পড়তে চেয়েছেন, উচ্চারণ করেছেন কঠিন সাবধানবাণী 'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই/স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।' (বোধন/ছাড়পত্র)

কবি সুকান্ত একজন সংগ্রামশীল সৈন্যের কবিতার অস্ত্রহাতে নিয়ে এগিয়ে গেছেন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি একজন কম্যুনিষ্ট কবির ভূমিকা পালন করেছেন। কোনো আপোষ নয়। অহিংসা নয়, কণ্ঠে তাঁর হুঙ্কার, স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে তিনি বিশ্বের বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন কেননা বিশ্বের বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর আত্মার বন্ধন আছে। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের নামার আহ্বান জানান। মোটকথা আবহমানের বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতাকে তিনি পুরোপুরি ধরবার চেষ্টা করলেও তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ক্ষণিক প্রবাহ আবার তা যুক্ত হয়েছে চিরকালের সঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে দেশের ঐক্যকে ব্যাহত করবে-স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতিকে করবে শিথিল একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কবি দেশবাসীকে বারে বারে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। বিপ্লবের বাণী অগ্নিশিখার দীপ্তিতে বিচ্ছুরিত হয়েছে 'আগ্নেয়গিরি', 'সিঁড়ি', 'দেশলাই কাঠি', 'সিগারেট' প্রভৃতি কবিতায়। মার্কসবাদে দীক্ষিত কবির শ্রেণী সচেতনতা এ কবিতাগুলিকে দৃপ্ত এবং ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ করেছে। নিঃস্ব, বঞ্চিত, সর্বহারার প্রতীক হয়ে ওঠে 'কলম' 'হে কলম! হে লেখনী! আর কতদিন/ঘর্ষণে ধর্ষণে হবে ক্ষীণ'? আবার এই কলম, 'সিগারেট প্রভৃতি হয়ে ওঠে বঞ্চিত, বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী-শ্রমিকের প্রতীক। সিগারেটের মুখে তাই বিদ্রোহের বাণী-'আমরা বেরিয়ে পড়ব/সবাই একজোটে একত্রে।'

সমবেত জেগে ওঠার শক্তি নিহিত আছে। তাই কবি জানান দেশলাই কাঠিরা একসঙ্গে যেদিন জ্বলে উঠবে, ধ্বংস হয়ে যাবে শোষণকারীর দল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের দৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল/এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' (ছাড়পত্র/ছাড়পত্র) অতি জনপ্রিয় 'রাণার' কবিতাটি শ্রমজীবী মানুষের জীবনবেদ। সকল ভয়, বির্পযয়কে উপেক্ষা করে, রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে ভেদ করে রাণায় ছুটে চলে খবরের বোঝা নিয়ে– রাত নির্জন, তবুও রাণার ছোটে কত মানুষের কত প্রেম, সুখ আবেগ, আনন্দের সংবাদ নিয়ে কত গ্রাম, কত পথ পেরিয়ে রাণার এগিয়ে চলে। তবে রাণারের জীবনের বেদনা বিশ্বের বেদনায় পরিণত। কেননা তাঁর নিজের জীবনের দুঃখের 'কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির

খামে।' তবুও তাঁর বিশ্বাস সে আনবে নতুন সকালের নতুন বার্তা—আর ও বিশ্বাসে কবিও আস্থাবান। সুকান্তের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা ও শোষিত মানুষের প্রতি মমতার আশ্চর্য উদাহরণ 'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতাটি। বঞ্চিত, ক্ষুধিত মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনালেখ্য এই কবিতাটি সুকান্তের সমাজচেতনার গভীরতাকে সূচিত করে। ছোট্ট একটি মোরগের জীবনকাহিনীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমগ্র যুগের জীবনচিত্র। একটি মোরগ এক ধনীর বিশাল প্রাসাদের এক কোণে ভাঙা প্যাকিং বাক্সের স্তূপে আশ্রয় জোগাড় করে। আশ্রয় জোটে, কিন্তু খাবারের জন্য নয়। সকাল থেকে মোরগ চীৎকার করে কিন্তু নিষ্ঠুর প্রাসাদের নির্মম হৃদয় টলে না। অবশেষে মোরগ সন্ধান পায় এক আস্তাকুড়ের, সেখানে অনেক উচ্ছিষ্ট খাবার, কিন্তু সে সুখ বেশিদিন নিরুপদ্রব থাকে না। জীর্ণ, মলিন পোষাকপরা মানুষ অংশীদার হয়ে এসে জোটে। মোরগ শক্তিতে দুর্বল তাই খাদ্য সংগ্রহের লড়াই-এ হেরে যায়। প্রাসাদের ভিতরে খাদ্য পাবে এ আশায় সে প্রাসাদের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে।

ক্ষুধার্ত মোরগ স্বপ্ন দেখে প্রাসাদের মধ্যে রাশি রাশি খাবার, অনেক খাবার। অবশেষে মোরগের স্বপ্ন একদিন সফল হয়। প্রাসাদে সে প্রবেশাধিকার পায়- ''ধপধপে দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে/খাবার খেতে নয়-খাবার হিসেবে।" মোরগের এই কাহিনী ক্ষুধা কাতর, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কাহিনী, বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকে মানুষের বঞ্চিত হওয়ার কাহিনী , বঞ্চিত, শোষিত মানুষের প্রতীক ছোট্ট মোরগ। শোষণ ও অত্যাচারের মাধ্যমে যারা ধনী হয়ে বিশাল প্রাসাদের অধিকারী হয়েছে তাদের হৃদয় বলে কিছু নেই। ক্ষুর্ধাতের কান্না, চীৎকার তাদের নির্মমতার পাষাণে কোনো চিহ্ন আঁকতে পারে না। অসহায়ের প্রতিবাদ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়।

সুতরাং বলা যায় এই কবিতাগুলি সুকান্তের মন্বন্তর-অভিজ্ঞ সংবেদনশীল কবি আত্মার গভীর চেতনা থেকে উৎপন্ন। ''বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কোন তূর্যানিনাদ নেই এ কবিতায়, কিন্তু যারা মানবতার শত্রু তাদের মুখোস খুলে গেছে।"[৭] আসলে ছোট্ট মোরগের করুণ পরিণতি কবিতায় একটি বিষাদময় সুর সৃষ্টি করলেও এ কবিতা হতাশা ও নৈরাশ্যের নয়। এ কবিতা শোষক ও শোষিত, ধনী ও নিঃস্বের বিপরীত সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে দেয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাঁচতে হয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচা যায় না -এ সকল ইঙ্গিতও তাঁর কবিতাগুলিতে আছে। আর এক্ষেত্রে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণযোগ্য ''জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায়, ক্ষেতখামারে ঘরে ঘরে সব পৌঁছে দিতে শুরু করেছে। ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল, আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।"

সূত্রপঞ্জি :

১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত - ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মডার্ন বুক এসেন্সী - পৃঃ ১০৮
২. 'জনযুদ্ধের গান' নামে একটি বিপ্লবী গানের সংকলন - সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রকাশ ১৯৪২
৩. আধুনিক কবিতার ইতিহাস - সম্পাদনা আলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত - দেজ পাবলিশিং - মাঘ ১৪১৭, পৃঃ ১৪১
৪. সুকান্ত সমগ্র - ভূমিকা - সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৫. কবিতা সংগ্রহ - সুকান্ত ভট্টাচার্য - ২৫শে বৈশাখের উদ্দেশ্যেঃ ঘুম নেই (১৯৪৫ সালের ৯ই মে)
৬. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতা উৎস ও বিবর্তন - গৈরিকা ঘোষ - ১ম, জানুয়ারি, ১০০৫ পৃঃ ১১৬
৭. তদেব - পৃঃ ১২০

গ্রন্থসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা- পিনাকেশ সরকার - প্যাপিরাস, প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯৫.
২. বাংলা আধুনিক কবিতা - দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক রায় - সাহিত্যম্, ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯২
৩. প্রবন্ধ পরিচয় - ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় - তুলসী প্রকাশনী - ১ প্রকাশ, মার্চ ১৯৯৫
৪. আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন - সম্পাদনায় অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় - ঊষা পাবলিশার্স
৫. বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, সম্পাদনায় বাসুদেব মোশেল - বুকস্ওয়ে, ১ম প্রকাশ ২০০৮
৬. প্রসঙ্গ উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপভেদ - ড. দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় - পাণ্ডুলিপি, ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৩
৭. আধুনিক কবিতার ইতিহাস - সম্পাদনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত - দেজ পাবলিশিং, প্রথম দেজ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১
৮. আধুনিকতা আর কবিতা ঃ স্বরূপে রূপে ; ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৫

মনন, প্রতিরোধ ও কবিত্বের এক টুকরো রবীন্দ্র-প্রাঙ্গণ

নির্মাল্য মণ্ডল*

কোনো মানুষ যদি তার পারিপার্শ্বিক চিরাচরিত রীতির বাইরে গিয়ে ভিন্নভাবে ভাবেন, চলতি ঘটনার বিরুদ্ধ হন, সাধারণের দেওয়া মান্যতাকে অস্বীকার করেন, তবে তিনিই হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী মানুষ। প্রতিবাদের স্বরূপগত প্রকাশ ঘটে বাইরের আচরণে, কিন্তু তার প্রকৃত উৎস মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়। যুক্তিবোধ আর মনন দিয়ে জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে অনুধাবন করে মানুষ নিজের মানবিক উপলব্ধির প্রেরণায় তাকে অসমর্থন করতেই পারে। এখানেই মানব-চৈতন্যের ব্যতিক্রমী স্বরূপের প্রকাশ। প্রতিবাদ মানেই তাই ব্যক্তিত্বের ভিন্নধারার অবস্থান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য মানুষের পাশাপাশি কোনো যথার্থ শিল্পীর গুণও বটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাতন্ত্র্য তাঁর মননশীলতা ও কবিজনোচিত আবেগের সংমিশ্রণে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর রচনার প্রতিবাদী বৈদগ্ধ্যের মধ্যে সুক্ষ্মদর্শী ও গভীর অনুভূতি-সচেতন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ 'লিপিকা'র কথা উল্লেখ করা যায়।

লিপিকার রচনাকাল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে চরম সঙ্কটের সময়। সাম্রাজ্যবাদীর কঠোর নীতি, রাওলাট অ্যাক্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার জন্য রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ, রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অসুস্থতা—সব মিলিয়ে শরীর-মনের টানাপোড়েনের সময়; ভেতরের এই বিরাগ, ক্ষোভ, বেদনার প্রকাশ ঘটেছে সমকালীন লিপিকার মধ্যে। এখানে তিনি অনুভূতির এক ভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণ করেছেন; এর মধ্যেই চিরকালের মানব-জীবনের সত্যগুলিকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জটিল জীবনকে প্রত্যাখ্যানের প্রয়াসও রয়েছে। কিন্তু লিপিকায় তিনি বললেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণ, ঔপন্যাসিকের জটিল বিন্যাস, গল্পের ঘটনা-মুহূর্ত, কবিতার ছন্দোবদ্ধ আবেগ, গানের সুর, নাটকের সংঘাত, ছবিগুলির রহস্যময়তা, অর্থাৎ আঙ্গিকের পরিচিত ঘরানার কোনোটিকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ না করে তাদের অন্তঃস্থিত সুরকে মাত্র তিনি আত্মস্থ করে নিয়েছেন। লিপিকা তাঁর আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। ব্যতিক্রমী এমন রূপায়নকেও তো প্রথাগত শৈল্পিক ভাবনার বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিবাদ বলা যায়।

'পায়ে চলার পথ' রচনাটিতে মানব জীবনের অনির্দেশ্য গতির কথাই যেন গভীর গোপন কবিতার মতো বেজে উঠেছে। পরিচিত গার্হস্থ্য সংসারের সমস্ত আকর্ষণ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে অনন্ত নির্বাণের পথে জীবনের অনির্বাণ-যাত্রা—ব্যস্ত জীবনের অভ্যন্তরে

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ।

গোপনে অবশেষের বেদনাকে ভরে দেয়। পথ তার পিছুপানে তাকায় না, পথের সঙ্গ ক্ষণকালের; স্থিতির ভেতরেই তো গতির বিরুদ্ধ প্রকৃতির আশ্রয়। সোচ্চারে নয়, নিরুচ্চারেই মানব-সংসারের সুখী সম্পূর্ণ চিত্রের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়া অতীতের অন্তরঙ্গ স্মৃতি রোমান্টিক বিষন্নতার মতো জড়িয়ে থাকে।

'মেঘলা দিনে' লেখায় কাজের পৃথিবীর বিরুদ্ধে অকাজের মনের সংক্ষোভ ঘনীভূত; মানব-হৃদয়ের নিভৃত বাণী চিরকাল অকাজের মানুষের কাছেই ধরা দিতে চেয়েছে। মেঘলা দিনে আবছায়া আলো-আঁধারির মধ্যে ব্যস্ত বিশ্ব যখন কিছুটা অন্তরালে চলে যায় তখনই মানুষের গূঢ় গহন চিত্তের উঁকিঝুঁকি– তবু 'আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।' মানুষের এই অক্ষমতাটিই তার গৌরব-স্বরূপ হয়ে উঠে জানার অহঙ্কারে স্ফীত বিশ্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে। সৃজনশীল মানবাত্মা নিজের বহিঃস্বরূপের কাছেও নিজের সব রহস্য উন্মোচন হোক চায় না; পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের অনিচ্ছার মধ্যেও একধরনের আত্মাভিমান অথবা বলা যায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকেই ছাড়িয়ে যাওয়ার লড়াই।

প্রায় সমধর্মী অনুভূতি 'মেঘদূত'-এর মধ্যেও রয়েছে। অতি পরিচিত স্পষ্টতার মধ্যে জীবনের প্রাত্যহিকের ছায়াপাত ঘটে তাকে মলিন করে দেয়; কিন্তু যা বহুদূরের, চেনা সংসারের বস্তুভার-মুক্ত, মানুষের অবুঝ ভালোবাসা তার উদ্দেশ্যেই কল্পমেঘকে দূত করে পাঠাতে চেয়েছে। এই বিষয়টিই গল্পের আকারে 'ভুল স্বর্গ'-এর আনমনা শিল্পীর আচরণে আভাসিত; কেজো মর্ত্যের মতো স্বর্গও অকাজের মানুষটিকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু শেষ অবধি অর্থের সীমায় বদ্ধ স্বর্গে সে-ই অনর্থের জন্য আকুতি জাগিয়ে তুলেছে। যে ঘড়া জল ভরে রাখার উপযুক্ত হলেই যথেষ্ট তাকে নানা রঙে বিচিত্র করার মধ্যে বস্তুবিশ্বের বিরুদ্ধে সৃজনী শক্তির জয় ঘোষিত। নদী মাঝে মাঝে তার দুই পাড়ের শাসনরেখা মানতে চায় না, কূল ছাপিয়ে প্লাবন আনে; তেমন করেই অর্থের সীমা কাজের মানে খোঁজার দলকে নস্যাৎ করে অসীমের পানে হাত বাড়ায় যারা, 'ভুল স্বর্গ'-এর মানুষটি তাদেরই প্রতিরূপ।

'গল্প' আর 'রাজপুত্তুর' রচনার মধ্যে ভাবের সামঞ্জস্য আছে। 'হঠাৎ এক সময়ে কোন খেয়াল সৃষ্টিকর্তার কারখানায় উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল।' মানুষের মধ্যে তাই বস্তুর কঠিন ভারের থেকে নির্বস্তুক হৃদয়ের ভাগ বেশি। 'মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা! সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত।' জাগতিক বিশ্বের সাথে অতএব মানুষের স্বাধীন সত্তার নিয়মিত সংঘাতের পালা। গুরুমশায়ের তিন চারে বারোর হাঁক তার অন্যমনস্ক শৈশবের 'হাঁউ মাউ খাঁউ' আর রাজপুত্তুরের গল্পে বিভোর কানে গিয়ে পৌঁছোয় না। তিন চারে বারোর সত্য জগতকে এড়িয়ে আপন হাতে রচিত বিশ্বের দিকেই সৃজনশীল মানুষের যাত্রা। এই যাত্রার পথ কখনো সুগম নয়;

অকর্মণ্য মানুষের প্রতি কর্মব্যস্ত মানুষের উপেক্ষা এখানে প্রতিনিয়ত তাকে ধিক্কার দেবার প্রয়াস করে। তবু সংসার তাকে কাজের বন্ধনে বাঁধতে পারে না। কিন্তু এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জটিল জীবনে চক্রে পড়ে কল্পজগতের পক্ষীরাজের ডানা কাটা পড়ে, রাজপুত্রের রাজবেশ খসে পড়ে, রাজকন্যার সাথে তার মিলন হয়ে ওঠে অসার্থক। কল্পলোকের নায়ক এখানে নিঃসঙ্গ, ষড়যন্ত্রের শিকার। তবু তার মুক্তি মেলে মৃত্যুর ওপারে। সেখানেই সে সার্থক; কঠিন দুনিয়া মানুষকে যত নির্মম পেষণে নিষ্পেষিত করে তত মানুষ আপন কল্পজগতকে পরম ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরে।

আদিমকাল থেকেই পারিপার্শ্বিক শক্তির কাছে আর পাঁচটি প্রাণের মতো মানবের পূর্বপুরুষেরা আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। তাই মানুষ আজ বহু অসামান্য সম্পদের অধিকারী। কিন্তু জীবনের এক পর্বে এসে আকাশস্পর্শী ঐশ্বর্যের চূড়াও তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। এখান থেকেই অভাবনীয়ের জন্য তার যাত্রা শুরু; বস্তুবিশ্বের ক্ষণত্বকে ছাপিয়ে নির্বস্তুকের সন্ধানী মানুষ অতঃপর বিপুল জীবনক্ষেত্র থেকে ছোট ছোট আনন্দকণার মধ্যে জীবনের অভিনবত্বকে খুঁজে নিল। রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনিতে পূর্ণ ইতিহাসে একটি দুপুরের একটি চাউনির স্মৃতির জায়গা হয় না, শুধু মানবের অক্ষয় আনন্দের মধ্যে তার সযত্ন সংরক্ষণ। তাই পাহাড়ী মেয়ে কাজরী, যার হাসি ঝর্ণার জলতরঙ্গের মতো, আশ্বিন মেঘের এক পশলা আচমকা বৃষ্টির মতো যার খুশি-মাখা বিস্ময়, রাজবাড়ির সম্পদের অহঙ্কারের সাথে তার মেলবন্ধন হয় না। শুধু সে চলে যাবার পরে তার ঐশ্বর্য আপন স্বরূপে প্রকাশ পায়। (পরীর পরিচয়)।

অতএব মানুষের বিদ্রাহ আপন স্থূলতার বিরুদ্ধে আপন আত্মার; বনের তপস্বীর স্বর্গলাভের সাধনা যেদিন সম্পূর্ণ হয় সেদিন সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় উঠে মর্ত্যের স্বর্গকে সে নতুন করে চিনতে পারে। সেদিন বনের সামান্য কাঠকুড়ানির সেবা প্রেম আত্মত্যাগের অপার্থিব রূপ স্বর্গের বিরুদ্ধে আপন মহিমাই নীরবে প্রকাশ করে (সিদ্ধি)। বস্তুতপক্ষে স্বর্গ ও মর্ত্য দুই ভিন্নলোক হলেও প্রতীকী অর্থে মানব-সংসারেই তার প্রতিষ্ঠা। নিরন্তর সুখ আনন্দে ভরা জীবনে মানুষের সক্ষমতা আর সংগ্রামের ধার নষ্ট হয়ে যায়; মুক্তির জন্য ব্যাকুলতার অভাবে মানুষের সত্য অস্তিত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে; 'স্বর্গ-মর্ত'তে তাই দেবরাজ বলছেন—'ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে যায় তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র।' মানবীয় দুর্বলতাই মানুষের ঐশ্বর্যস্বরূপ হয়ে উঠে স্বর্গের অমৃতরসের প্রতিস্পর্ধী রূপে আপন প্রাণশক্তির অকুণ্ঠ অধিকার ঘোষণা করে। স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে সহজ অকৃত্রিম জীবনের আনন্দধ্বনিকে গ্রহণে উৎসুক হয়েছিল বিলাসিনী সুয়োরানীও; সে চেয়েছিল দুয়োরানীর দুঃখ। উদ্ভিদ মাটির কঠিন বন্ধন ছিন্ন করে আলোর স্পর্শ লাভ করে। কুঁড়ির অন্তস্থিত বেদনাবোধ তাকে বিদীর্ণ করে সুগন্ধী রঙিন রূপ দেয়। অনন্ত সুখের মাঝে থাকে একটুখানি দুঃখের কান্না, সেটুকুর

অভাবে জীবন বড়ো শূন্য বিস্বাদ ঠেকে। সুয়োরানীর জীবনেও তা-ই হয়েছিল। সুখ আর দুঃখের চেনা সংজ্ঞা বদলে গিয়ে কখন যে সুখটাই হয়ে ওঠে দুঃখের কারণ, আর বেদনার মধ্য দিয়েই বেদনাকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সুয়োরানী তাই আপন স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে দুয়োরানীর দুঃখকেই চেয়ে বসে (সুয়োরানীর সাধ)। 'রক্তকরবী'র রাজা যেমন নিজের কঠিন হৃদয়ের মধ্যে নিজের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্লান্তিতে জাল ছিঁড়ে বাইরে এসে আহ্বান জানান নন্দিনীকেও—

'নন্দিনী। কোথায় যাব?

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে ওকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পঃবঃ সরকার, ১৩৬৮, পৃঃ ৬৯০)

'লিপিকি'য় দ্বিতীয় আর এক জাতের লেখা রয়েছে যেখানে মানব-ব্যক্তিত্বের ভিন্ন রূপের সন্ধান মেলে। সে মানুষ আপাতভাবে সরল, নিরীহ, অসহায়, বাহ্যতঃ পরাভূত; কিন্তু তার আপাত সাধারণ ভাবের অন্তরালে এক দৃঢ় মানবের স্পষ্ট অবস্থান। 'মীনু'র নাম-চরিত্রের কাঁচা বয়সের সবুজ মন পথের কুকুর, সরল শিশু, ঝুমকোলতার গাছ—এমন সব কিছুকেই নিঃশেষে ভালোবেসেছিলো। কিন্তু এদের ওপরে অকারণ নির্যাতনের দৃশ্যে অভিভূত মীনু প্রতিকারে অক্ষম; তাই জানলা থেকে সরে এসে, পালিয়ে গিয়ে সে এই নির্মমতাকে ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ এমনভাবেই তার চারপাশের বহু অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারে না। কিন্তু তার সংবেদনশীল মনের গোপন কষ্ট যা তাকে অনবরত তাড়িত করে—তার মধ্যেও বিবেকী মানবতার বিদ্রোহী মুখটিকে খুঁজে নেওয়া যায়।

'ঘোড়া' রচনাটিও স্বার্থলিপ্সু মানুষের প্রতাপশালী কর্তৃত্বের জন্য ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা। মানুষের ধূর্ত বুদ্ধি স্বয়ং ব্রহ্মাকেও হার মানিয়েছে। যে মুক্ত প্রাণীটির জন্য বরাদ্দ ছিল খোলা মাঠ, মানুষ তাকে দিল চার দেওয়ালে বদ্ধ আস্তাবল, জিন, লাগাম, চাবুক; রবীন্দ্র-গবেষক বলছেন 'ভারতে ইংরেজশাসনের সাম্রাজ্যতান্ত্রিক আভিজাত্যের বাহনরূপেই লিপিকায় ঘোড়া রূপকটি প্রযুক্ত হয়েছে।' (তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩, পৃঃ ৩৪৪)

সাম্রাজ্যবাদীর প্রভুত্বগর্ব একমাত্র আপনাকেই মানে; আপন স্বার্থসিদ্ধিতেই সে সব কিছুর ব্যয় করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্রহ্মার সৃষ্ট এই ধূর্ত প্রাণীটি বিষয়ে মন্তব্য করেন—'কাড়াকুড়ি করে সে যা কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে।' অথচ শোষণের এমন চমৎকার কৌশলকে শোষিতের উপচিকীর্ষার আবরণে ঢেকে রাখা হয়। ইউরোপের

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তো এভাবেই পরোপকারের ছলে অসভ্য বর্বর অনগ্রসর আখ্যা দিয়ে এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলিকে অধিকার করেছিলো। ব্রহ্মার উক্তিতে 'সেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব' আসলে স্বার্থলিপ্সু মানুষের প্রতারক আচ্ছাদন।

'কর্তার ভূত'-এ অতীত সভ্যতার প্রতি মোহবেশকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে; পাশাপাশি স্বাবলম্বনে অনিচ্ছুক মানুষও এখানে লেখকের শ্লেষের লক্ষ্য। ভূত আর অভূতের দ্বন্দ্ব আসলে আধুনিকতার মাঝে সনাতনী বলে যত্নে রক্ষিত মৃত অনাবশ্যক রীতিকে ধরে রাখা। এর পরিণামে 'আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক, আর উপস্থিততম বর্গির দল'কে ঠেকাতে মাসি পিসির ডাক পড়ে। নব্য জীবনবোধ, মানুষের মৌলিক ভাবনা, আধুনিকতা সব কিছু বর্জিত হয়ে অতএব এক ও অদ্বিতীয় হয়ে বিরাজ করে পূর্বানুকৃতি, পরম্পরা সূত্রে বাহিত আচার আর বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য।

কাঞ্চীরাজার দম্ভের বিরুদ্ধে বিদূষকের হাসিই হল প্রতিবাদ। সে হাসি অসময়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যুদ্ধজয়ে লুণ্ঠিত সম্পদ, বলির রক্তে উৎসব, রক্তাম্বরের সজ্জার মধ্যে উগ্র আত্মম্ভরিতার ঘোষণা ছাড়াও বিরুদ্ধতার প্রতি তীব্র হিংসার পরিচয়ও মেলে। অন্ধ অহমিকাই বালকদের নকল যুদ্ধ খেলায়ও আপন পরাভবকে সহ্য করতে পারে না। বালকদের সঙ্গে গোটা গ্রামকে শ্মশান করে দিলে বিদূষকের বিদায়-প্রার্থনা– '...বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব' (বিদূষক)। রাজদরবারে যার উপস্থিতি সব থেকে গৌণ, রাজতন্ত্রে যার কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, সে-ই সর্বাধিক দৃঢ় প্রতিবাদী। স্পর্ধার বিপরীতে প্রতিস্পর্ধা প্রদর্শন করেও তার আচরণ কখনো রাজকীয় নির্মমতার অনুরূপে সোচ্চার প্রতিরূপ নয়। আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে বিদূষক মানুষ হিসেবে আপন স্বধর্ম বজায় রেখেছে। বিশুদ্ধ মনোরঞ্জনের জন্য যে হাসি মহারাজের সভা থেকে বিদায়ের সময় সে হাসি আর তার মুখে নেই; কিন্তু তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের একটি সূক্ষ্ম বঙ্কিমরেখা তাঁর ওষ্ঠের ফাঁকে অদৃশ্যপ্রায়–পাঠকের সে রেখাকে চিনতে ভুল হয় না। সে হাসি বিদূষকের স্বাভাবিক হাসি নয়, কিন্তু সে হাসি মানব-বিধাতার ক্ষমাহীন ইঙ্গিত–'প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, তপোবন, বিচিত্রা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ২৪০)

যে প্রথাগত শিক্ষায় বাহ্য আড়ম্বরের অন্তরালে মানাত্মার স্বাভাবিক বিকাশ হারিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ আজীবন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। 'তোতাকাহিনী' এরই প্রতিরূপ। পাখির শিক্ষার সুবাদে ভাগিনা, পণ্ডিত, স্যাকরা, লিপিকর, মিস্ত্রী, কামার, তদারকনবিশ, কোতোয়াল থেকে শুরু করে তাদের তুতো আত্মীয়ের দল অবধি ফুলেফেঁপে উঠলো; শুধু বেচারি পাখি তার রোগা ঠোঁট, কাটা ডানা, দানাপানিহীন শূন্য

সোনার খাঁচার শিকলের বন্ধনের মধ্যে থেকেও সকালবেলার আলোর পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। বিপুল মূর্খের আয়োজনের মধ্যে অসহায় প্রাণশক্তির প্রতিরোধ বলতে এটুকুই। কিন্তু এর শক্তিই কী কম! মৃত্যু এসে তাকে আশ্রয় না দেওয়া অবধি সে বশ মানেনি; মৃত্যুর কাছে পরাভব স্বীকারেই তার 'শিক্ষা পুরো হইয়াছে'। শেষ বাক্যটি স্মরণীর – 'বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।' সমস্ত লেখার মধ্যে এই অংশটির ভাষা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী, কাব্যরসাশ্রিত। কিন্তু কাব্যিক ব্যঞ্জনার অন্তরালের অধীরতাটুকু আকুল দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে পাঠকচিত্তে নিঃশেষ ক্ষোভের সঞ্চার করে দেয়।

লিপিকার গদ্যভাবের সাথে কবিত্ব রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিলে গিয়ে সাধারণ গল্পধারার থেকে এর একটি স্বতন্ত্র রূপের নির্মাণ ঘটিয়েছে। কিন্তু কোমল ব্যঞ্জনাধর্মী ভাব-আশ্রিত রচনা বলে লিপিকার মধ্যে কোথাও কঠিন বিরুদ্ধতা থাকবে না এমন ভাবাটা অনুচিত। বরঞ্চ নিবিড় কল্পনাঘন রচনার অন্তরালে চকিত সত্যের উদ্ভাসে সম্পূর্ণ বিপরীত বাস্তবতার উন্মোচন লিপিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-চিহ্ন। 'রথযাত্রা'র মতো ছোটো রচনার দুঃখী, রাজার পথে রথ দেখার পরিবর্তে প্রেমিক দেবতাকে আপন কুটির দ্বারে প্রত্যক্ষ করে; এখানেও সুক্ষ্মভাবে কর্তৃত্বম্মন্যতার দ্বারা মানুষের দেবতাকেও আপন ইচ্ছার করায়ত্ত্ব করে রাখার অহমিকার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। সামগ্রিকভাবে দেখলে লিপিকার অন্তস্তলে রবীন্দ্রনাথের গল্পকারসুলভ ব্যক্তিত্বের অন্য একটি দিকও ধরা পড়ে। বাইরে মননসিদ্ধ উপস্থাপনের মধ্যে না গিয়ে গভীর অনুভবের উৎকর্ষে কোনো লেখা কিভাবে মানব-চৈতন্যে সাড়া জাগাতে পারে লিপিকায় তারই যথেষ্ট নমুনা রয়েছে। পাশাপাশি গল্পরসের নিবিড় আস্বাদনেও লিপিকা ভরপুর। গল্পকে বাদ দিয়ে নিছক বক্তব্য-প্রধান বুদ্ধিবাদী বিশ্লষণের প্রয়াস থেকেও লিপিকা মুক্ত–

'....সবুজপত্র পর্ব আর সবুজপত্রোত্তর পর্বের অধিকাংশ গল্পই লেখকের উত্তমপুরুষীর বাচালতার দাপটে স্বল্পাক্ষর ব্যঞ্জনার সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলেছে। লিপিকার কাব্যসুরভিত ছোট্টগল্পগুলির উনকথনের মধ্যে যেন গল্পগুচ্ছর ক্রমবর্ধমান ওই অতিকথনের একটা আত্ম-প্রতিবাদ খুঁজে পাওয়া যায়।' (তপোব্রত ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫)

এভাবেই লিপিকায় রবীন্দ্রনাথ আপন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর নিজেরই প্রতিরোধী ভূমিকাকেও উপস্থিত করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিপিকা, বিশ্বভারতী, ১৩ ২৯
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, তপোবন, বিচিত্রা, বিশ্বভারতী, ১৯৬১
৩। তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ, সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩

রহিমের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকট

টুম্পা রায় ব্যাপারী*

নাটকের চরিত্রের গুণ কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন অ্যারিস্টটল। নাটকে চরিত্রের চারটি গুণের কথা বলেছেন।। এক-সততা (Goodness) যা দিয়ে চরিত্রের ভালোগুণ, মর্যাদা, বীরত্ব প্রভৃতি পরিমাপ করা হবে। দুই-শোভনতা (Decency) -যা শোভনযোগ্য যেমন পুরুষের পৌরুষ, নারীর কমলতা। তিন - সাদৃশ্য (Linkeness) জীবনের সত্যতা যা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। চার-সঙ্গতি (Consistancy) - চরিত্রের আগের কাজের সঙ্গে পরের কাজের সামঞ্জস্য। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটকের রহিমের চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার নাট্যোচিত গুণ নাটকটি পরিবেশন করেছেন। তবে চরিত্রের মানবিক আবেদন এ তার পরিণতি অনেক বেশি নাটকীয়।

নাটকের প্রধান চরিত্র রহিম। তাকে এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করেই নাটকের গতি এবং পরিণতিও। তবে রহিমের ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি তার গ্রামবাসীর জীবনের দুঃখ দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে। রহিম নাটকের নায়কের মর্যাদা পেলেও আত্ম-অবমাননার গ্লানিতে নাটকের শেষে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়। যদিও রহিমের ব্যক্তিজীবনে জানা যায় তার বাবা একজন সাধারণ কৃষক ছিল। নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দিতে রহিমের গর্ব হয়। পড়াশোনায় যোগ্যতা থাকলেও অর্থকষ্টে তাকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। গ্রামের হাকিমুদ্দি ষড়যন্ত্র করে রহিমের বাবাকে সর্বস্বান্ত করে। রহিম ছিল সৌন্দর্যের পূজারী। তাই তাকে ফুলগাছ লাগাতে, গান গাইতে দেখা যায়। কৃষকের ঘরের ছেলের সৌন্দর্যবোধ শুনে গ্রামের লোকে অবাক হলেও রহিমকে তা বিচলিত করেনি। ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সামাজিক নিপীড়ন কিভাবে রহিমকে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা বিচার করতে রহিম চরিত্রকে বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হয়।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক সন্তান রহিম বাবা মায়ের আদর্শগত। তার বাবা ছিলেন একজন হাজী। বাবার জীবন ও বাক্যের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। মায়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, হাকিমুদ্দী যখন রহিমকে চোর অপবাদ দিতে গিয়েছিল তার মা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— 'কান্দিস্‌না। হাজী কইত মুস্কিল আসিয়া ইমানদারে পরীক্ষা হয়। ইমান্ ঠিক থাকিলে কোনওদিন হাইর হইবেনা।'[১] রহিম জানে তার ইমান আছে। রহিমের একমাত্র ছেলে বসির। প্রাণের থেকেও সে বসিরকে ভালোবাসে। কিন্তু অর্থ ও অন্নের অভাবে

*গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

ছেলের কষ্ট দেখে প্রথমে স্ত্রী ফুলজানের ফুফার বাড়ি পাঠিয়ে সেখানে উপায় না হলে তার চরম শত্রু হাকিমুদ্দির লঙ্গরখানায় পাঠায়। বসিরের খাওয়া হয়নি জেনে বন্ধু শ্রীমন্ত তার জন্য চিড়ে আনতে যায়। কিন্তু বসিরদের লঙ্গরখানায় যেতে শুনে শ্রীমন্ত একপ্রকার জোর করে রহিমকে চিড়েগুলি খাইয়ে দেয়। কারণ রহিম ও না খেয়ে খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে। নিষ্ঠুর পরিহাসে রহিমের চিড়ে খাওয়ার পর জানা যায় বসিরদের খাবার দেওয়া হয়নি তার বাবা চৌকিদারি ট্যাক্স দেয় বলে। ক্ষুদার্থ- শিশুর মুখের খাবার খেয়ে ফেলার অপরাধে রহিম বিষ খেয়ে মরতে চায়। 'রহিম' (আর্তনাদ করে) চিড়া খোয়ালু শ্রীমন্ত মোক বিষ-আনি খোয়াও! হায় হায়- ছাওয়ার চিড়াটা মুই বাপ হয়া খায়া ফ্যালাইনো।' ব্যর্থ বাবার পাশাপাশি ব্যর্থ স্বামীর চিত্রটি অনেকবেশি ধরা পড়ে নাটকে। সমাজ শিক্ষিত, ভদ্র, রহিম ফুলজানকে বিয়ে করে যোগ্য স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায়। তাই কৃষকের ঘরে জুতা পরা বেমানান জেনেও সে তার স্ত্রী জুতো পরতে শিখিয়েছে। আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছে। নিজের জীবনের সমস্ত কথা, পরামর্শে তার স্ত্রী পাশে রেখেছে। রহিম ও ফুলজানের সম্পর্কে সভ্যতার কথা ধরা পড়ে। 'দ্যাখ ফুলজান মানুষ নৌতুন কিছু দেখিলে আউগা রে চায় না রে। ভাবে কোন্টা না জানি হয়। পরে যখন পরখ করি দ্যাখ তখন বুঝ পায়। কতগুলা মানুষ যে মানুষ নয়, হাতপাও- ওয়ালা জানোয়ার।'[৩] মা, স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে রহিমের সুখের সংসার। কিন্তু একজন কৃষকের ঘরে শহর থেকে আনা জামাকাপড় ও জুতো দেখে হাকিমুদ্দি সহ্য করতে পারে না। চোর অপবাদ দেওয়ার চক্রান্ত করে ব্যর্থ হয়। যদিও তাতে রহিমের কোন ক্ষতি হয়না। দুর্ভিক্ষ রহিমকে অসহায় করে তোলে। স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েও অর্থ কষ্টে একসময় তাকে তার ফুফার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে ফুলজান ফিরে এলে রহিম কষ্ট পায়। পাঠানোর সময়ও তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল। তবে দারুণ আঘাত লাগল হাকিমুদ্দির লঙ্গরখানায় তাদের পাঠিয়ে। সেখানেও অন্ন জোটেনি তাদের। কারণ রহিম চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়। নিজে না খেতে পারার যন্ত্রণা, পরিবারকে খেতে দিতে না পারার ব্যর্থতা রহিমকে যেন অগাধ প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। শ্রীমন্তকে জিজ্ঞাসা করে— রহিম। (ঈষৎ হেসে) জন্মের দিন হাকিমুদ্দীর কপালে ধন দৌলত আর মোর কপালে উপাস ন্যাকে ক্যান ক'?

শ্রীমন্ত।। মুসলমান ত জন্মান্তর মানে না। মইলে কবরে শুতি নিধ যায়। হিন্দুগুলা ফির জন্মায় বলি মানে। আগের জন্মে হাকিমুদ্দীর কোন না ভালকাম কচ্ছিল তাতে এ জন্মে ধন দৌলত পাইছে।

রহিম।। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কমবুদ্ধির মানুষ হামরা বুঝিবারে পারিনা। কিন্তু একটা ব্যথা মনে হয়। দুনিয়ার মালিক যদি এই জন্মে ইনসাফের বিচার পুরা করি দিল হয়ত মানুষ মন্দ কাম কইল্যা না হয়। যেমন আগুনে ইচ্ছায় হাত দ্যাও

অনিচ্ছায় দ্যাও হাত পুড়ি যায় তেমনি মন্দ কামের ফল তড়িত ঘরিত হইলে এ দুনিয়া ভালো হইল হয়।'[৪]

কোন সিদ্ধান্ত ভাবনা চিন্তা করে না নিলে তার ফল ভয়ানক হয়। কিন্তু অনাহার সেই ভাবনা চিন্তার ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। দ্রুত ফুলজানকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রহিম। কারণ তালাক নেওয়ার পর ফুলজান আর রহিমের স্ত্রী থাকবে না। লঙ্গর খানার খাবার পেতে অসুবিধা হবে না। একবারও ফুলজান ও বসিরের বিচ্ছেদের কথা মনে হয়নি তার। ধর্মভীরু ফুলজান তালাক পেয়ে ছেলেকে ছেলে হাকিমুদ্দির বাড়ি আশ্রয় নেয়। রহিমও ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় বন্ধু মহিমের কাছে আশ্রয় নেয়। ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে ফুলজানের অভাব বোধ হয়। গ্রামে ফিরে এসে কানা ফকিরের সঙ্গে ফুলজানের বিয়ে এবং পুনরায় তালাক দিয়ে রহিম ফুলজানকে বিয়ে করতে চায়। গ্রামের সকলে এমনকি কানা ফকির রহিমকে সাহায্য করতে চাইলেও বাধ সাধে হাকিমুদ্দি। ফুলজান দূর থেকে বসিরকে লক্ষ্য করে- কিন্তু কাছে পাওয়ার উপায় থাকে না। নানাভাবে বিপর্যস্ত রহিম জোর করে ফুলজানকে নিজের কাছে রাখতে চাইলে ফুলজান হাফীজের কথা বলে। আবার এক আঘাত পেয়ে রহিম আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

''মায়ের বুকে থাকি উয়াক কাড়ি নিছি। হামার ভুলের মাশুল হামারে দ্যাওয়ায় নাইগবে।''[৫] রহিম জানত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যদি কেউ বিয়ে করে আবার তালাক দেয় তবে আবার তাকে বিয়ে করা যায়।

ফুলজানের সঙ্গে আবার মিলন হবে এই আনন্দে রহিম বন্ধু মহিমের দেওয়া দিলরুবাটি বাজাতে চায়। কিন্তু দিলরুবার তার ছিঁড়ে গেলে সে আহত হয়। ফুলজানের কাছে সাড়া না পেয়ে রহিম কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে— ''আল্লা মোর যন্তর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পড়ে গেল!''[৬] রহিম ভ্রান্তহীনের মত জীবনের পথ হারিয়ে মৃত্যুকে আপন করে নেয়। বসির ও ফুলজানের দূরত্ব মুছতে রহিমুদ্দি ব্যর্থ হয়ে ফুলজানকে তালাক দিয়েছিল। আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সময় ফুলজানের ধর্মভীরুতা রহিমকে অভিমানে ক্ষত-বিক্ষত করে আত্মহননের পথে ঠেলে দিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে 'ছেঁড়া তার' এর ফুলজান সম্পর্কে বলেছেন- ''হসজাত বৃত্তির মত তাহার মধ্যে ধর্মবোধের বিকাশ হইয়াছে? কোরান হদীজের কথা সে পুঁথি পড়িয়া, কিংবা মৌলভির নিকট শুনিয়া কিছুই শিখে নাই, মুসলমান পরিবারে তাহার জন্ম, মুসলমান আচার জীবনের সংস্কার তাহার জন্ম ও ধমনীতে গিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। সেই জন্য তাহার মধ্যে ইহার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এই রক্ষণশীল শক্তির জন্যই রহিমুদ্দিকে এতদিনের প্রতীক্ষার পর লাভ করিয়াও তাহার কথায়

সে স্বীকৃতি জানাইতে পারিল না। ইহা তাহার চরিত্রের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক।"[৭]

দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও যুদ্ধের পটভূমিকায় রহিম চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। এই একই দুর্ভিক্ষ রহিমের ভেতরেও দু-রকমভাবে কাজ করেছে; কখনো সে বুদ্ধিমান আবার কখনো দেখা যায় সে আবেগপ্রবণ। গ্রামের সকলে যখন খিদের জ্বালায় বুদ্ধি হারিয়ে ঠিক করে হাকিমুদ্দির ধানের গোলা লুঠ করবে, তখন সে অতি বুদ্ধিমানের মতো পরিচয় দিয়ে লঙ্গরখানা খোলার কথা বলে— কিন্তু দেখা যায় রহিমের বুদ্ধি দিয়ে হাকিমুদ্দি নিজের বাড়ি লঙ্গর খানা খুলে নেয়।

শ্রীমন্ত ।। আচ্ছায় বজ্জাত! ক্যামন আগে থাকি শহরে যায়া হাকিম গুলাক ত্যালিয়ে-

রহিম।। ঝাপ্পি উঠে ক্যামন সবার আগে কইলে হজুর একমন করি চাউল হামি রোজ দেবো।"[৮] অথচ এই লঙ্গরখানায় রহিমের স্ত্রী ও ছেলে খাবার পায় না। শ্রীমন্তের সঙ্গে রহিমের যেন আত্মার সম্পর্ক তাই তো সমস্ত বিপদে, আপদে সে শ্রীমন্তকে কাছে পেযেছে। সামাজিক প্রতিরোধ, ব্যর্থ বাবার সন্তানের মুখের খাবার জোগাড় করা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করার বাসনায় শ্রীমন্ত সর্বদা পাশে থেকেছে। বসিরকে তার মায়ের কাছ থেকে রহিম সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে এই অপরাধের কথা শ্রীমন্তকে জানালে সে বলে—

শ্রীমন্ত।। ছিঃ ছিঃ ক্যানে হতাশ হইস্? বছিরের মাও তোর বৌ সব হইবে। হাতাশ খাইস না। বুদ্ধি শুদ্ধি করায় আছে যে। ঘরে যারা দম নিয়া সব কথা হইবে। চল্।[৯]

শুধু তাই নয় কানাফকিরকে নানাভাবে বুঝিয়ে ফুলজানের সঙ্গে বিয়ের পরামর্শ পর্যন্ত পাকা করে শ্রীমন্ত। রহিমের প্রাণের আর এক উৎস বলা যায় মানসিক জগতের উৎস মহিম। নাটকে তাকে দুবার পাওয়া গেলেও সেই দুবারেই রহিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক মানবিক। শিক্ষিত হয়েও রহিম জীবনের অর্থবহ দিককে হারিয়ে ফেললেও মহিম সৌন্দর্যবোধকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রহিমকে ফুলগাছ ও দিলরুবা উপহার দিয়েছে। যা নাটকে গতি এনেছে। ফুলজানের সঙ্গে তালাক নিছক ছেলেমানুষি মনে হয়। তাই বাড়ি ফিরে ফুলজানের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয় এবং ফুলজানের দাসীবৃত্তিকেও ক্ষমা করতে বলে। তুলসী লাহিড়ীর কোনো কোনো নাটকে (যেমন, দুঃখীর ইমানে মাস্টার চরিত্র: কিংবা 'বাঙলার মাটি'তে আবু মিঞা এই ধরনের চরিত্র থাকে, — নাটকের মূল চরিত্রকে যাঁরা জীবনের একটি তত্ত্বের সন্ধান দেন। রহিমের কাছে মহিম তেমনি। মহিম জীবনকে দেখেছে এক সৌন্দর্যবিশিষ্ট দিক থেকে।'[১৫] সেই সৌন্দর্যবোধ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে রহিমের জীবনে।

নাটকে রহিমের একমাত্র প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা যায় হাকিমুদ্দিকে। তার সঙ্গেই

রহিমের সংঘাত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিতে সামান্য চাষি রহিমের কাছে কিছুতেই হারতে পারে না হাকিমুদ্দি তাই প্রতিপদে রহিমকে বিপর্যস্ত করাই তার উদ্দেশ্য ছিল বলা যায়। সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন থেকে নতুন করে গড়ে তোলায় প্রতিপদে বাধ সাধে হাকিমুদ্দি। এই প্রতিরোধগুলি রহিম চরিত্রকে যেমন বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলেছে তেমনি ব্যক্তি জীবন করেছে বিধ্বস্ত। এরই ফলাফল রহিম চেষ্টা করেও তার ফুলজানকে ফিরে না পাওয়া। রহিমের আত্মহননের পথে হাকিমুদ্দির ইন্ধনও যেন পরোক্ষভাবে দায়ী।

মানবিক চরিত্র ছাড়াও আছে দিলরুবার বিশেষ ভূমিকা। এই অজৈব তারের যন্ত্রটি তার Life token হয়ে উঠেছে। এটির সম্পর্কে ধারণার বিবর্তনই তার জীবনের বিবর্তন রূপে নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়া তারই মৃত্যুর অভ্রান্ত পূর্বভাস।'[১১]

নাটকের আরম্ভ থেকে শেষ সমস্ত কাহিনি যেন রহিমের জীবনের পরিণতির পরাকাষ্ঠা। শিক্ষিত সুন্দর রহিম নিজের স্ত্রী, পুত্র, মা পরিজনকে নিয়ে সুস্থভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ রহিম কাউকে তোয়াক্কা না করে পরিজনকে ও আত্মমর্যাদায় বাঁচার মন্ত্র শিখিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিমের আত্মমর্যাদাকে একপ্রকার আত্মহননের দিকে এগিয়ে দিল। অসুস্থ রহিম কাজের উপায় না দেখে স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে ফুলজানের ফুফার বাড়ি পাঠিয়েছিল আত্মমর্যাদার গলা টিপে। কিন্তু সেখানে উপায় না হলে সে দিক ভ্রান্ত হয়ে পরম শত্রু হাকিমুদ্দির লঙ্গরখানায় খাবার খেতে পাঠায়। নিজে অভুক্ত থাকে। সে চৌকিদারী ত্যাগ দেওয়ার কারণে ফুলজান ও বসিরের খাবার জুটবে না। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় তালাকের। যে লঙ্গরখানা খোলার বুদ্ধি তার সেখানে তার পরিজন খাবার পাবে না। এও যেন আত্ম-অবমাননা। তালাক নেওয়া যে কতবড় ভুল সিদ্ধান্ত অসুস্থ বসির তা মনে করিয়ে দেয়। সেই ভুল শোধরাতে গিয়ে রহিম যেন আত্মমর্যাদার চরম হনি ঘটিয়ে ফেলে। তবুও ফুলজানের সম্মতি তার প্রাণশক্তি জোগাতে পারত। কিন্তু ধর্মভীরু ফুলজান সন্তানকে কাছে পেতে চাইলেও রহিমের কাছে যাওয়ার শক্তি পায় না অন্যদিকে প্রিয় দিলরুবার তার ছিড়ে যাওয়া মৃত্যু যন্ত্রণার সমান। নিজের আত্মমর্যাদার এই করুণ পরিণতি রহিমকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়।

সবশেষে বলা যায় নাট্যকার রহিমুদ্দিকে ব্যক্তি চরিত্র করে গড়ে তোলেন নি। তাকে দিয়ে নৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করেছিলেন। এই নৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষ বিশ্বক্ষেত্রে উপনীত হয়। তাই সমাজের হিত সাধনকারী রহিম নাটকের প্রথমে হাকিমুদ্দির অন্যায়ের প্রতিবাদে তার গলা টিপে ধরে। এই ব্যক্তি আক্রোশের সীমা ছাড়িয়ে যায় রহিমের নিজের জীবন দিয়ে এক বৃহত্তর সমস্যার সমাধান করতে। তাই বলা যায় ব্যক্তিগত কারণ নয় সমাজ থেকেও পরোক্ষভাবে আত্মহত্যার

প্ররোচণা পেয়েছিল রহিম। প্রতিবাদ করতে না পারার যন্ত্রণা তার জীবনের এমন পরিণতি।

তথ্যসূত্র:

১. সনাতন গোস্বামী (সম্পা.), তুলসী লাহিড়ী নাট্য সমগ্র, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২৬৪

২. তদেব, পৃ. ২৮৭

৩. তদেব, পৃ. ২৫৬

৪. তদেব, পৃ. ২৮৬

৫. তদেব, পৃ. ২৯৩

৬. তদেব, পৃ. ৩০৪

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১০২

৮. প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃ. ২৮১

৯. প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃ. ৩০১

১০. নির্মলেন্দু ভৌমিক, তুলসী লাহিড়ী : ছেঁড়া তার, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫৩

১১. তদেব, পৃ. ১২০

স্বাধীন ভারতের ঔপন্যাসিকদের কথায় আদিবাসী জনজীবন

মাধব মোহন ঘরামী*

‘অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধু তীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।’

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর না বলা বাণীর জন্য যাদের অপেক্ষা করছিলেন--পরবর্তীকালে তাঁদের আর্বিভাব ঘটেছে। যদিও ও সত্যের খাতিরে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, দ্বিতীয় রবিরূপে নয়—উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে। সেইসব নক্ষত্রের আলোকে অন্ত্যজ মানুষগণের কথা ও ব্যথার ছবিটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

পিপাসা সত্য হলে পানীয় অবশ্যই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবাদাহের মধ্যেই বর্ষার বিন্দু বিন্দু কণাগুলি সঞ্চিত থাকে যথাকালে ধারা পতনের অপেক্ষায়। যে বেপাড়ায় মহাকবির যাওয়া হয়নি এবং সে কারণে তাঁর একটা অতৃপ্তি থেকেই গিয়েছিল। আশাবাদী কবি বলেই তাঁর আশা ছিল যে অনাগত ভবিষ্যতে এমন কবির আর্বিভাব ঘটবে, যারা বে-পাড়ার সাহিত্যের শৌখিন বেসাতি করবে না। পক্ষান্তরে সেখানকার মাটি ও মানুষের আর্তিও আকাঙ্ক্ষাকে, আশা ও স্বপ্নকে যথাযথ রূপে উপস্থাপিত করবে। সুখের বিষয় এই যে, মহাকবির সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্র পরবর্তী অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তরবঙ্গ সাহিত্যে সেই বেপাড়ার মানুষদের জীবনকথা উত্তাল ও উতরোল হয়ে উঠেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রাক্-স্বাধীনতাযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ ও ব্রাত্য মানুষগুলির কথা ও ব্যথা আদৌ উচ্চারিত হয়নি। হয়েছে, তবে তা নিতান্তই কোনো প্রসঙ্গসূত্রে অথবা খুবই সংক্ষিপ্তরূপে।

স্বাধীনভারতে বাংলা ঔপন্যাসিকদের কথায় আদিবাসী জনজীবন আলোকিত করার পূর্বে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি। উক্ত আলোচনায় বে-পাড়ার মানুষ, অন্ত্যজ মানুষ, আদিবাসী মানুষ এই কথাগুলিকে আমি সমার্থকরূপে গ্রহণ করছি। আমি বর্তমান আলোচনায় বে-পাড়ার মানুষদের মধ্যে ভেদাভেদ রাখিনি। আদিবাসী বলতে সেইসব জনজাতির মানুষকে চিহ্নিত করেছি—যারা সুদীর্ঘকাল ধরে, আরও সুষ্ঠ ভাবে বলতে গেলে আর্য আগমনের পূর্বে থেকে এদেশে বসবাস করে আসছে এবং যারা যথার্থই মাটির মানুষ অর্থাৎ মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়ে অবস্থান করাটাই যাদের জীবনের আনন্দ ও আহ্লাদ। আর্যায়ণ অথবা নগরায়ণ এই উভয় অয়নেই এরা সন্ত্রস্ত ও বিপদগ্রস্থ। সেই নগরায়ণের শক্তি ও প্রতাপ, লোভ ও লালসার উদ্ধত বাহু এই

*শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ উচ্চ বিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড।

অরণ্যবাসী শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর জীবনে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করেছে। সেই দাবানল কোথাও ধূমায়িত, কোথাও প্রজ্জ্বলিত।

স্বাধীনভারতের বাংলা ঔপন্যাসিকদের কলমে এইসব জনজীবনের কথা যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, সেগুলি তুলে ধরাই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। তবে সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালানোর পূর্বে সকালবেলার সলতে পাকানোর কাজটা স্বাধীনতা পূর্ব যুগের ঔপন্যাসিকদের কলমে তৈরী হয়েছিল। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজপুত্র জীবন সন্ধ্যা' এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয় 'মিবাররাজ' ও 'বিদ্রোহ' - এ আদিবাসী জনজাতি ভীলদের জীবনের সরলতা, কর্তব্যজ্ঞান ও প্রভুভক্তি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র না থাকলেও 'রাজর্ষি' উপন্যাসে জুমিয়া ও কুকিদের কথা রয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ উপন্যাস 'আরণ্যক' এ সাঁওতাল-গোঁড়-মাহাতো প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর রীতিনীতি, খাদ্য, বাসস্থান, সংস্কার-বিশ্বাস, দেব-দেবী, আতিথেয়তা ও প্রতিবাদী সংগ্রামের বিবরণ পাঠককে ভিন্ন স্বাদের রসনা এনে দিয়েছে। তবে লেখক আদিবাসী জীবনের ব্যথা ও বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরলেও প্রতিকারের পথ নির্দেশ করেননি, তাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের ভার মহাকালের হাতে তুলে দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছেন।

সংবিধান অনুসারে নাগাল্যান্ড এর আদিবাসী নাগা জনজাতির জীবনকে কেন্দ্র করে প্রফুল্ল রায় গড়ে তোলেন 'পূর্ব পার্বতী' উপন্যাসটি। যূথবদ্ধ নাগা জনগোষ্ঠীর মানুষজন জমি ও নারীর অধিকার নিয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্ব এক বংশ থেকে আর এক বংশে, একগোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে প্রবাহিত হয়। তাই তাদের জীবনধারার প্রতিটি মুহূর্ত প্রবল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। অরণ্য প্রকৃতির ফলমূল, পশুপাখির মাংস এবং নিজেদের বহু পরিশ্রমে উৎপন্ন সামান্য কিছু শস্যে তারা জীবন ধারণ করে। নারী পুরুষ ছাড়াও বিবাহিত অবিবাহিতের পোশাক পরিচ্ছদের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নাগা রমণীরা শরীরে আরেলা পাতার রস দিয়ে উল্কি এঁকে পৃথিবীর আদিম শিল্প ফুটিয়ে তোলে। তাদের বিশ্বাস 'রিখুস' প্রেতাত্মার রোষের অভিশাপে নাগা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং 'রেনজু আনিজা' কুপিত হলে অন্যায়কারীকে রাত্রে নাম ধরে ডেকে পাহাড়ের থেকে খাদে ফেলে মারবে। এছাড়া ডাইনী প্রথায়ও বিশ্বাস রয়েছে।

নাগাদের 'মারাড' হল গ্রামের ঐতিহ্যের স্থান বিরোধী গোষ্ঠীর মুন্ডু কেটে মোরাডে বর্শার ফলায় গেঁথে রেখে বীরত্ব প্রকাশ করত। আবার মোরড অবিবাহিতদের আবাসস্থল ও শিক্ষালয়। এখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। বিনিময় অর্থনীতিতে তারা প্রয়োজন মেটালেও পরে খাজনা দেওয়ার জন্য মুদ্রা সংগ্রহ করে উৎপন্ন শর্ষে'র বিনিময়ে। তাদের দারিদ্রতার সুযোগে ব্রিটিশরা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। তাদের

মধ্যে জাতিগত বা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব থাকায় উপন্যাসে তিনটি প্রেমকাহিনী (জেভেথাঙ-নিত্যিসু, সেঙাই-মেহেলী, এটোঙা-হ্যাজাও) সার্থক হয়নি। আবার সেঙাই-মেহিলীর প্রেমকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংঘাত নাগা পাহাড়ের প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নাগাদের গণতান্ত্রিক চেতনা উজ্জ্বিত হয়। যেখানে মুক্তির সুর উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি বহিরাগত আর্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষের অনার্য আদিম আধিবাসী জনজাতি পর্বত কন্দরে, গুহায়, অরণ্যের গভীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যাপন করে। কিন্তু তথাকথিত সুসভ্য আর্য সভ্যতার লোভের গ্রাস সেখানেও তাদের আক্রান্ত করে। অথচ বিদেশী শাসক ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে তারাই প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করে।

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের লাভপুরের সন্তান হওয়ায় আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে সাঁওতালদের খুব কাছ থেকে দেখে ছিলেন। 'জঙ্গলগড়' উপন্যাসে সভ্যতার আলোবাতাহীন অবাধ স্বাধীনতার এক জনগোষ্ঠীর কথা বর্ণিত হয়েছে—ছত্রিশ জাতিয়া। এরা পূর্বে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ হলেও পরে জাতপাত ভুলে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে। 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনা ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করে বর্তমান দৃষ্টির আলোকে অরণ্যচারী মানুষের স্বপ্নকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন। হিন্দু মহাজন, জোতদার ও ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচারে অত্যাচারিত সাঁওতাল মানুষজন সংঘবদ্ধ হয়ে সিধুকানুর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ করে তা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। যদিও সে বিদ্রোহে আদিবাসীরা তীর ধনুক নিয়ে বন্দুক-কামানের কাছে জয়লাভ করতে পারেনি। আর সিধু-কানুর মৃত্যুতে এই বিদ্রোহ থেকে গেলেও উক্ত গণ বিদ্রোহের রেশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের দেখা হাজারিবাগ, রাঁচি, সিংভূম, প্রাচীন মানভূম আর পুরুলিয়া অঞ্চলের আদিবাসী জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস 'শতকিয়া' (১৯৫৮), আম। মানভূমের কর্মঠ ভূমিজ জীবনের ছোটো উপনিবেশ মধুকুপিতে দাশু ঘরামি ও মুরলীর প্রেম এবং আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জীবন বর্ণিত হয়েছে। দাশু তার ক্ষুদ্র জমি ও স্ত্রী মুরলীকে ভালোবেসে জেল খেটেছে। গাঁয়ের জমিদার ঈশান বাবুর লোভী হাত তার সামান্য জমিটুকু গ্রাস করে এবং ইংরেজ খ্রীষ্টান মিশনারী তার স্ত্রী সন্তানকে নেয়। এভাবে বর্ণ হিন্দু, মহাজন ও মিশনারী পাদ্রীদের মিলিত শোষণে দাশুর জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। জমি-স্ত্রী-সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা দাশুর অসহায়তায় গুপী লোহার শুনিয়েছে একলা পথ চলার কথা। দাশু ছাড়াও মধুকুপির সমস্ত আদিবাসীর সন্ধ্যার আনন্দের বন্ধু হাঁড়িয়া মদ। মহুয়ার মাতাল রসের নেশায় তারা উৎসবের আনন্দে দুঃখের জ্বালা ভুলে থাকে। উপন্যাসে মুরলী ছাড়া আরো পাঁচজন নারীর জীবন বর্ণনার মধ্য দিয়ে

আদিবাসী নারীর অসহায়তার চিত্র দেখানো হয়েছে। পরিশেষে লেখক শুনিয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষে আদিবাসীদের আশার কথা। সরকার আইন করে জমিদারের জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহারা ও ভাগচাষীদের দেবে—তা যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে। তবে আদিবাসী সমাজে সমবায় ভিত্তিক বন্টন কিভাবে সম্ভব তার পথ বলে দেননি। মূলতঃ ভারতবর্ষ ইংরেজদের দখল থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আদিবাসী জনজাতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

নারায়ণ সান্যাল বাস্তুহারা কয়েকটি পরিবারের পুনার্বাসনের জন্য দন্ডকারণ্যে (রায়পুর থেকে প্রায় ছেষট্টি মাইল দূরে) গিয়ে সেখানকার অরণ্যচারী মাড়িয়া, আবুজমাড়িয়া, মুরিয়া, ভাত্রা, কয়া, গোন্ডু, শবর প্রভৃতি আদিম জনজাতির জীবনের গবেষণাধর্মী উপন্যাস 'দন্ডক শবরী' রচনা করেন। দন্ডকারণ্যের আদিমবাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার পশ্চিমে আবুজমোড় পাহাড়ের আবুজমাড়িয়া, গাঞ্জাম জেলার শবর এবং মালকানগিরি অঞ্চলের 'গোন্ডু' জনজাতি সবচেয়ে বন্য জীবন যাপন করে, বাস্তারের সবচেয়ে বড়ো পরব 'দশেরা'। এই উৎসবে আদিবাসীরা তাদের নিজ নিজ দেবমূর্তি নিয়ে মিছিল করে। এখানকার রাজা এইদিন সকলের সঙ্গে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথের ধুলোয় খালি পায়ে হাঁটেন, এরা বিভিন্ন খেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীর খেলায় পটু, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তীর খেলায় দক্ষতা লাভ করে। আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীগুলির উন্নয়ণের জন্য সরকার হাসপাতাল, স্কুল, পড়াশোনার উপযুক্ত বই, রাস্তাঘাট, বাজার প্রভৃতি গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। লেখকের মনে ভীতি রয়েছে যে, এর ফলে যদি তাদের সংস্কার বিশ্বাস, প্রথা, রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হবে। তবে আমরা আশা করতে পারি সরকার যদি সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেয়, তাহলে নিশ্চিত তারা একদিন মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারবে।

মহাশ্বেতাদেবী আদিবাসী জীবন ইতিহাসকে অবিকৃতভাবে উপন্যাসে রূপদান করেছেন। 'বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে চুয়াড় যুবক কলহণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে বন্দ্যঘটী গাঞি হয়ে অভয়া মঙ্গল কাব্য রচনা করে। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় জানার পর বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণরা বিরোধিতা করে। সমাজের নির্মম আঘাতে কলহণ এর মৃত্যু হলেও চিরকালীন সংস্কারের বুকে সে আঘাত করেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে আমরাও চোর অপরাধী ব্যক্তিদের এই সম্প্রদায়ের নামে গালি দিয়ে থাকি। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে লেখিকা দেখিয়েছেন মুন্ডা জাতির মুক্তির জন্য অনার্য কৃষ্ণ বীরসা মুন্ডা ডাক দিয়েছিলেন উলগুলানের বা মহা বিদ্রোহের। তবে তার ডাক কেবল মুন্ডা জাতির নয়, অরণ্যের সকল আদিবাসীদের জন্য দাবী করেছিল অরণ্যের অধিকার। আর এক প্রতিবাদী আদিবাসী যুবক চোট্টিকে কেন্দ্র করে লিখেছেন 'চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর'

উপন্যাসটি। বীরসার সাথী ধানীমুন্ডা তার অব্যর্থ নিশানার তীরটা চোট্টিকে দেয়, যদি কখনও উলগুলান সংঘটিত হয়। আমরা দেখি যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বীরসা মুন্ডা থেকে ধানী, ধানী থেকে চোট্টি, চোট্টি থেকে হরমু মুন্ডার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংগ্রাম। আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস, জীবনযাত্রা, সংস্কার-বিশ্বাস, বিদেশীদের অত্যাচারের সার্থক চিত্রায়ণ 'টেরোড্যাকটিল' মেসোজোয়িক যুগের টেরোসৌরিয়া শ্রেণীর উড়ন্ত সাপ (বর্তমানে লুপ্ত) হলেও লেখিকা উপন্যাসে 'পৃথিবীর গোধূলি যুগের প্রতীক' হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ভারতের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আদিবাসী জনজাতির সভ্যতা সংস্কৃতিকে তথাকথিত সভ্য মানুষরা বাইরে সভ্যতার মুখোশ ও অন্তরে বর্বরতার দংশনে ধ্বংস করে ফেলেছে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র শংকর নাগেসিয়া পূরণ সহায়কে বলেছে ব্রিটিশ শাসক-জমিদার-জোতদার-আড়কাঠিরা আসার আগে আরণ্যক আদিবাসী জীবনে সমস্যার কালো মেঘ ঘণীভূত হয়নি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসে ধলভূমের আদিবাসী সাঁওতাল, ওরাওঁদের জীবন চিত্রিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের অথনৈতিক দুরাবস্থায় আদিবাসী জনজাতির মেয়েরা ঠিকাদারের অধীনে কুলি কামিনের কাজ করে। আবার প্রাপ্ত পারিশ্রমিক ও অনেক কিছুর বিনিময়ে অর্জন করতে হয়। তথাকথিত মূলস্রোতের সভ্য মানুষরা আজও তাদের কাছে সাহেবদের মতো বিদেশী। অথচ ভাবতে অবাক লাগে আমরা একই দেশের মানুষ। লেখকের সঙ্গে আমরাও একমত যদি কোনদিন বিপ্লব হয় তবে তার নেতা নিশ্চয়ই আদিবাসী জনজীবন থেকে উঠে আসবে।

অনিল ঘড়াই তাঁর 'বনবাসী' উপন্যাসে বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আদিবাসী জীবনকথা সাহিত্যের ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন। বন্য জীবনে সকলের পেট না ভরায় জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হয়। সেখানে গিয়ে তারা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়। নায়ক লগন বিবস্ত্র বনভূমি ও তার অবোধ সন্তানদের আসল রূপে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। আসলে জীবনের লড়াইয়ে তো সবসময় জেতা যায়না। সংস্কার অনুযায়ী আদিবাসী সমাজে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয় মুরগা লড়াই-এ হারজিতকে কেন্দ্র করে। অজ্ঞ আদিম জনজাতির মানুষগুলো নব্য আধুনিকতার গরল পান করে আজও অসহায় হয়ে রয়েছে।

চর্যাপদের কবি শবরদের টিলার উপর বসবাসের কথা বললেও উপন্যাসে লোধা শবরদের বাসস্থান সমতল ভূমির জঙ্গলের গা ঘেঁসে। তারা গর্ব করে বলে যে তারা ব্রাহ্মণের থেকেও বড়ো। একদা তারা জঙ্গলের কাঠচুরি করে মহাজনের কাছে বিক্রি করতো। সময়ের পরিবর্তনে শুধরে গেলেও চোর অপবাদ মুছে যায়নি। তবে শবর চরিত কেবল লোধা শবরদের চরিতই নয়, সমস্ত আরণ্যক মানব গোষ্ঠীর চরিতমালা। এ চরিতমালা কয়েকটি পর্বে শেষ হয়ে যাবে না। ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে। লেখকের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের মতামতের সঙ্গে আমরাও একমত।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে নদীতে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। আদিবাসী জনজাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বহু আইন প্রণীত হয়েছে। তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এত সবের পরেও সাধারণ আদিবাসীর জীবনের মান ও মর্যাদা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঔপন্যাসিকদের সাক্ষ্য যদি গ্রহণীয় হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে—স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের জীবন পরাধীন ভারতের থেকে খুব একটা উন্নত, সমৃদ্ধ বা সুখের হয়নি।

স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের জীবনের মান মর্যাদায় বাইরে পালিশ পড়েছে কিন্তু ভিতরে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সবকিছুর মধ্য দিয়েই নতুন বোতলে পুরাতন মদ পরিবেশিত হচ্ছে। আদিবাসীদের মান উন্নয়ণের যে প্রয়াস করা হচ্ছে, তার মধ্যে সততা ও আন্তরিকতার অভাব স্পষ্টতই চোখে পড়ে। আসলে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি হয়তো আছে। কিন্তু সমানুভূতির একান্ত অভাব। সমকালীন উপন্যাস সাহিত্যের কথা শুনে মনে যদি সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষজন অর্থাৎ আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন সক্রিয়তা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়াসী হন, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের জীবনের স্তর, মান ও মর্যাদার উন্নতি সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. রবীন্দ্র রচনাবলী-বিশ্বভারতী
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. পূর্ব পার্বতী - প্রফুল্ল রায়।
৪. তারাশঙ্কর রচনাবলী।
৫. শতকিয়া - সুবোধ ঘোষ।
৬. দন্ডক শবরী - নারায়ণ সান্যাল।
৭. মহাশ্বেতা দেবী রচনাবলী।
৮. অরণ্যের দিনরাত্রি - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
৯. বনবাসী - অনিল ঘড়াই।
১০. শবর চরিত - নলিনী বেরা।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে যাত্রাপালাকার অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চা

টুনুরানী বেরা*

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বহুগুণী সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। এই ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ থেকেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চা বিকশিত হয়েছিল। গোড়া থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ ছিল সঙ্গীত। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চা আলোচনার সূত্রে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গীতচর্চা প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ এই ঘরোয়া পরিবেশেই অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গীতচর্চায় উৎসাহ পেয়েছিলেন। চিত্র ও সাহিত্যচর্চায় অবনীন্দ্রনাথ যতটা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সঙ্গীতচর্চায় কোন অংশে কম নন। তবে অবনীন্দ্র সঙ্গীত বা এ জাতীয় কোনও ঘরানা তৈরি করতে তিনি সক্ষম হননি। অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাপালায় যে গান ব্যবহার করেছেন তা কিন্তু বাল্য বা কৈশোরে শেখা গান থেকে নেওয়া প্রেরণার প্রকাশ। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের গান শেখানোর রেওয়াজ ছিল। সেই প্রথা মেনে দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষা ধারাবাহিকতা মেনেই সম্পন্ন হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কৃতির পরিবেশে ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে স্বতন্ত্র ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন। রামায়ণ গান, কীর্তনগান, পালাগান, যাত্রাগানের পাশাপাশি ফোতোবাবু হঠাৎবাবু কাপ্তেনবাবুদের দুর্গাপূজা পায়রা বা মুরগির লড়াই পুতুলের বিয়ে ঘুড়ির লড়াই, বেশ্যাবাড়িতে গমন, ফিটন গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়িতে হাওয়া খাওয়া, গঙ্গাস্নান ছাড়াও ছিল যাত্রা থিয়েটারের আসর।

দেবেন্দ্রনাথ তথা কর্তাদাদামশায়ের গানবাজনার শখ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

''কর্তাদাদামহাশয় তখন বাড়ির বড় ছেলে। মহা শৌখিন তিনি তখন, বাড়ির বড় ছেলে ও বাড়ি থেকে রোজ সকালে একবার করে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পেন্নাম করতে আসতেন— তখনকার দস্তুরই ছিল এই।... তা কর্তা দাদামশাই যাচ্ছেন বৈঠকখানা বাপকে পেন্নাম করতে।... কর্তা দাদামশায়ও বাপকে পেন্নাম করে ফিরে আসছেন। সেই ঘরে যখন দেওয়ানজী ও আর কর্মীচারীরা মিলে টাকার তোড়া ভাগ করছিলেন, সেখানে এসে হরকরাকে হুকুম দিলেন, হরকরা তো দুহাতে দুটো তোড়া নিয়ে চলল বাবুর পিছু পিছু। দেওয়ানজীরা কি বলবেন— বাড়ির বড় ছেলে, চুপ করে তাকিয়ে দেখলেন, এখন হিসেব মেলাতে হবে— দ্বারকানাথ নিজেই সব হিসেব নিতেন। দুটো তোড়া কম।

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ।

কী হল।

আজ্ঞে বড়বাবু।

ও আচ্ছা।" [১]

দেবেন্দনাথ ঠাকুর এই 'দু-তোড়া' টাকা গানবাজনার জন্য খরচ করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এখন দু-তোড়া টাকা কিসে খরচ হল জানো? গানবাজনার ব্যবস্থা হল পুজোর সময়। ছেলেরা বাড়িতে আমোদ করবে পুজোর সময়। খুব গানবাজনার তখন চলন ছিল বাড়িতে।" [২]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"কর্তা দাদামশায়ের কালোয়াতি গান শেখবার শখ ছিল, সে তো আগেই বলেছিল। তিনি নিজেও আমাদের বলেছিলেন, আমি পিয়ানো শিখেছিলুম ছেলেবলায় সাহেব মাস্টারের কাছ থেকে তা জানো? আমরা তার গানবাজনা শুনি নি কখনো, কিন্তু তাঁর মন্ত্র আওড়ানো শুনেছি। আহা, সে কী সুন্দর, কী পরিষ্কার উচ্চারণ, সে শব্দে চারিদিক যেন গমগম করত।" [৩]

অবনীন্দ্রনাথ তখন ছোট কিন্তু তিনি সেই সময় কর্তাদাদামশায় বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালোয়াতি গান, পিয়ানো বাজানোর কথা ছাড়াও ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মসংগীত ঠাকুর পরিবারের অবনীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি জনপ্রিয় ব্রহ্মসংগীত শ্রীকণ্ঠ সিংহ গাইতেন এবং তখন অবনীন্দ্রনাথ সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের জনপ্রিয় ব্রহ্মসংগীতটি হল—

"পুণ্য পুঞ্জেন যদি প্রেম ধনং কোহপি লভেৎ
তস্য তুচ্ছং সকলং।
যাতি মোহান্ধ তমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে,
ভাতি তত্ত্বং বিমলং।
প্রেম সূর্যো যদি ভাবতি ক্ষণমেকাং হৃদয়ে।
সকলং হস্ততলং।।" [৪]

অবনীন্দ্রনাথ ষাট সত্তর বছর পরে এই গানটি শোনার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"শ্রীকণ্ঠবাবু আসতেন। এই এখনকার রায়পুর থেকে যেতেন মাঝে মাঝে কলকাতায় কর্তামশায়ের কাছে। বুড়োর চেহারা মনে আছে, পাকা আমটির মতো গায়ের রঙ, জরির টুপি মাথায়। গাইতেন চৌকিতে বসে 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' আর 'পুন্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোহপি লভেৎ।' আমরাও দু'হাত তুলে গাইতুম, 'কোহপি লভেৎ কোহপি লভেৎ।' সেদিন শুনলুম ছাতিমতলায় এই গান। শুনেই মনে হল শ্রীকণ্ঠবাবুর মুখে ছেলেবেলায় শেখা গান। ষাট সত্তর বছর পরে এই গান শুনে মনে পড়ে গেল সেই দক্ষিণের বারান্দায় শ্রীকণ্ঠবাবু গাইছেন, আমরা নাচছি।" [৫]

দেবেন্দ্রনাথ রচিত গানের সঙ্গে ছোটবেলার নাচ গান অবনীন্দ্রনাথ চেতনকাল পর্যন্ত স্মরণে রেখেছেন এবং স্মৃতিচারণে বলেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলাতেই ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

এরপর দেবেন্দ্রনাথ তথা অবনীন্দ্রনাথের কর্তাদাদামশায়ের শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত অবনীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন— ব্রহ্মসংগীত। সেদিন রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—

''যাওরে অনন্ত ধামে দেহতাপ পাসারি
দুঃখ আঁধারে যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহে।'' [৬]

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া পরিবেশে।

অবনীন্দ্রনাথের দাদামশায় গিরীন্দ্রনাথ যতটা না সঙ্গীতরসিক ছিল তার থেকেও বেশি তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। এছাড়া গিরীন্দ্রনাথের আরও শখ সম্পর্কে নীতি অবনীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

''দাদামশায়ের যাত্রা করবার শখ, গান বাঁধবার শখ নানা শখ নিয়ে তিনি থাকতেন।''[৭] সেকালে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাবুবিলাস' নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি বাড়িতেই যাত্রার দল বাঁধতেন। তিনি মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে শখের যাত্রাদলের দলপতি ছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেই করেছিলেন 'বাবুবিলাস যাত্রা' গিরীন্দ্রনাথও ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির অপর একজন সদস্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জ্যাঠামশায়। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ত্যাগী প্রকৃতির। দেবেন্দ্রনাথ প্রয়াণের পর শান্তি নিকেতনে ছোট কুটীরে দ্বিজেন্দ্রনাথ সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেঘদূত'। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 'স্বপ্ন প্রয়াণ'। 'ব্রহ্মসংগীত' রচনা ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের মত দ্বিজেন্দ্রনাথও করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে ঠাকুরবাড়ির সংগীতশিক্ষক যদুভট্টের প্রেরণা ছিল। সংগীতের প্রতি ভালোবাসা থেকে তিনি রাগ সংগীতের বন্দিস্ মেনে কিছু ভাঙা গান রচনা করেছেন। — এপ্রসঙ্গে সমর্থন মেলে সমালোচক গবেষক মানস বসুর 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির জীবনধারা ও গান' গ্রন্থে। এই ভাঙা গান শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই নয় রবীন্দ্রনাথও রচনা করেছেন। ফলে ঠাকুরবাড়ির ছেলে হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ এই ভাঙা গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

এই ভাঙা গান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির পরিবেশেই শিখেছিলেন যা তিনি যাত্রাপালায় ব্যবহার করেছেন। মূল গান বা মূল ছড়া অনুসরণ করে অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাপালায় নতুন কিছু

সৃষ্টি করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশচেতনা ছিল তার কারণও ঠাকুরবাড়ির স্বদেশচেতনা। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং হিন্দু মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর চার বছর সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার জন্য দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন—

‘‘ মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারই
রাত্রি দিবা ঝরিয়ে লোচন-বারি।
জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি।’’ [৮]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীরও স্নেহভাজন ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের কাছে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন মেজমা।

সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে যেমন গান লিখতেন তেমনি অপরকেও গান রচনায় উৎসাহিত করতেন। তিনি ব্রহ্মসংগীত এবং দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান ‘ভারতসঙ্গীত’। গানটি হল—

‘‘মিলে সব ভারতসন্তান
একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পূণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়।
গাও ভারতের জয়, কি ভয়কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।’’ [৯]

এই গানটি সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবী মন্তব্য করেছেন— ‘‘ আজকাল অনেকেই স্বদেশী গান রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু মেজদাদাই এই যুগে সর্বপ্রথম স্বদেশী গান রচনা করেন— ‘মিলে সব ভারত সন্তান’... অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারভুক্ত হবার কারণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত প্রীতির সঙ্গে পরিচয় ছিলেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ভাষা, সাহিত্য, কুস্তি ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ যাত্রা, নাটকের প্রতিও আগ্রহী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ মাত্র নয় বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হেমেন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী নীপময়ী দেবীর অভিনয় দেখেছিলেন। ১৮৮০ খ্রিঃ জোড়াসাঁকোয় ‘মানময়ী’ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছিল। ঐ গীতিনাট্য হেমেন্দ্রনাথ

'ইন্দ্র' এবং নীপময়ীদেবী 'শচী'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। হেমেন্দ্রনাথ যেমন নিজে সঙ্গীত চর্চা করেছেন তেমনি ছেলেমেয়েদেরও সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। হেমেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লেখা ও গান গাওয়া দুই ব্যাপারেই দক্ষ ছিলেন। সম্পর্কের দিক থেকে ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথের এক বছরের বড়োদাদা ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ যখন খুব ছোটো প্রায় দশ-এগারো বছরের বালক তখন ঠাকুর বাড়িতে কালমৃগয়া গীতিনাট্য অভিনয় হলে তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও যুক্ত হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ কালমৃগয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

''তার পর বাল্মীকি প্রতিভার গান একটু ভেঙেটেঙে 'কালমৃগয়া' হল। জ্যোতিকাকা সাজলেন রাজা দশরথ, রবিকাকা অন্ধমুনি, ঋতু অন্ধমুনির ছেলে। এই কালমৃগয়াতে প্রথম বনদেবীর পার্ট শুরু। ছোটো ছোটো মেয়ে যারা গাইতে পারে তারা বনদেবী সেজে স্টেজে নামত, ঘুরে ঘুরে গান করত। তখন নাচ-টাচ ছিল না তোমাদের মতো দুমদাম্ করে। ঐ হাতমুখ নেড়ে গান পর্যন্তই।" [১০]

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া পরিবেশে বালক বয়সেই 'মঞ্চে হাতমুখ নেড়ে গান' করার কাজটি করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তারও পশ্চাতে ঠাকুরবাড়ির জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশচেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। যে সমস্ত গান ও কর্ম অবনীন্দ্রনাথের মানস চৈতন্যকে উর্বর করেছিল তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

'' চল রে সবে ভারতসন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে,সাধ রে সাধ সবে দেশের কল্যাণ।।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করেমোচন ?
উঠ, জাগো সবে বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরান।।
এক তন্দ্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ,
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য এক, মোক্ষ এক, এক সুরেগাও সবে গান।।
দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে নব নব জ্ঞান
নবভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান।।
লোকরঞ্জন, লোক গঞ্জন না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সবভুলি, হিন্দু মুসলমান,
এক পথে, এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান।" [১১]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। নববর্ষ উৎসব,

বিদ্বজ্জন-সমাগম, খামেখয়ালি সভা বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন গান গাইতেন তখন অবনীন্দ্রনাথ এসরাজ বাজাতেন।

অবনীন্দ্রনাথ বাদ্যযন্ত্র এবং সঙ্গীতের শিক্ষা ঠাকুরবাড়ির পরিবেশেই শুরু করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের মতে টেকনিক, স্টাইল ওসব কিছু নয়, আসল হচ্ছে ভিতরের শখ। তিনি সেই শখ থেকে পাকা বাজিয়ে হওয়ার জন্য এসরাজ বাজাবার শিক্ষা শুরু করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অরুণেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি ওস্তাদ কানাইলাল ঢেরির কাছে শেখা শুরু করেছিলেন। তিনি সেই সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

''ইচ্ছে হল পাকা বাজিয়ে হব, যাকে বলে ওস্তাদ। এসরাজ বাজাতে শুরু করলুম ওস্তাদ কানাইলাল ঢেরির কাছে, আমি সুরেন ও অরুদা। শিমলের ওদিকে বাসাবাড়ি নিয়েছিল, আমরা রোজ যেতুম সেখানে বাজনা শিখতে। সুরেনের বিলিতি মিউজিক পিয়ানো সব জানা ছিল, ভালো করে শিখেছিল, সে তো তিন টপকায় মেরে দিলে। অরুদাও কিছুকালের মধ্যে কায়দাগুলো রপ্ত করে নিলেন। আমার আর, যাকে বলে এসরাজের টিপ, সে টিপ আর দোরস্ত হয় না। আঙুলে কড়া পড়ে গেল, তার টেনে ধরে ধরে। বারে বারে চেষ্টা করছি টিপ দিতে, তার টেনে ধরে কান পেতে আছি কতক্ষণে ঠিক যে সুরটি দরকার সেইটি বেরিয়ে আসবে, হঠাৎ এক সময়ে অ্যাঁ— ও করে শব্দ বেরিয়ে এল। ওস্তাদ হেসে বলত, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবারে হল। আবার ঠিক না হলে মাঝে মাঝে ছড়ের বাড়ি পড়ত আমার আঙুলে। প্রথম প্রথম আমি তো চমকে উঠতুম, এ কি রে বাবা! এমনি করে আমার এসরাজ শেখা চলছে, রীতিমতো হাতে নাড়া বেঁধে। ওস্তাদও পুরোদমে গুরুগিরি ফলাচ্ছে আমার উপরে। দেখতে দেখতে বেশ হাত খুলে গেল, বেশ সুর ধরতে পারি এমন, যা বলে ওস্তাদ তাই বাজাতে পারি, টিপও এমন ঠিকই হয়। ওস্তাদ তো ভারি খুশি আমার উপর। তার উপর বড়োলোকের ছেলে, মাঝে মাঝে পেন্নামি দেই, একটু ভক্তিটক্তি দেখাই— এমন শাগরেদের উপর নজর তো একটু থাকবেই। এই পেন্নামি দেবার দস্তুরমত একটা উৎসবের দিনও ছিল। শ্রীপঞ্চমীর দিন একটা বড়ো রকমের জলসা হত ওস্তাদের বাড়িতে। তাতে তার ছাত্ররা সবাই জড়ো হত, বাইরের অনেক ওস্তাদ শিল্পীরাও আসতেন। সেদিন ছাত্রদের ওস্তাদকে পেন্নামি দিয়ে পেন্নাম করতে হত। আমি যাবার সময় পকেটে টাকাকড়ি নিয়ে যেতুম। অরুদা সুরেন ওরা এসব মানত না। এসরাজ বাজাতে একেবারে পাকা হয়ে গেলুম। চমৎকার টিপ দিতে পারি এখন। শখ আমাকে এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।'' [১২]

অবনীন্দ্রনাথের গান বাজনার শখ ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া পরিবেশেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু অন্তরের ভেতর থেকে তিনি গান বাজনার প্রতি এমন তাগিদ পাননি যাতে তিনি ওস্তাদ হয়ে কালোয়াতি সুর বাজাতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথের সৃজনশীল মন ধরাবাধা সুরের চলনে তাল মেলাতে পারেনি। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন—

''দেখি সেই মামুলি গৎ, সেই মামলি সুর বাজাতে হবে বারে বারে। একটু এদিক-ওদিক

হবার জো নেই— গেলেই তো মুশকিল। কারণ, ঐ যে বললুম, ভিতেরর থেকে শখ আসা চাই। আমার তা ছিল না, নতুন সুর বাজাতে পারতুম না, তৈরি করবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বারে বারে ধরাবাঁধা একই জিনিসে মন ভরে না। সেই ফাঁকটা নেই যা দিয়ে গলে যেতে পরি, কিন্তু সৃষ্টি করে আনন্দ পেতে পারি। হবে কী করে— আমার ভিতরে নেই, তাই ভিতর থেকে এল না সেই জিনিস। ভাবলুম কী হবে ওস্তাদ হয়ে কালোয়াতি সুর বাজিয়ে। আমার চেয়ে আরও বড়ো ওস্তাদ সব— যাঁরা আমার চেয়ে ভালো কালোয়াতি সুর বাজাতে পারেন। কিন্তু ছবির বেলা আমার তা হয়নি।... বাজনাটা একেবারে ছেড়ে দিলুম না অবিশ্য— কিন্তু তেমন উৎসাহও আর তেমন রইল না।" [১৩]

অবনীন্দ্রনাথ ঘরোয়া পরিবেশেই সংগীত চর্চা করেছেন। বাড়িতে রোজ জলসা হত। সেই জলসায় রবীন্দ্রনাথের গান এবং অবনীন্দ্রনাথের এসরাজ বাজানো থাকত। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই স্মৃতিচারণে লিখেছেন—

''সে সময়ে রবিকাকার গানের সঙ্গে আমাদের বাজনা ইত্যাদি খুব জমত। এই একতলার বড়ো ঘরটিতেই আমাদের জলসা হত রোজ। ঘন্টার জ্ঞান থাকত না এক একদিন প্রায় সারারাত কেটে যেত। আমি এসরাজ বাজাতুম, নাটোর বাজাতেন পাখোয়াজ।" [১৪]

অবনীন্দ্রনাথ যাত্রাপালার গান লিখেছেন অনেক পরে কিন্তু মনের ভূমিতে সার পড়ার কাজটি বোধ হয় এইভাবে অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ তার যাত্রাপালার গানে কীর্তন বাউল ছড়ার সুর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজটি করেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া পরিবেশ। এসরাজ বাজানোর শিক্ষা এবং চর্চা তিনি ঘরোয়া পরিবেশে শুরু করলেও তা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

স্বদেশীভাব যখন জাগ্রত হয়েছে তখন শুধু সাজসজ্জাতেই দেশী ভাব স্পষ্ট হয়েছে তাই নয় অবনীন্দ্রনাথের ভাবনারও পরিবর্তন হয়েছে। সেই ভাবনা থকেই তিনি দেশকে দেশের শিল্পকে জানতে বুঝতে চেয়েছিলেন। দেশের লোকজ শিল্পকে তিন সম্মান জানিয়ে পুনরুদ্ধার এবং প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন এদেশে যাত্রাপা পালাগান নতুন নয়। তা অনেককাল থেকেই ছিল কিন্তু তাতে মর্যাদা দেবার কথা বোধহয় সেভাবে কেউ ভাবেনি। যদি ভাবত তবে যাত্রাগানের আস্ত ইতিহাস জানতে দিশাহীন হতে হত না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাত্রাপালা গানের জন্য তাদের সময় ব্যয় করেছেন। তারা প্রণম্য। কিন্তু সেই প্রণম্যদের দলে অবনীন্দ্রনাথও একজন। যিনি নিজের মত করে নিজের সৃজনশক্তি দিয়ে নতুন করে পালাগান সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছেন।

তথ্য সূত্র:

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (১ম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ২০১০ পৃ- ৭৮-৭৯

২। তদেব, পৃ- ৭৯

৩। তদেব, পৃ- ৭৯

৪। প্রফুল্লকুমার দাস (সম্পা), ব্রহ্মসংগীত — স্বরলিপি ঃ ৭৫ খণ্ড, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৩৮৫, পৃ- ১

৫। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর ধারে, শ্রীমতী রাণী চন্দ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ- ৭৮

৬। স্বরবিতান, ৮, বিশ্বভারতী। ১৯৭৩, পৃ- ৪৫

৭। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,(পাদটীকা ১) পৃ- ৩৬।

৮। ২৯। সরলা দেবী, শতগান, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১২৫।

৯। মানস বসু, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির জীবনধারা ও গান, দেজ, ২০১৪, পৃ- ৫৬০-৫৬১

১০। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাদটীকা ১), পৃ- ৯৯

১১। উৎপলা গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, দীপায়ন, ২০১৪, পৃ- ১৩৭

১২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাদটীকা ১), পৃ- ১৮-১৯

১৩। তদেব, পৃ-১৯-২০

১৪। তদেব, পৃ-২১

লৌকিক দৃষ্টিতে ওয়ালিউল্লাহ

সৌগত চট্টোপাধ্যায়*

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের প্রথম পর্বের কিংবদন্তী কথাকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর 'লালুসালু' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার পদধ্বনি। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৪৮, প্রকাশক ছিল ঢাকার 'কমরেড পাবলিশার্স'। উর্দ্দু, ফারসী, ইংরেজি, জার্মান ছাড়াও আরো বহু ভাষায় 'লালসালু' অনূদিত হয়ে প্রকাশ পায়। উপন্যাসটি রচনার সময় লেখকের বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ।

'লালসালু' রচনার প্রেক্ষিতটি লেখকের নিজের ভাষাতেই উচ্চারণ করা যাক : ''চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ির কাছে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন লোক হঠাৎ উচুঁ একটা মাটির ঢিবির ওপর চুনকাম করে তার ওপর লালসালু বিছিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে পয়সা নিতে লাগল। সরল বিশ্বাসী পথচারীরা চিরন্তন বিশ্বাসের ভারে এতই অভিভূত যে তারা নানাবিধ কামনায় সেখানে টাকা পয়সা দিতে লাগল। আমাদের দেশে এ রকম দরগা কিন্তু অনেক গড়ে উঠেছে। ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না জানি, তবু এ ব্যবসা ক্রমান্বয়ে প্রসারের পথে"।

উপন্যাসের আখ্যানটি মোটামুটি এই রকম : ধান ও ফসলে ভরা কৃষিভিত্তিক একটি গ্রাম। সেই গ্রামে এসে হঠাৎ একদিন উপস্থিত হয় মজিদ নামে একটি লোক। এসে সে প্রচার করে ''আমি খোদাতালার প্রেরিত দূত। ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ"। সেখনে মজিদ সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। কিন্তু হলে কি হয়, সেখানকার মানুষগুলো ছিল অশিক্ষিত আর বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যই অমন বিদেশে বিভুঁ-এ সে বসবাস করছিল। মজিদ অবশ্য এত স্বীকার করে : ''তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহমমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল। কিন্তু একদিন সে স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন-ই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙে ছুটে চলে এসেছে।"

লোকেরা বহুবার শুনেছে এসব কথা, তবু আবার উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিমান মজিদ বোঝে, এখানেই তাকে শিকড় বিছোতে হবে। অবশেষে বাঁশঝাড়ের মধ্যে পরিত্যক্ত এক কবরকে ঝাড়ামোছা করে মজিদ প্রচার করে এটা জনৈক মোদাচ্ছের

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রামসদয় কলেজ।

পীরের মাজার। গ্রামবাসীরাও তা পরম বিশ্বাসে মেনে নিয়ে চাল টাকা ইত্যাদি দিতে থাকে। এবং তা গ্রহণ করতে থাকে মজিদ। ক্রমে বাড়তে থাকে মজিদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্মান। রহিমা নামে একজনকে সাদিও করে। পরে আবার জমিলা নামে অন্য একজনকে বিয়ে করে। জামিলা কিন্তু রহিমার মতো নয়। সে মজিদ এবং মাজার কাউকেই ভয় পায় না। কোন রক্তচক্ষুর কাছে আত্মসমর্পণ করে না। মজিদও তার সঙ্গে ঠিক পেরে ওঠে না। সে তাকে মাজারে বেঁধে রাখে। অবশেষে এক প্রচন্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগে মজিদের মাজার প্লাবিত হয়ে যায়।

বিদগ্ধ সমালোচক ড. তপোধীর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন : এ আসলে ভূমিসংলগ্ন পৌরসমাজের যথাপ্রাপ্ত ইতিহাসের বিনির্মাণ। আর সেই সূত্রে নতুন আখ্যান-আকল্পের সন্ধাও বটে। কারণ চল্লিশ বা তার পরবর্তী দুটি দশক ধরে বাংল উপন্যাস পরিশীলিত নাগরিক বৈদগ্ধ্যের আশ্রয়ভূমি হয়ে আচ্ছন্ন ছিলেন। প্রায় অনুরূপ মন্তব্য হাসান আজিজুল হকের কণ্ঠেও : 'লালসালু'ই সম্ভবত গ্রাম্য-সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে এবং ধর্মব্যবসার মর্মান্তিক প্রকৃতি নিরূপণে প্রথম আধুনিক প্রচেষ্টা।

স্বভাবতই তাই লোকজ উপাদান অথবা তার অনুষঙ্গের প্রেক্ষিতকে অতিক্রম করতে পারেন নি লেখক। এমনিতেই জল-হওয়ার মতো লোকসংস্কৃতি প্রতিটি জাতির শিরায় শিরায় প্রবহমান। পরিশীলিত সাহিত্যের ভিত্তিভূমি রূপে লোকজ সংস্কৃতি যে কতখানি গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে তা প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'গ্রাম্যসাহিত্যে' প্রবন্ধে কবিকে মন্তব্য করতে দেখা গেছে : ''গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমানে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকাটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে''।

'প্রাদেশিক নিম্নস্তরের' এই ছবি 'লালুসালু' উপন্যাসেও বিদ্যমান। এর প্রেক্ষাপটে আছে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জনজীবন। এক মুসলমান প্রধান অঞ্চলের লোকজীবনে অন্ধ সুরঙ্গ, যেখানে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি ধর্মের আগাছা। বস্তুত গ্রামীণ জীবনবোধ ও সংস্কার থেকে উৎসারিত এর আখ্যান। গ্রামসমাজের চিত্র রূপায়ণে লেখকের প্রয়াস অনবদ্য। তারই এক ঝলক উদ্ধার করা যাক আখ্যান থেকে : পোষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহীমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে. খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠোনটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সেই কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপের, যেন শত সহস্র সাপ শিস দেয়।"

আখ্যানে এমন কিছু বাক্যবন্ধ ব্যবহার হয়েছে, যা লৌকিক প্রবাদ অথবা উক্তির

পর্যায়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, এই আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গী আখ্যানকে যেমন জীবনসংলগ্ন করেছে তেমনি লেখককেও করেছে বিশিষ্ট। এরকমই কিছু বাক্যবন্ধের নমুনা : বেচাইন হয়ে, ধর্মের আগাছা, নিরাক পরা, শস্যের টুপি, মুখে বিষ, ওস্তাদের মার শেষ রাতে, একরত্তি মেয়ে, ন্যাংটা ছেলে, আমসিপারা, ফাঁসীর আসামী, আকাশের চাঁদ, নলি বানিয়ে, জোয়ার লাগা, জান পছানের লোক, রুঠা জমি ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এক নয়। প্রবাদ হল একটি সম্পূর্ণ বাক্য, যেখানে কর্তা কর্ম ও ক্রিয়া তিনটিই উপস্থিত। কিন্তু প্রবাদমূলক বাক্যাংশ তা নয়, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা প্রবচন প্রবাদেরই ভগ্নাংশ মাত্র। স্বাভাবিক ভাবেই এতে পূর্ণভাব প্রকাশ পায় না। তবে বক্তব্য প্রকাশে যে উভয়েরই তুলমূল্য সে সত্য বোধ করি বিস্মৃত হওয়ার নয়। লোকজীবন কর্তৃক সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত এসব লৌকিক প্রবাদ অথবা উক্তির পরিশীলিত সাহিত্যে ব্যবহারের রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। এতে লেখকের বক্তব্য প্রকাশের প্রাঞ্জলতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি রচনাও হয়ে ওঠে শিকড়-সংলগ্ন। 'লালসালু'তেও তার প্রতিফলন।

উপন্যাসে তুকতাক এবং মন্ত্রেরও প্রয়োগ দেখি। মন্ত্র, তুকতাক, জলপড়া, নলচালা, তাবিচ-কবচ ধারণ প্রভৃতি লোকজীবনেরই অঙ্গ। লোকসমাজ এমন অনেককিছু অতিপ্রাকৃতেই বিশ্বাস করে। মুসলিম লোকসমাজের এমনই একটি বিশ্বাস হল, মোল্লা মৌলবিরা মন্ত্র পড়ে নিবার পানিতে ফুঁ দেন। একে বলে 'পানিপড়া'। 'পানিপড়া' খেলে মঙ্গল হল বলে বিশ্বাস। হিন্দুরাও অনেক সময়ে মসজিদে 'পানিপড়া' আনতে যান। লালসালুতে পাচ্ছি তারই উল্লেখ : ''পীর আর মজিদ দুজনেই অসাধু। বুজরুকির লড়াই শুরু হয় দু'জনের। মহব্বতনগরের সবার চেয়ে ধনী সালেক ব্যাপারী। তার স্ত্রী বন্ধ্যা। স্ত্রীর অনুরোধে ব্যাপারী পীরের পানিপড়া আনতে যেতে বাধা পায়। মজিদ ধর্মীয় আচারের ফাঁদ পাতে।'' 'দোয়া দরুদ' পড়া প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে : ''সে রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজার ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ পাশের খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।''

'লোকচার' প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে : ''সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচ ভক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভরে শিলাগুলিকে ডাকত আর শিরালী জপ তপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত, কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, – মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত। আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে।''

উল্লেখ করা যেতে পারে, শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে দিয়ে মন্ত্র পড়ানো, নগ্ন হয়ে নাচা – এসব লোকসমাজেরই বিশ্বাস। বিশ্বাস তাতে শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ হবে।

অন্যদিকে, ধান ভানতে ভানতে মেয়েদের যে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে তা তো আসলে কর্মসঙ্গীতেরই দৃষ্টান্ত, 'বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত' প্রকারান্তরে বিবাহসঙ্গীতের নমুনা। এরকম বিয়ের গান মুসুলিম সমাজে আজ অনুসৃত হলেও হিন্দু সমাজে তা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

বিশ্বাস হল, শুক্রবার দিনটি খুব শুভ মুসলিমদের কাছে এ দিনটি হল 'জুম্মাবার'। 'লালসালু'র মজিদও বলে : ''পরশু দিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দু'জনেরই একসাথে খৎনা না হয়, তবে মুশকিল হবে''। বাঁজা মেয়েমানুষকে হিন্দু-মুসলিম বা অন্য কোন লোকসমাজই সুনজরে দেখে না। তার ওপর অপদেবতার দৃষ্টি থাকে বলে বিশ্বাস। উপন্যাসেও পাচ্ছি : ''হিড়িক এসেছে সংসার থেকে বাঁজা বউদের দূর করার, আর গন্ডার গন্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি''।

লোকজীবনের আরও বেশ কিছু প্রতিফলন অথবা অনুষঙ্গ আমরা পাচ্ছি উপন্যাসে। আখ্যাণে বর্ণিত হয়েছে : ''লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দু'জন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধানক্ষেতে প্রগাঢ় নি:শব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেলো। অঅতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়, ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না।!'

'নৌকো' একপ্রকার লোকযান। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সংহত জনগোষ্ঠী বা লোকসমাজ নৌকাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। নৌকার মতো রয়েছে পাল্কী, গরুর গাড়ি প্রভৃতিও। 'নৌকা' ও 'ডিঙি'কে এখানে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হলেও মনে রাখতে হবে 'নৌকা' ও 'ডিঙ্গি' এক নয়। 'ডিঙ্গি' নৌকারই এক বিশেষ ভাগ। উখরি, ছান্দি, ময়ূরপঙ্খী, বজরা, পানসিতরী, ভড়, লখাই প্রভৃতি নানা ধরণের নৌকাই রয়েছে। রয়েছে তেমনি নানা ধরণের পাল্কীও – সাধারণ পাল্কী, আয়নাপাল্কী, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি। 'লালসালু'র একাধিক জায়গায় আমরা পাল্কীর প্রসঙ্গ পাচ্ছি। যেমন : ''সূর্য যখন দিগন্ত সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মদ্দ দু'জন বেহারা পাল্কী এনে লাগাল অন্দর ঘরের বেড়ায় পাশে।''

লোকনেশার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে কেবল হুঁকো এবং গাঁজা। হুঁকো খেত মজিদ। আখ্যান বেশ কয়েকবার পাচ্ছি তার উল্লেখ :

১. হুঁকায় এক ঝিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি, মজিদ বলে।
২. মজিদ বসে আছে দরজার পাশে, হাতে হুঁকা।
৩. মজিদ হুঁকা টানে আর চেয়ে থাকে।

কম্পাউন্ডারের চেহারা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে :

ভাঙ-গাঁজা খাওয়া রসকমশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের।

লোকঅস্ত্রের মধ্যে কেবল পাচ্ছি দা বা কুঠারের উল্লেখ। এছাড়াও পাচ্ছি কাঁথা,

মাদুর, বেতশিল্প প্রভৃতির প্রসঙ্গ। বলাবাহুল্য এসব লোকশিল্পের নিদর্শন। রহীমা কাঁথা বুনত বলে লেখক জানিয়েছেন : ''রহীমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।'' ''আমেনা বিবি কারো সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে ???? মধ্যে মাদুরে বসে গুণগুনিয়ে কোরাণ শরিফ পড়ে।'' 'মানত' প্রসঙ্গে পাচ্ছি শিরনি বা সিন্নির উল্লেখ। শুভ কিছু হলে সিন্নির মানত শুধু মুসলিম কেন, হিন্দুও করে থাকেন। মজিদ এক বৃদ্ধকে বলেছে : ''তুমি কিংবা তোমার বিবি গুণাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাফ চাইবা। তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পইসার''।

লোকসমাজে ব্যবহৃত হয় হরেকরকমের বাদ্যযন্ত্র। 'লোকবাদ্য' রূপে এগুলির পরিচিতি। মৃদঙ্গ, কাঁসি, কত্তাল, ঢোল এমনই সব 'Folk Instrument'। 'লালুসালু'তে লোকবাদ্য রূপে কেবল পাচ্ছি ঢোলকের উল্লেখ। লোকখাদ্য রূপে 'চিঁড়ে' উল্লিখিত হয়েছে। পল্লীগ্রামে হিন্দু-মুসলিম সমাজে ধান রাখা হয় যেখানে তাকে বলে 'গোলা'। 'গোলা'র উল্লেখ পাচ্ছি আখ্যানে এই ভাবে : ''গৃহস্থদের গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির যত্নটা হয়, মানুষের কাজটাও খোলসা থাকে।''

এছাড়াও উপন্যাসে এসেছে ভূত-প্রেত-আত্মা-কিংবদন্তীর প্রসঙ্গও। এগুলির প্রতি আস্থা লোকসমাজে বিদ্যমান। তেমনই একটি বিষয় উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে : ''—জি. বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাৎ করে ধলামিঞা জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ পড়ে, এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেবংশি।''

সমালোচক যথার্থই লিখেছেন, লালসালু একান্তভাবেই পূর্বাঞ্চলীয় গ্রামীণ জীবনবোধ থেকে উৎসারিত। লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ, এমনকি উপন্যাসের ভাষা ও শব্দচয়নে ???? প্রমাণ স্বতোৎসারিত। কেউ কেউ দেখিয়েছেন, উপন্যাসের সংলাপগুলি আঞ্চলিক হয়েও কেমন ভাবে তা উঠে এসেছে হৃদয়ের মৌল গভীর অনুভূতি থেকে। বস্তুত 'মজিদের অন্ত:সারশূন্যতা, অসহায়তা, পরাজয় ও সচেতনতা'ই শুধু নয়, সেইসঙ্গে আরো সব চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশের রূপায়ণেও লেখকের লোকজীবনবোধের প্রশংসা করতেই হয়।

তথ্য-সূত্র :

১. সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, লালুসালু, কমরেড পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৪৮

হাটেবাজারে: বিহারের অবাঙালি অন্ত্যজশ্রেণির জীবন আলেখ্য

অশোক মণ্ডল*

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল এর জন্ম এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিহারেই সুসম্পন্ন হয়। তিনি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। কলকাতায় ডাক্তারি পড়েন এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় বিহারের ভাগলপুরে কাটান। এই সূত্র ধরে তাঁর বেশিরভাগ রচনায় বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবনের প্রসঙ্গ এসেছে। সেইসব অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালোলাগা, মন্দলাগা, তাদের আচার-আচরণ, সংস্কার, কথাবলার ভঙ্গি, অর্থ উপার্জনের চিত্র এবং দৈনন্দিন সমাজ জীবনের দিকটা বারবার উঠে এসেছে তাঁর কথাসাহিত্যের আলক্ষ্যে। ডাক্তারি পেশার সূত্র ধরে তাঁর অনেক ধরনের মানুষের সঙ্গে আলাপ। বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে ওঠা বসা ছিল। বনফুলের এই জীবন অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের বিষয়ে বৈচিত্র্য দান করেছে। তাঁর উপন্যাসে অনেক মানুষের ভিড়, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র যেমন- মেছুনী, ফেরিওয়ালা, মুচি, মেথর, ধোবা, মুসলিম ইত্যাদি নানা নিম্নশ্রেণির আগমন ঘটেছে। বনফুলের 'হাটেবাজারে' সেরকমই একটি উপন্যাস যেখানে উপরের সব ক'টি বৈশিষ্ট্য একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। 'হাটেবাজারে'র প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে।

'হাটেবাজারে' বাংলায় লেখা একটি উপন্যাস। কিন্তু এখানে বাঙালীর ছবি নিতান্তই কম। এক দুবার কলকাতার প্রসঙ্গ এসেছে এবং তারই প্রসঙ্গে একটি দুটি বাঙালী চরিত্র এসেছে এবং বাকি সব তৎকালীন অখণ্ড বিহারের প্রান্তিক এলাকার অবাঙালি ও বাঙালি জনজাতির ছবি অঙ্কিত হয়েছে। তবে বেশিরভাগ চরিত্রই অবাঙালি অন্ত্যজ শ্রেণির। শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত। সামাজিক মর্যাদায় অনগ্রসর। ক্ষমতাহীন, অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত এবং আর্থিক বিচারে নিম্নস্তরের কৃষক, শ্রমিক উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ অনুসন্ধান করে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। নিম্নবর্গ মানুষের আর্থ-সামাজিক। বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাস্তবতার খুঁটিনাটি পরিচয় এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

মূলত বিহারের ভূ-খণ্ডের আর্থ-সামাজিক সংস্থান। উৎপাদন কাঠামো, শ্রেণিবিন্যাস ও সমাজ বিবর্তনের শ্রমধারায় যেসব প্রবাসী বাঙালী ঔপন্যাসিক উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এস.পি.কলেজ, দুমকা, ঝাড়খণ্ড।

ও চরিত্র চিত্রণে অন্ত্যজ শ্রেণির ছবি উন্মোচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বনফুল। নিম্নবর্গের বহুমাত্রিক আচরণ। জীবন বাস্তবতা তাঁর 'হাটেবাজারে' উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত হযেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লগ্নে সাধারণ মানব মানবীর জীবন অবলোকন সূত্রে প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদে অন্ত্যজবর্গের মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। জেলে, কুলি, ধোপা, মেথর, মুচি, ঝাঁকা-মুটে, ডিমওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, মাছ বিক্রেতা, চিড়ি-মার (অর্থাৎ যারা পাখি মারে), কুঁজড়া (অর্থাৎ যারা তরকারি ফলিয়ে বিক্রি করে) ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির চরিত্ররা বারেবারে ঘুরে ফিরে এসেছে।

সদাশিব ভট্টাচার্য এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। পেশায় তিনি একজন নামকরা ডাক্তার। চাকরি থেকে অবসর নিলেও এখনও তিনি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকার জন্য ডাক্তারি পেশা বজায় রেখেছেন। তিনি মনে করতেন— ''কেবল টাকার জোরে সুখে থাকা যায় না। বেঁচে থাকবার প্রেরণা চাই একটা, সে প্রেরণার উৎস হওয়া চাই মহৎ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথবা ভালবাসা।''[১] সদাশিব শেষ জীবনটীতে একা হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রী মারা গেছে। এক মেয়ে ছিল সেও বিয়ে করে স্বামীর সাথে বিদেশ চলে গেছে। তাই এখন সে বেঁচে থাকার প্রেরণা হিসেবে সাধারণ মানুষগুলোর প্রাণবন্ত হাসি আর ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ানো শুরু করলেন। তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা শুরু করলেন। এমনকি ভ্রাম্যমান ডাক্তার হলেন। এরজন্য সদাশিব খুব বড় একটা 'স্টেশন ওয়াগন' কিনলেন তাতে শোবার জায়গা। রাঁধবার জায়গা, আছে, এইরূপ একটি গাড়ি নিয়ে ভ্রাম্যমান ডাক্তার হয়ে গ্রামে গ্রামে হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে সাধারণ লোকের চিকিৎসা করতে লাগলেন। এইসব করার পেছনে সদাশিব ভট্টাচার্যের যুক্তিটি খুবই স্পষ্ট— ''চিকিৎসা করব পয়সা রোজগার করবার জন্য নয়, নিজের তাগিদে। কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা না করলে হতাশার কবলে পড়তে হবে না।'[২] (হাটেবাজারে, পৃ. ৪৩)

সাধারণভাবে মনে হবে যে, উপন্যাসটি যেন সদাশিব ভট্টাচার্যেরই জীবনচিত্র। কিন্তু উপন্যাসটির বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করলে অনুধাবন হবে বিহার রাজ্যের কয়েকটি প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। হাটেবাজারে পথে ঘাটে পথ চলতি মানুষেরাও লেখকের লেখনী থেকে বাদ যায়নি। বেশিরভাগ চরিত্রই হিন্দিভাষী। আর যেহেতু প্রান্তিক অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা রাজ্য ঘেঁষা সেহেতু এরা কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারে। বনফুল যখন এই উপন্যাস লিখছেন তখনও ঝাড়খণ্ডের জন্ম হয়নি। অখণ্ড বিহার রাজ্য বর্তমান ছিল। বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা উঠে এসেছে যেমন- দুমকা, ছাপরা হাজিপুর, হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, নবীপুর, দবিরগঞ্জ ইত্যাদি জায়গা। এই সব অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের সাথে সদাশিব সুখ-দুঃখের সাথে জড়িয়ে গেছেন। আবদুল, আলী, ভগলু, কেবলী, ছিপালী, কথল, গীতা, জগদম্বা,

আজবলাল, বিলাতী সাহ এবং আরও অনেক নগণ্য লোক তাঁর আত্মীয় স্বরূপ। একে অপরকে আপন বানিয়ে নিয়েছে। নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলোর কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার কারণ হিসাবে বলেছেন— ''ঘনিষ্ঠ না হলে ভালোবাসা যায় না। আমরা পোষা কুকুর বিড়ালকে যত ভালবাসি, দূরবর্তী মহৎ লোককেও ততটা বাসি না। আমি ওদের উপকার করেছি বলেই যে ওরা আমাকে ভালবাসে তা নয়। আমি ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি বলেই ভালবাসে।"[৩]

উপন্যাসটির শুরু হয়েছে বাজারের ঘটনা দিয়েই ''ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্য মাছের বাজারের সামনে তাঁর মোটরটি থামালেন।"[৪] অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি শুরুতেই, হাটে বাজারে যেখানেই যাকে দেখেছেন সেখানেই তার সাথে কথাবার্তা বলেছেন সদাশিব বাবু। এবং এইভাবে সেই ব্যক্তির সাথে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। সে হিন্দু হোক আর মুসলিম হোক। সে নিম্নশ্রেণির হোক বা উচ্চশ্রেণির সকলের সাথেই তার মিষ্টতা বজায় রেখেছে। এইরকম অনেক হাটের কথা আছে— হাজিপুর হাট, নবীগঞ্জের হাট, তিরমোহিনীর হাট, হবিগঞ্জের হাট ইত্যাদি। আর এইসব হাটে হাটে তিনি তার ভ্রাম্যমন গাড়ি নিয়ে ঘুরেছেন এবং সেই হাটেবাজারের মানুষদের টাকা ছাড়াই ওষুধ দিচ্ছেন 'আর এইভাবেই তাদের নানারকম সুবিধা অসুবিধা দেখভাল করছেন, তাদের আবদার মেটাচ্ছেন, কাউকেও নিরাশ করছেন না। ঠিক এরই সূত্র ধরে নানাশ্রেণির মানুষেরা উপন্যাসের ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

বিহারের অবাঙালি অন্ত্যজ চরিত্রগুলির জীবনচিত্র বিশ্লেষণ করতে হলে চরিত্রগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিই। প্রথমত, অন্ত্যজ অবাঙালি হিন্দু, এবং দ্বিতীয়ত, অন্ত্যজ অবাঙালি মুসলিম।

প্রথমভাগের মধ্যে যেসব চরিত্রগুলি পড়ে তা হল— মৈথিল ঠাকুর আজবলাল, জিতু জেলে, মেছুনী ছিপলি, কেবলী বাবুলাল মেথর, সিতাবী মেথর, বনু ইত্যাদি চরিত্র। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাগে যে অন্ত্যজ চরিত্রগুলি পাই রহিম, আলী, আবদুল, শুকুর, ফুলিয়া, সিদ্দিক ইত্যাদি চরিত্র। এছাড়াও কিছু চরিত্র এসেছে যাদের হিন্দু-মুসলিম কোন দলেই ফেলা যাচ্ছে না। যেমন- রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ঝাঁকা-মুটের দল, মেচুনীরা, চিড়ি-মার (যারা 'চিড়িয়া' অর্থাৎ পাখি মারে)। কুঁজড়া (অর্থাৎ যারা তরকারী ফলিয়ে বিক্রি করে) ইত্যাদি। সদাশিবের মনে হিন্দু বা মুসলিম হোক বা অন্য কোন শ্রেণির সকলেই সমানভাবে স্থান পেয়েছে। কোনো উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই। জীবনপথে চলতে গিয়ে যাকেই তাঁর ভালো লেগেছে তাকেই আপন করে নিয়েছেন।

প্রথমেই যে চরিত্রর কথা লিখব সে হল মৈথিল ঠাকুর আজবলাল। সে সদাশিবের বাড়ি রান্না করে। অনেকদিন ধরে থাকাতে তার সাথে এমন তার মাইনের সম্পর্ক নেই। সদাশিবের ঘরের লোক হয়ে গেছে। তাঁর ভাইপোর বৌ মালতীকে 'লাছমী মাঈ' এবং

সদাশিবকে 'বাবু' বলে ডাকে। খুবই সহজ সরল মন এবং খুবই বিশ্বাসী এবং নিঃস্বার্থপর। স্ত্রী মনু মারা যাবার পর এই আজবলালই সদাশিবের ভরসা হয়ে উঠেছিল। তাঁর খাবারের সব আবদার মেটাতে এতুটুকু মনে সংশয় করেনি। আজবলালের বাবুর প্রতি ভক্তি অসাধারণ ছিল- যেমন একটি উদ্ধৃতি— ''একবার খুব ঝাল হয়েছিল বলে মাংসের বাটিটা সদাশিব ঠেলে দিয়েছিলেন। খাননি। আজবলালও খায়নি সেদিন।''[৫] সদাশিবের স্ত্রী মনু মারা যাওয়াতে আজবলালের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তা কাছের খুব আত্মীয় করবে কিনা সন্দেহ জাগে— ''আজবলালকে আর সামলানো যাচ্ছে না। সে মাথা খুঁড়ছে। চুল ছিঁড়ছে। পাগলের মতো হয়ে গেছে।''[৬]

অবাঙালী মুসলিম নিম্নশ্রেণির একটি অন্যতম চরিত্র হল আলী। সদাশিবের গাড়ির ড্রাইভার। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে বেশিরভাগ সময়ই হিন্দি ভাষাতেই কথা বলেছে। তাঁর চরিত্রের দিকটিও খুবই আকর্ষণীয়। সারা উপন্যাস জুড়ে আলী চরিত্রটি বিরাজমান। তার চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দৃঢ়তা, বিশ্বাসী, প্রভুভক্তি ইত্যাদি। যেমন একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাক— একবার দুর্গাপুজোয় যাওয়ার পথে রাস্তায় টায়ার ফাটলে, আলী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল— ''কুছ, ফিকির নেই হুজুর, আভি হাম সব ঠিক করে দেতে হেঁ।.... আপ পেড়কা ঠান্ডে মে মজেসে বৈঠ যাইয়ে।''[৭] তার জীবনচরিতটি বেশ বৈচিত্র্যময়। সে রিকশা চালিয়েছে। টমটম চালিয়েছে। ঘোড়া গাড়ির কোচোয়ানও ছিল, মুটেগিরিও সে করেছে। বনফুল তার জীবনচরিত্রটিকে খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন- ''বহু জায়গায় ঘুরেছে। বহু মনিবের কাছে মোটরের ড্রাইভারি করেছে। মিলিটারিতে ছিল, দেশ-বিদেশেও ঘুরেছে অনেক।''[৮] বিহারের প্রান্তিক এই অঞ্চলগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশগুলিতে মানুষ কত শান্তপ্রিয় স্বভাব। সজীব প্রাণবন্ত, সরল হতে পারে আলী তাদের মধ্যে একজন। সদাশিবের যেকোন প্রশ্নের উত্তরে যে প্রতিবারই বলে উঠেছে— 'বহুত খু'। এইসব উক্তির মধ্য দিয়ে সে সমস্ত বাঙালী পাঠকের মনে গেঁথে যায়।

অন্ত্যজ নারী চরিত্রের মধ্যে কেরলী একটি অন্যতম চরিত্র। সে জাতে মুচি। সে হিন্দিভাষী হলেও তাকে ভাঙা বাংলায় কথা বলতে দেখা গেছে। কেরলী গ্রামের মোড়ল ছবিলালের দ্বারা অত্যাচারিত, শেষিত। কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে এদের সর্বনাশ করে থাকে মোড়লটি। আবার এই মোড়লের সাথে দারোগাবাবুরা হাতে হাত মেলায়। দারোগা, মোড়ল এদের হাতে কেরলীর মতো মেয়েরা কতরকমভাবে লাঞ্ছিতা হত তার হিসেব নেই। বনফুল নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি করে যেন কেরলীকে চিত্রিত করেছেন। একটি ঘটনার একটি উদ্ধৃতি অংশ না তুললেই নয়— ''তাকে জেলে আটকে রেখেছে। আমি কাল দেখতে গিয়েছিলাম। অমন জোয়ান মরদ। মেয়েমানুষের মতো হাউ হাউ করে কাঁদছে।''[৯] তার স্বামীকে জেলে কাঁদতে দেখে কেরলী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। আবার এই কেরলী যখন নিঃসন্তান। তখন তার স্বামী এক কানী বিধবাকে আবার বিয়ে

করে। কানী বিধবার বাবা কেরলীকে চাষের জমি দেবে বলে লোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই জমি তার ভাগ্যে জোটেনি। অন্ত্যজ শ্রেণির এক নিঃসন্তান নারীর করুণ চিত্রটি খুবই মর্মস্পর্শী করে লেখক দেখিয়েছেন। আবার সতীনের সঙ্গে চুলোচুলি অর্থাৎ ঝগড়ার প্রসঙ্গটিও চিত্রিত হয়েছে। সবমিলিয়ে মুচি পরিবারের এক জীবন আলেখ্য প্রস্ফূটিত হয়েছে। সতীনের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা নিয়ে কেরলীর একটি মন্তব্য এখানে দেখানো যাক—

''কানী হামরা মারে লে দৌগেছে। বড় বরিয়ারছে। হাম্ ভাগীকে চললো আইলি। বড় মারমুণ্ডা ছে। ওকরো ভী মারেলা দৌগেছে।''[১০]

অন্ত্যজ শ্রেণির আর একটি নারী চরিত্র খুবই প্রাধান্য পেয়েছে এই উপন্যাসটিতে তার নাম হল ছিপলী। সে হল মেছুনী, হাটেবাজারে সে মাছ বিক্রি করে। এরা খুব গরীব এবং খুবই নিম্নমানের জীবন যাপন করে। এই প্রসঙ্গে ছিপলীর একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক— ''আপনি তো জানেন আমরা কত গরীব। বাবা অন্ধ। মা শুষছে। ভাইটা তাড়িখোর। সপ্তাহের মধ্যে তিনদিন কাজ করে না। আমরা কি করে অত টাকা শোধ করব?''[১১] এরা খুবই পরিশ্রমী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এরা হাড় খাঁটুনি খাটে। একদিন এরাই আবার গ্রামের ক্ষমতাধারী মোড়লের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। লাঞ্ছিত হয়। পথেঘাটে হাটেবাজারে এরাই এইসব লোকের কুনজরে পড়ে এবং লোভ-লালসার শিকার হয়। কেরলীর মতো ছিপলীকেও সেই লোভ লালসার হাত থেকে বাঁচার লড়াই করতে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য— ''ছবিলাল মোড়লের ছেলে একদিন বাজার থেকে কি একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল। ছিপলী বঁটি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল তোর নাক কেটে দেব।''[১২] ছবিলাল মোড়ল একজন কংগ্রেস-অনুগৃহীত ব্যক্তি। এরা এস.পি। ডি.আই.জি, দারোগাবাবুদের হাতের বশ করে রাখে। এদের সহযোগিতায় কেরলী ছিপলীর মতো পরিবারগুলোর সর্বনাশ করে ছাড়ে।

গীতা-তেমনি আর একটি নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণির নারীচরিত্র। তার জীবন আলেখ্যটি এইরকম—

''গীতা শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। তার স্বামী দুশ্চরিত্র, মাতাল। শ্বাশুড়ী দজ্জাল। তিনটি ননদ আছে, তিনটিই হাড় জ্বালনী। কেউ শ্বশুরঘর করে না। সব মায়ের কাছে আছে। শুধু তারা নয়, তাদের স্বামীরা এবং ছেলেপিলেরাও। গীতাকেই সকলের সেবা করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই মারধোর করে। একদিন এমন ইট ছুঁড়েছিল যে মাথা ফেটে গিয়েছিল তার।''[১৩]

গীতার স্বামী এক ব্রাহ্মণের জমি চাষ করে। কিছু টাকা ধার দিয়ে এদেরকে বছরের পর বছর কাজ করিয়ে নেয়। আর সেই টাকায় সুদের সুদ জমে পর্বত সমান করে দেয় এই ধূর্ত ধনীরা। তাই সেই টাকা কোনোদিন শোধ করতে পারেনা। ফলে তাদের সারাজীবন দাসত্ব বৃত্তি করতেই থাকে। এই ব্যাপারে লেখক বনফুলের একটি মন্তব্য মন

ছুঁয়ে যায়— ''...দাসত্বপ্রথা এখনও লোপ পায়নি। কেবল তার বাইরের রূপটা বদলেছে মাত্র। দাস-দাসী বিক্রয়ের আলাদা হাটবাজার নেই আজকাল। সমাজের বুকের উপরই ঘরে ঘরে যে হাট বসেছে। ধূর্ত ধনীর কাছে অসহায় ও দুর্বলরা স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করছে।"[১৪] এছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকে না। বনফুলও একজন চিকিৎসক। সেই বিচারে অনেক মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং অন্ত্যজ শ্রেণির ঘরে ঘরে এই ছবি দেখেছিলেন। স্বামী মাতাল, শাশুড়ী দজ্জাল। ননদের গালমন্দ আবার সমাজের ধনী ব্যক্তিদের কাছে লাঞ্ছিতা, শোষিতা হয়ে তারা কত অসহায়। ডাক্তার সদাশিব চোখ দিয়ে বনফুলের সেই বাস্তব অভিব্যক্তিরই প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি।

বনু কয়লা গুদামের কুলি। কুলির কাজ করতে করতে হাড় কালি হয়ে যায়। তবু সমাজে তার কোনো সম্মান নেই। মর্যাদা নেই। শেষপর্যন্ত যার নাম কিনা 'কয়লা' হয়ে যায়। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। তবুও গুদামের মালিক শিখী মড়োয়ারীর মতো পিশাচ লোকের আশানুরূপ সাহায্য মেলে না। অথচ এরা কত সহজ, সরল মন নিয়ে বেঁচে আছে। এই বনুই একদিন এক বৃষ্টি বাদলের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সদাশিব ডাক্তারের বাড়িতে কয়লা না থাকাতে সে নিঃসঙ্কোচে বলেছে— ''আপনি বাড়ি যান। কয়লা পৌঁছে দিচ্ছি আমি।"[১৫]

এমনি নানা চরিত্রের আগমন ঘটেছে। এরা কোনো না কোনোভাবে সমাজের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। হয়তো কেউ, অত্যাচারিত, কেউ লাঞ্ছিত, কেউ মিথ্যা দেনার দায়ে জেল যাচ্ছে, মিথ্যা চুরির দায়ে জেল খাটছে ইত্যাদি নানাভাবে এরা দলিত হচ্ছে। এদের হাতে টাকা নামমাত্র আছে। এক জেলের মুখ থেকে পাই যেমন একটি উক্তি— ''আমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে বাবু। আপনাকে তো কিছু দিতে পারিনি। তাই এই মাছটা—"[১৬]। আর এক কুঁজড়া জগদীশকে পাই যে কিনা নবীগঞ্জের ঘাটে বাটে তরকারি বেচে দিনযাপন করে। এরা ধনীদের 'বাবু', 'হুজুর', 'হুজোর' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করে, কিন্তু এরা কোন সম্মান পায় না। এরা টাকা ধার করে, দুধ দিয়ে ঘুঁটে দিয়ে টাকা শোধ করে। আর তাও না পারলে অসহায় ভাবে তার কাছে দাস হয়ে যায়। যেমন গীতিয়া বলে এক নারী বলেছে— ''ছবিলাল মোড়লের বাড়িগিয়ে লোকরিতে বাহাল হয়েছি। খাওয়া পরা দেবে; তাছাড়া ২৫ টাকা মাইনে দেবে।"[১৭] রক্ষকই তখন ভক্ষখ হয়ে ওঠে। এইভাবে আমরা দেখতে পাব অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চরিত্র এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। বনফুল বিহারের ওইসব অঞ্চলগুলি কর্মসূত্রে চষে বেড়িয়েছেন। তাই তাঁর পক্ষে এইসব বাংলা ঘেঁষা অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোর জীবনচিত্র চিত্রণে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। খুব সহজ সুন্দর ভাষায় তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। নিম্নবর্গের চরিত্রের ভাষা খুবই সজীব ও প্রাণবন্ত হয়েছে। তাই এক একটি চরিত্রকে সমাজের এক একটি বাস্তব চরিত্র বলে মনে হয়েছে। এরা বেশিরভাগই অবাঙালি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সীমান্তবর্তী

অঞ্চলের মানুষের ভাষা স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভাষা বাংলা ভাষার রূপ নিয়েছে এবং বাঙালির সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর বনফুলের সেই প্রবাসী বাঙালী যিনি প্রথম বিহারের একেবারে অগ্রণী সমাজের মানুষের কথাকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এবং 'হাটেবাজারে' উপন্যাসটি তাঁর সেই সফল প্রয়াস। এটি যে নিম্নবর্গ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনের দর্পণ ও দলিল বিশেষ এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসহায়ক :

১. 'হাটেবাজারে', বনফুল; গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ১১এ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২রা জুন, ১৯৮৮, পৃ. ১০

২. 'ঐ'- পৃ. ৪৩

৩. 'ঐ', পৃ. ৫৯

৪. ঐ, পৃ. ৫

৫. ঐ, পৃ. ৮০-৮১

৬. ঐ, পৃ. ৩৪

৭. ঐ, পৃ. ৩৭

৮. ঐ, পৃ. ৩৮

৯. ঐ, পৃ. ৬২

১০. ঐ, পৃ. ১০৬

১১. ঐ, পৃ. ৬১

১২. ঐ, পৃ. ৮৫

১৩. ঐ, পৃ. ৬০

১৪. ঐ, পৃ. ৬১

১৫. ঐ, পৃ. ৭৬

১৬. ঐ, পৃ. ৬৩

১৭. ঐ, পৃ. ১০৩

গ্রন্থঋণ

১. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস, কলকাতা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০।

২. মনোহরমৌলি বিশ্বাস, দলিত সাহিত্যের রূপরেখা, বাণী প্রকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি-২০০৭।

৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সমাজ-সমীক্ষা, অপরাধ ও অনাচার, গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমাদর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

৪. জহরসেন মজুমদার, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জুলাই ২০০৭।

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী নারী

অরুণাভ মুখার্জ্জী*

যে কোনো সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের মতো নারীদের স্থানও মহত্বপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক, সহযোগী, সমকর্মী ও সহভোগীরূপে শুধু সৃষ্টির অস্তিত্বকেই বজায় রাখেনি, বরং সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রগতি সাধনে একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলমান পৃথিবীর ধারা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিনী ও সহযোগিনী। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চার যুগ ধরে নারীরও পুরুষদের পাশাপাশি থেকে গৃহস্থ ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি, আচার-বিচার, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য সাধনা, আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক চিন্তা, এমন কি যুদ্ধ বিদ্যাতেও অংশগ্রহণ করেছে। সর্বক্ষেত্রে পুরুষের মতো নারীরও সমান বিচরণ। পুরুষের মতো নারীও সর্বকর্মে পারদর্শিনী। নারী বলতে জায়া, জননী ও দুহিতাকে বুঝে থাকি। নারীর এই তিনটি স্বরূপ ছাড়াও সামাজিক সম্পর্কের খ্যাতিতে নারী বিভিন্ন স্বরূপে বর্তমান। এই নারী যে স্বরূপে সমাজে তার অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান এবং যেমন যেমন বয়সানুক্রমে তার অবস্থার পরিবর্তন, তদুনুরূপেই তারা সমাজে নিজের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে বজায় রেখে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজ কর্ম সম্পাদন, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির পালন দ্বারা এক মহত্বপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকা বজায় রেখে চলেছে।

আমরা জানি এখনও আমাদের সমাজ পুরুষ শাসিত পিতৃতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিবার ও সমাজ জীবনে মাতৃতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের অবমূল্যায়ণ হয় নি। নারীর মহত্বকে আমরা কোনোদিনই অস্বীকার করতে পারি নি। বেদে, উপনিষদে, স্মৃতি-শাস্ত্রে নারীর অপার মহিমা ও মহত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'মনুস্মৃতি'তে বলা হয়েছে, যে পরিবারে নারীর সমাদর হয়, তার অভাব-অভিযোগ ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সেই পরিবারে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজমান থাকে এবং যে পরিবারে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাকে কষ্ট দেওয়া হয়, সেই পরিবার অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। পরিবার, সংসার ও সমাজে নারীর মহত্ব চিরকালের। ঋগ্বেদেও নারীর মহত্বের উল্লেখ আছে। বেদের সার গ্রন্থ উপনিষদেও এমন অনেক মহিলাদের উল্লেখ আছে যারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিচার-বিবেচনায় পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন। উপনিষদের গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা তাঁদের কীর্তির মধ্যদিয়ে যুগ যুগ খরে বিশ্বমানবের স্মৃতিতে চির ভাস্বর হয়ে আছেন। উপনিষদের

*অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়, চুরুলিয়া।

মৈত্রেয়ী তাই বলেছেন— ''যে নাহং না মৃতা স্যাং কিমহং তেন কুয়াম?''- যা আমাকে অমৃত দিতে পারবে না তা নিয়ে আমি কী করব। গার্গী ছিলেন পরম ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মতত্ত্ববিশারদ ও সু-তার্কিক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ববারাও ছিলেন অতুলনীয়া।

নারী কেবল পুরুষের প্রয়োজনের জন্যই সৃষ্টি হয়নি, বরং নারী পুরুষের রক্ষা কবচ। উপনিষদের সত্যকাম জননী জবালা এক মহান আদর্শের প্রতীক। আমরা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণাদি বহু গ্রন্থে, নারীর শ্রী-সৌন্দর্য-ঐতিহ্য-কর্মনিষ্ঠা-ভক্তি, এমনকি অনেক অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয়ও পেয়ে থাকি। কতো বিচিত্র বৈচিত্র্য নিয়ে বিশ্ব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে আছেন লক্ষ লক্ষ নারী। রামায়ণের কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, সীতা, উর্মিলা প্রভৃতি নারীগণ আজও আমাদের নারী সমাজে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মহাভারতের দেবযানি, শর্মিষ্ঠা, দেবকী, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী প্রমুখ অনেক রমণীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা অবিস্মরণীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের রাধা, যশোদা, বৃন্দাবনের গোপীগণ আদর্শ নারীত্বের মর্যাদায় বিভূষিতা। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ— নারী মহত্বের বহু পরিচয় তুলে ধরেছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও আমরা দীর্ঘকাল ধরে নারী মহিমার উল্লেখ পাই। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র শকুন্তলা, অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা, 'মেঘদূতমে'র যক্ষ পত্নী ও উজ্জয়িনীর রমণীগণ; 'রঘুবংশে' রাজা দিলীপের পত্নী ইত্যাদি নারীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব ভাষার সাহিত্যেই আছে নারীদের প্রসঙ্গ। বস্তুত 'নারী জগতের এক পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি, ত্যাগ তার স্বভাব, প্রদান তার ধর্ম, সহনশীলতা তার ব্রত, প্রেম তার জীবন''।

বাংলা সাহিত্যের আদিম যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই, যেখানে নারীদের কথা চর্চিত হয় নি। মধ্যযুগের সাহিত্যের সতী ময়না, লোরচন্দ্রানী, পদ্মবতী, মনসামঙ্গলের সনকা-বেহুলা, চণ্ডীমঙ্গলের লহনা-খুল্লনা, ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী প্রমুখ নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আধুনিক যুগেও বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল প্রাঙ্গণে উপন্যাসে-গল্পে-নাটকে-প্রবন্ধে-রম্য রচনায়, এমন কি কাব্য-কবিতাতেও নারীদের চর্চা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সূচনা পর্বের ঔপন্যাসিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র বিমলা, তিলোত্তমা, আয়েসা; মৃণালিনী, 'চন্দ্রশেখরে'র দলনী ও শৈবালিনী, 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভ্রমর, রোহিনী, 'কপালকুণ্ডলা'র কপালকুণ্ডলা, 'সীতারামের' শ্রী ও জয়ন্তী, 'রাজসিংহে'র দরিয়া প্রভৃতি নারীগণ স্ব-মহিমায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি'র নলিনী, 'গোরা'র সুচরিতা, কমলা, শৈলজা, ললিতা, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'চতুরঙ্গে'র দামিনী প্রমুখের মধ্যে রমণীর বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পেয়েছে। স্বলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র বহু বিচিত্র চরিত্রের রমণীদের আবিষ্কার করেছেন তাঁর

কথাসাহিত্যে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে চর্চিত অন্নদা দিদি, অচলা, সাবিত্রী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী, সুরবালা, মৃণাল, মনোরমা, কমলা ইত্যাদি নারীগণ স্ব স্ব আচারে, ব্যবহারে ও কর্মে পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকুরুণ, ভানুমতি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরুবালা, পদ্মবউ, বিনোদিনী, অরুন্ধুতী, ঠাকুরঝি, বসন্ত, এবং তাঁর আদিবাসী জীবন সম্বন্ধিত উপন্যাস 'অরণ্যবহ্নি' ও 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় অনেক আদিবাসী রমণীর জীবন চর্যার উল্লেখ আছে। সাম্প্রতিককালের পুরুষ ও মহিলা উপন্যাসিকেরাও তাঁদের উপন্যাসে নারীদের বিচিত্র জীবন কাহিনীর চর্চা করেছেন। নারী এবং পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (Complimenfony)। এককে বাদ দিয়ে অন্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। মানব সৃষ্টির কাল থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সংসার ও সমাজে পুরুষের মতোই নারীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দেব, মানুষ দৈত্য, দানব, অসুর, যক্ষ-রক্ষ, কিন্নর প্রত্যেক সমাজেই নারী আছে, নারীর অস্তিত্ব আছে, মর্যাদা আছে এবং তাদের সার্বিক প্রয়োজনীয়তাও বিদ্যমান। সুতরাং তাদের মহত্বকে নিয়ে আমরা বিরূপ সমালোচনা করতে পারি না। শিক্ষায়-দীক্ষায়, রাজনীতিতে, ধর্মে, শাস্ত্রে, সংস্কৃতিতে, এমন কি অস্ত্রেও তাদের পারদর্শিতাকে এড়িয়ে চলা যায় না। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাণী দুর্গাবতী, রাজকুমারী শোভা, দেবী চৌধুরাণী, প্রফুল্ল, মাতঙ্গিনী হাজরা ইত্যাদি নামও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। প্রয়োজনে এঁরা যোদ্ধৃ বেশে অস্ত্র ধারণ করে শহিদও হয়েছেন।

অথচ আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর মধ্যে সমস্ত সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও তাদের উচিত সম্মান বা মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেছে। সময়ে সময়ে তাঁরা পুরুষ শাসিত সমাজে বাল্য বিবাহের শিকার, বাল বিধবার যন্ত্রণা, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি কুকৃতির ফাঁদে পড়ে আত্মবলিদান, আবার কখনো পুরুষদের নির্লজ্জ, উগ্র যৌনাচারের শিকার হয়ে সমাজ বিচ্যুত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক সময় আর্থিক দুরাবস্থা ও সামাজিক অশ্লীলতার কারণে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। ইতিহাস এবং সাহিত্য নারীদের সেই সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

সাম্প্রতিক কালের কথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পে আদিবাসী জীবন সংস্কৃতি ও সংগ্রামের একটি গবেষণামূলক ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে নারীর বাস্তবিক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথ হেঁটে আজকের আধুনিক সভ্যতার যুগে মানব জাতি সভ্যতার চরমোৎকর্ষের উচ্চশিখরে এসে দাঁড়িয়েছে, তথাপি পুরুষ শাসিত সমাজে নারী সম্পর্কে অনিহা প্রকাশ ও পুরুষের সঙ্গে তাদের সমান বলে মেনে নেওয়ার উচ্চ মানসিকতা বা প্রবৃত্তি বিকশিত হতে পারে নি। বোধ হয় এই কারণেই এক বিশিষ্ট সমাজের নারীদের অধোগতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা যেমন কম বলে মনে হয়, তেমনি তাদের গুরুত্ব মহত্বপূর্ণ অবদানের

সঠিক মূল্য দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি, বরং তাদের অবমূল্যায়ণ হয়েছে। আজকের পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে যেখানে নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করেছে, এখনও সেখানে আদিবাসী ও অন্ত্যজশ্রেণির সমাজে নারীর অসহায় করুণ অবস্থা অন্ধকারের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্যা কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী ঝাড়খণ্ডের অরণ্যাশ্রয়ী ও অরণ্য সংলগ্ন আদিম আদিবাসী সম্প্রদায়ের ও তথাকথিত চুয়াড় চণ্ডাল এবং অন্ত্যজ বা নিম্নজাতির লোকেদের সম্পূর্ণ জীবন চর্যার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তি রচনা করতে গিয়ে পুরুষদের সঙ্গে রমণীদের সামাজিক অস্তিত্ব করণ, আচার-ব্যবহার, সংস্কার-সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যের ভাষায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ও গল্প রচনায়।

মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যাশ্রয়ী সাঁওতাল আদিবাসীদের সংগ্রাম মুখর বিপর্যস্ত জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস 'শালগিরার ডাকে' অনেক নারী চরিত্রের ভিড় জমেছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা পাই সোমীকে। এই সোমী গ্রাম প্রধান সুন্দ্রা মাঝির (মুর্মুর) স্ত্রী এবং প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা শহিদ বাবা তিলকা মাঝির 'মা'। সুন্দ্রার বউ সোমীর গ্রাম-সমাজে যথেষ্ট সম্মান ছিল। খাতিরদারীও ছিল। পুরুষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দারুণ উৎসাহের সঙ্গে সে কাজ কর্ম করত। সাঁওতাল সমাজের রীতি-রেওয়াজ অনুসারে এক গ্রাম প্রধানের স্ত্রীর যেমন মান-সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া উচিত সোমীকে তা দেওয়া হত। তিলকার জন্ম হওয়ার সময় তার সেবা শুশ্রূষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে তার আঁতুড় ঘরের কাছে গ্রামের অধিকাংশ নারীরা এসে উপস্থিত হয়ে সারা রাত জেগেছিল । সোমী গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা পেত। পাহাড়িয়া বা সাঁওতালরা যা কিছু দেওয়ার থাকত, তা সোমীর হাতেই এনে তুলে দিত। আবার কিছু দেওয়ার থাকলে সোমীর হাত দিয়েই তা দেওয়া হত। সোমীর নির্দেশ মতোই সংসারের অন্যান্য সব কাজ কর্মও চলত। এ থেকে বোঝা যায় সাঁওতাল সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল যথেষ্ট। কিছু কিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও তাদের হেয় করা হয়নি। সুন্দ্রা মুর্মুর মা তিলকা মাঝির গড়াম আই মাঝি সমাজে তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তাঁর কাছে সবাই এসে উপস্থিত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। বয়োবৃদ্ধা হিসেবে পরিবারে তাঁর ছিল যথেষ্ট সম্মান। পরিবারে তার আদেশ কেউ অমান্য করতে পারত না। গৃহস্থের সবরকম কাজকর্মে তিনি হাত বাড়াতেন, নাতি তিলকা মাঝিকে নিয়ে তাঁর কত স্বপ্ন। তিনি তাকে তাদের পূর্বজদের কাহিনী শুনিয়েছেন, আদিবাসীদের বিপর্যস্ত জীবনের কথা বলেছেন, আরও বলেছেন সাঁওতাল আদিবাসীদের পুজো পার্বণের কথা। সভ্য সমাজের আর সব ঠাকুরমারই মতো সাঁওতাল আদিবাসীদের সমাজে বয়োবৃদ্ধ ঠাকুরমাদের মর্যাদা দেওয়া হত। এখনও সেই পরম্পরা আদিবাসী সমাজে বহুল প্রচলিত। এই সময়ের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীদেরও যে সমাজ-সংসারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, সে কথা উল্লেখ করে কথাশিল্পী

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে বলেছেন—

''বর্গীর ভয়ে পালিয়ে এসেছিল, ওরা ডোম। ওই গাজ পারের টিলিতে আছে। বাঁশ চিরে চিরে ডালা, কুলা, চুবড়ি, চেটাই বুনে কি রকম খুব ভালো সমাজটা। আমাদের মত মেয়ে মরদে কাজ, আমাদের মত শুয়োর, মুরগি পোষা, মরদরা আমাদের মত শিকার করে, লড়তে পারে।''

এর থেকে বোঝা যায় সাঁওতাল সমাজ যেমন নারী-পুরুষ মিলে অনেককাজ এক সাথে করে, তেমনি অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজেও নরনারীও এক সাথে মিলে কাজ করে। দিনমণি কামার এবং রতন মনি কামারের বউও যে তাদের স্বামীদের সঙ্গে তাদের পেশাগত কাজে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে, তারও উল্লেখ আছে এই উপন্যাসে। সাঁওতাল আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের সমাজে নারীরা পুরুষদের পরিপূরক তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। লেখিকা তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে আদিবাসীদের সমাজে নারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

''তোমার অপু শিকার করে আনে হরিণ, বুনোবরা, পাখি। তুমি অবাক হয়ে দেখ। তোমার মা-বাবা, দিদিরা চলে যায় ক্ষেতে। গড়ম্ আয়ু তোমার ঠাকুরমা পরিচর্যা করে মোষ গরর। তোমার মেজদিদি তালাদাই যায় গরু চরাতে। তোমার গড়ম্ আয়ু রাঁধে ফেন ভাত, খরগোশ শিকে গেঁথে ঝলসায়। তুমি খাও নুন মরিচে।''

ঘর গৃহস্থালী এমনকি কৃষিকার্যেও হাত বাড়ায় সাঁওতাল সমাজের মহিলারা। তারা আবার নানা কাজে পুরুষদের প্রোৎসাহিত করে এবং পুজো পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানে নাচ গানে সব কিছুতেই তারা এক সাথ হয়। সাঁওতাল নারীরা সন্তানবতী হলে বা ছেলে-মেয়ে প্রসব করলে তাদের প্রতি ঘর-গৃহস্থ-সমাজ সবাই যত্নশীল থাকে, তাদের শরীর স্বাস্থ্যের উপর পুরুষ ও মহিলা উভয়ের নজর থাকে। সাঁওতাল সমাজের মহিলারই বেশিরভাগ হাট বাজার করে থাকে, আর ঘর সংসারের গুছানোর দায় দায়িত্বও তাদেরই। সাঁওতাল এবং আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের পরিবার ও সমাজে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। মহাশ্বেতা দেবী তারও একটি বর্ণনা প্রস্তুত করেছেন 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে—

''নরনারী, মোষ ছাগল, বিচিত্র সে সব নীরব মিছিল ক্রমে মিলিয়ে যায় বনের সবুজ ঘন বাতাসে পাতা ঝরা উদাস ছায়ায়। তিলকা সমানে চলে। সাঁওতাল সমাজের এক অংশকে বয়ে নিয়ে চলে। স্থির লক্ষ্য। তার মাথার উপর আদি জননী। আদিম রাজহংসীর ডানার সাঁই সাঁই শব্দ। একা তিলকা শোনে আর কেউ শোনে না।''

মেয়েদের ধর্ম ও চরিত্র বা সতীত্ব নিয়ে সাঁওতাল পুরুষেরা অত্যন্ত সচেতন। মেয়েদের উপর কোনো অত্যাচার বা ব্যভিচার তারা সহ্য করতে পারে না। মেয়েদের মর্যাদা বজায় রাখতে তারা লড়াই করতেও প্রস্তুত থাকে। বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহের সময়

পুরুষদের মতো নারীরাও স্ত্রী স্বামীকে, বোন ভাইকে, মা মেয়েকে, শালগাছের ছালের রাখী বেঁধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে প্রোৎসাহিত করে। সংকট কালে নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য সাঁওতাল ও আদিবাসী পাহাড়িয়া অত্যন্ত তৎপর হয়েছিল। লেখিকা তাঁর 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসে এর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

''মনসার বাবা পাহাড়িয়া সর্দার নেমে এল এই সংকট কালে। সোমীকে বলল, জননী গো আমার ঘরে চল। বউ নাতি নাতনী নিয়ে চল। গ্রামের সকল মেয়ে শিশু নিয়ে চল মা। মেয়েদের ধরম কোম্পানি রাখে না।"

আবার দেখা গেছে রাজা বাবুর মতো সম্পদ ও ক্ষমতালোভী মানুষদের ছল চাতুরীতে পড়ে হিংসা ও রাজনীতি তথা সমাজের কুসংস্কারের শিকার হয়েছে অনেক গরীব আদিবাসী নারী। 'শালগিরার ডাকে' উপন্যাসের রজনীর মা মনি, লখিন্দরের স্ত্রী গোপালী ডাইনি, তাদের উপর জরিমানা ও শাস্তির ব্যবস্থা, মনির কন্যা রজনীকে স্বামীর ঘর ছাড়া করা, আর প্রতিবাদ করতে গিযে পার্বণী ও বিলাতী দাসীকে মার খেতে হয়েছে। এই ডাইনি প্রথার কুসংস্কার এখনও আদিবাসী সমাজের নারীকে অত্যাচারের শিকার করে রেখেছে। আবার বৃদ্ধা মহনীকে 'সিধু কানু' বিদ্রোহ বা সাঁওতাল ক্রান্তির জননী রূপে চিহ্নিত করে, তার মহত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। সাঁওতাল আদিবাসী রমণীরা যে অসামান্য হতে পারে মহনি তার মধ্যে অন্যতমা। সে সাঁওতাল সমাজে নারীদের ঐক্যসূত্রে বাঁধতে চেয়েছে পাতালের মাধ্যমে, আবার প্রতিবাদ মুখর হয়েছে দিকু মহাজনদের অন্যায় অত্যাচার, শাসন শোষণের বিরুদ্ধে এবং বিদ্রোহের জন্য সিধু কানু চাঁদ ভৈরবকে উস্কে দিয়ে তাদের হাতে থামিয়ে দিয়েছেন বিদ্রোহের কামান। এই মহনির আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ভগনাডির চুনার মুর্মুর স্ত্রী, সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব এই চার বীর পুত্রের জননীও সাঁওতাল বিদ্রোহকে প্রোৎসাহিত করেছিল। সিধুর মা বলেছিল—

''দামিন জুড়ে আমি লক্ষ ছেলের মা, আমার বেটা কি শুধু সিধু কানু চাঁদ ভৈরব? লক্ষ ছেলের মা হই আমি। তারা এর শোধ নিবে।"

সিধুর মা ধর্ম বিশ্বাসী, তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল সিধু কানুরা হুলে বিজয়ী হবে। তিনি বলেছিলেন—

''চারটে ছেলে হুলের কাজে দিলাম, আমার সিধু কানু হাতে হুলের আগুন জ্বলল, তাপর যদি মরে তো মরব। তার একটা কোন দিন ঠিক।"

তাঁর মধ্যে মাতৃত্বের ভাবনাও প্রবল। ছেলেদের মুখে মা ডাক শোনার জন্য যেমন আগ্রহ, আবার তেমনি তাদের মহুল পিঠে, মহুলের মোয়া খাওয়ানোর জন্য আগ্রহ, সমস্ত সাঁওতাল বিদ্রোহী হড় পনের মা হওয়ার গর্ব তাঁর মধ্যে। সমস্ত সাঁওতাল সমাজ, এমন কি অন্যান্য জাতির লোকেরাও তাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে। সাঁওতাল সমাজে মায়েদের স্থান যে কত উচ্চে, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'সিধু কানুর ডাকে' উপন্যাসে তার পরিচয়

দিয়েছেন। এই উপন্যাসের 'ঘন্টা বাজে' গল্পাংশে লেখিকা সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের স্থান, স্থিতি, গতি, প্রকৃতি ও আচার-আচরণের বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। লেখিকা রতন সিংহের মেয়ে পার্বণী, যুবতী দুর্গামণি, বুড়ি ভগবানী, রায় দাসী ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এরা অন্যায়-অত্যাচার-কদাচার এবং নিজেদের সতীত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করতে একজোট হয়েছে। তারা নয়ন ভূঞার মতো কলুষ-চরিত্রহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত খামারে ও গোয়াল ঘরে কাজে ইস্তফা দিতে চেয়েছে। লেখিকা লিখেছেন—

''এ সভায় ফল নানামুখী। যুবতী দুর্গামনীর বদলে কল্লা বুড়ি ভগবানী রায় দাসী নথর গোহালে গরু তুলে দিয়ে যায় ও বানিয়ে বলে যায়। সে আর এ সব নিগো বাবু। হয় শউর বাড়ি হতে বউ নে এস, নয় শুক্যে মর কেন? মোরা মিটন করেছি। মোদের বিটিরা আর বাবুদের রঁড় হবে না।''

সাঁওতাল আদিবাসী ও মুন্ডাদের সমাজে কন্যাপাত্রী বা মেয়েদের স্থান ছেলেদের চেয়েও মহত্বপূর্ণ। মেয়েদের বিবাহ করার জন্য পাত্র বা ছেলের পক্ষ থেকে পণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। লেখিকা তাঁর এই উপন্যাসের উক্ত গল্পাংশটিতে লিখেছেন—

''মুন্ডা সমাজে গিড়ার ঠিক হয় কন্যা পণ সর্বাধিক বারো টাকা, সামান্য দুই টাকা, আতোয়ার তিন টাকা, জিয়া শড়ি ১টি, শ্যালক বরণের ধুতি ১টি,সমাজ শাড়ি জাম এই মবলগ খরচ হবে। পাত্র বা পাত্রী দেখতে তিন থেকে পাঁচ জনের বেশি লোক যাবে না। বিধবা মেয়ের ক্ষেত্রে পণ ছয় টাকা। দোজবরের বেলা অনুঢ়া কন্যা পণ আঠারো টাকা।''

অন্য সমাজে ঠিক বিপরীত। মেয়েদের বিয়ের জন্য ছেলেদের পণ দিতে হয়। মুন্ডা যুবতী পার্বণী ও বুড়ি ভগবানী রায় দাসী বিরহা বা জঙ্গলের সব কিছুর সঙ্গে আপনত্ব করে নিয়েছে। তারা জঙ্গলকে জানে, জঙ্গলের সব কিছু অর্থাৎ ফল, মূল, লতা-পাতাকে চেনে। বনের চার জাতের কন্দ সংগ্রহ করে। এ সব খাদ্যের শিক্ষা তাদের বহু পুরাতন। পার্বণী সহজ সরল স্বভাবের মুন্ডা যুবতী। তাদের সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার কোনো আগ্রহ নেই। সে কথা সে স্বীকার করে আর বন-জঙ্গলের কাজেই সে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। বৃদ্ধা ভগবানী, সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। সে সব খবরই রাখে। নকশালী রাজবন্দীদের নিয়ে তার অনেক চিন্তা। বিরহা গ্রাম ও জঙ্গলের সুরক্ষার প্রতিরোধে পার্বণী ও ভগবানী শহীদ হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে সাঁওতাল এবং মুন্ডাদের সমাজে নারীদের অস্তিত্ব ও ভূমিকা কত মহত্বপূর্ণ। লেখিকা তাদের সম্বন্ধে বলছেন—

''—পার্বণী অত্যন্ত জেদি ও তেজালো মেয়ে, ভগবানী এক লড়াকু বুড়ি। রবি, বরুণ ও রাজীব এর আগে সংগঠন করেছে, বিরহা অতীব সম্ভাবনাপূর্ণ জায়গা বলেই তাদের আসা। কিন্তু দেখা হয়নি ঘোলা চোখে গ্রাম জীবন। এখন ওরা দেখত। ভগবানী সাদা চুলো, পার্বণী মুন্ডা মেয়ে— নব যুবতী। ওরা খন্তা নিয়ে বনে ঘুরে ঘুরে তুলত

ঝুড়ি ঝুড়ি তুঙা, চুণ, পান, চুরকা, চার জাতের কন্দ— যা ওদের কাছে চার জাতের আলু। এসব খাবার শিক্ষা ওদের সুপ্রাচীন।"

দুর্গামণির মতো আদিবাসী রমণীরা মুর্খ হলেও সুচতুর এবং বুদ্ধিমতী। তাই তারা বিজিত দত্ত ও প্রভাস ভূঞার মতো শয়তানদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখতো। লেখিকার ভাষায় সে সুবলকে জানিয়েছিল—

''উডেকয়া চৈবাতি লিয়ে চোরের মত সুপ করে যেয়ে পুলিশ সাহেব তার ঘরে সাঁজালো। সাহেবটা বলল, আজ এত দেরি কেনে?— উ বলল, লোক ছিল, আসতে পারি নাই। মানে বুঝলি কথাটার উনি এমুন নিত্য আসে, আজ দেরি হচ্ছে।"

দুর্গামণি লোকটিকে শুধু পুলিশের ঘরে ঢুকতে দেখেই খান্ত হয় নি। বরং তার গোপনীয় কথাবার্তা জানারও চেষ্টা করেছে। এখানে লেখিকা সাঁওতাল নারীর বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। আদিবাসী মুন্ডা সমাজে পুরুষদের মতো নারীদের স্বেচ্ছা বিচরণ, স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তা এবং বিচারের অভিব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল যথেষ্ট। পুরুষদের সকল রকমেই যে তার সফল সহায়ক, সিদ্ধহস্ত তার বাস্তব দৃষ্টান্ত রূপে 'সিধু কানুর ডাকে' উপন্যাসে লেখিকা 'ঘন্টা বাজে' কাহিনী অংশের সুবল ও পার্বণীর কথোপকথনের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লেখিকা দেখিয়েছেন, অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা আদিবাসী সাঁওতাল ও মুন্ডাদের সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকা মহত্বপূর্ণ।

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর শবর জাতির জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা 'ব্যাধখণ্ড' শীর্ষক উপন্যাসেও আদিবাসী শবর জাতির সমাজে নারীদের স্থান কীরূপ ছিল তার একটি বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য প্রস্তুত করেছেন। লেখিকা 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি রচনা করেছেন কবি কঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' (চণ্ডীমঙ্গল) কাব্য অবলম্বনে। ষোড়শ শতাব্দীর আদিবাসী নারীর জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্য দিয়ে নারী জীবন প্রসঙ্গটি 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে বিধৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীও ব্যাধ জীবন কাহিনীর চর্চা প্রসঙ্গে অরণ্যজীবী শবর জাতির জীবন ইতিহাস প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সমাজে নারীদের অস্তিত্বের কথা তুলে ধরেছেন। লেখিকা জানিয়েছেন, শবর জাতির মেয়েদের সমাজে অনেক কদর। মেয়েদের বিয়ের জন্য ছেলের বাবাকে অনেক সাধতে হয় কন্যাপণ দিতে হয়। তাদের রীতি রেওয়াজ অনুসারে মেয়ের বাপকে যার যেমন ক্ষমতা, সেই হিসেবে হরিণ-চামড়া, বন-রস প্রভৃতি দিতে হয়। মেঘা শবরের পুত্র অর্থাৎ কালকেতু নামক ব্যাধ ফুল্লরা নাম্নী ব্যাধিনী অর্থাৎ শবর কন্যাকে বিবাহ করার জন্য সামাজিক প্রথা অনুসারে উক্ত কন্যাপণ দিতে হয়েছিল। কালকেতু ও ফুল্লরার দৈনন্দিন জীবনচর্যা, খোলাখুলি ভাবে মেলামেশা, পরস্পরের কাজ কর্মে সহযোগিতা আবার কালকেতুর মা বৃদ্ধা শবরী তেজার আচার-আচরণের মাধ্যমে অরণ্যাশ্রয়ী আদিবাসী শবর জাতির সমাজে নারীদের মর্যাদা যে কত অধিক, তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে—

''তেজটা সব জানে। সমাজে তার কথা কাটবার কেউ নেই। তাকে সবাই সম্মান করে। তাঁর ইচ্ছা ব্যাতিরেকে মা অভয়া বা চণ্ডীর স্থান পরিবর্তন সম্ভব নয়। তেজটার বিয়েতে মেঘার বাবাকে তেজটা নেবার জন্য দশটা হরিণ, বিশটা হাতির চাম, দশটা বাঘের চাম, বাঘ নখ, পাঁচটা হাতির দাঁত দিতে হয়েছিল।''

ফুল্লরার জীবনের বারমাসের কাহিনীর মধ্যে শবর জাতির নারীর জীবনের সুখ-দুঃখ, উৎসব-অনুষ্ঠান, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, আচার-ব্যবহার ও নারী সংস্কৃতির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। তেজটার আচার-আচরণের মাধ্যমে আমরা শবর জাতির নারীদের গৃহিণীপণার পরিচয়টিও আবিষ্কার করতে পারি। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ব্যাধ খণ্ড' শীর্ষক উপনাসের পঞ্চম অধ্যায়ে বলেছেন—

''শবর সমাজে মেয়ে মরদে খাটে—পেটে খায়। যেখানে মন বসে সেখানে বিয়ে করে। বিয়ে করে একটি আলাদা ঘর তোলে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া বিবাদ হলে বর বউকে পিটায়। বউও দুঘা দেয়। আর, আমনত হয় যে এ-ওকে ছেড়েছিল। তখন মেয়ে মরদ দু-জনেই পূর্ণবিবাহ করতে পারে। তেমন সমাজ নয় যে বউ পড়ে পড়ে খাবে।''

শবর জাতির মেয়েরাও যে পুরুষদের সঙ্গে বাইরের কাজকর্মে হাত বাড়িয়ে দেয়, আবার ঘর গৃহস্থের রান্নাবান্নার কাজেও সামাল দেয় লেখিকা ফুল্লরার সমস্ত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তার উল্লেখ করেছেন। জঙ্গলের অধিকার সম্পর্ককে শবর জাতির নারীরা যে কত সচেতন তারও পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা শবর জননী তেজটার কথাবার্তার মাধ্যমে। এভাবে আমরা সাম্প্রতিককালের ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস 'ব্যাধখণ্ডে'র মাধ্যমে ব্যাধ বা শবর জাতির বিষয়ে জানার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজে নারীর কী রূপ স্থান, সে বিষয়টিও সহজে অবগত হতে পারি।

মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি উপন্যাসের নাম নেওয়া যেতে পারে, সেটি হল 'আঁধার মানিক'। ষাটের দশকের যে কয়টি লেখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত, সেগুলির মধ্যে 'আঁধার মানিক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাষায়- ''আঁধার মানিক'' উপন্যাসটিও মূলত গণবৃত্তির ইতিহাসের দলিলীকরণ''। উপন্যাসটিতে তিনি সমস্ত কুৎসিত সমাজ-বিশ্বাস ও প্রথা জড়িত বাংলার সমাজের অন্ধকারের বহু বিচিত্রময় ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। জঙ্গল এলাকার আদিবাসী, জনজাতি ও অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের দীর্ঘকালীন বিদ্রোহের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ঐ সমাজের মেয়েদের সামাজিক জীবনের পরিচয়ও প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'আঁধার মানিকে' বর্ণশাসিত সমাজে সমাজের উপরিতলের অর্থাৎ উচ্চবর্ণের সমাজের নারীদের উপর ছিল এক সামাজিক বন্ধন। স্বেচ্ছাচারিতা বলে তাদের কোন কিছু স্বাধীন ইচ্ছা বা প্রকৃতিকে মেনে নেওয়া সামাজিক নিয়মের বিচারে সম্ভব ছিল না। সমাজে গৃহবধূ রূপে তাদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে এই উচ্চবর্ণের সমাজের নারীদের কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে, বা

সমাজের অন্যায় শাসন বা বিচারের রায়কে মেনে না নিলে তাকে জেদ বলে ধরে নেওয়া হতো। আবার স্বেচ্ছাচার করলে তা ছিল ঘোরতর অপরাধ। বিনা কারণেই অথবা সামান্য কিছু আচরণের ভুলের জন্য তাদের কলঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল অনেক বেশী। 'আঁধার মানিক' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী আনন্দীরামের প্রথমা পত্নী 'ফুলেশ্বরীর' আচার আচরণ ও তার মনের ভাবনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে একথাই প্রকাশ করেছেন। উচ্চবর্ণের সমাজে শাশুড়ী বা সেই শ্রেণীর মেয়ে মানুষদের যে বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং পরিবারে তাদের শাসন চলত, তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখিকা বিশালাক্ষী চরিত্রটির উপস্থাপন করেছেন। উচ্চবর্ণের সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা যে কনিষ্ঠদের উপর শাসন চালাতো, তারও জ্বলন্ত উদাহারণ স্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'আঁধার মানিক' উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে পাতানি পিসির মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন—

''তোরা মানুষ নস্ এরচে' বাগদীদের মানুষ বলি, তারা ঘরের বউ ঝির ধর্ম রাখলে তবু।"

—এই উক্তিটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজের পুরুষেরা নারীদের হেয় অবহেলা করত না। তাদের সমাজে মেয়ে মানুষদের নগণ্য বলে মনে করা হতো না। এমনকি অপদার্থ ও অকর্মন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রী অর্থাৎ মেয়ে মানুষদের ভয়ও করত। দাম্পত্য কলহের ভয়ে তারা নেশা খেয়ে বাইরে পড়ে থাকতো তেমন পরিচয় আছে লেখিকার এই উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদে তিনি লিখছেন—

''তবু তাদের মেয়েরা পর ভরসায় বসে থাকে না। মাঠে মাঠে গোবর কুড়োর, ঘাস কাটে, খালে বিলে মাছ ধরে, ঝুড়ি শুকনো কাঠ নিয়ে গেরস্ত বাড়িতে ঢোকে পাছ দুয়োর দিয়ে।"

অর্থাৎ এই অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজের মেয়ে মানুষদের সংসার জীবনে মহত্ব যে পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, তারা যে কত কর্ম করতো এবং সংসার বা পারিবারিক জীবনে তাদের প্রয়োজনীয়তা যে কত লেখিকা সে কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই শ্রেণির সমাজের মেয়ে মানুষদের অন্য সমাজে বউ-ঝিদের কাছে কত কদর সে প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন—

''বাগদিনীদের দেখলে সব বউ-ঝিরা আদর করে ডেকে নেয়। ওদের কাঠের ঝুড়ির নীচে কাপড়ের পোটলায় বাঁধা অপার আশ্চর্যের ভাণ্ডার। সতীন এবং সতীনের ছেলে, এই দুই কাঁটার বিষে অনেকেরই জীবন জরজর। সতীনকে হীনবল করবার ওষুধ, স্বামীকে বশীকরণ করবার মন্ত্র, বন্ধ্যার সন্তান হবার ওষুধ, এমন কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী দামী যে জিনিস সবার আগে দাম হারায়, সেই চঞ্চল, পলাতক রূপ যৌবনকে অক্ষয় রাখবার মন্ত্রপূত কবচ পর্যন্ত।"

এই অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা যে তথাকথিত অধিক সভ্য এবং উচ্চ জাতির নারীদের চেয়েও অধিক জ্ঞানী-গুণী ছিল এবং সেই কারণেই উচ্চ জাতির সমাজের নারী এমন

কি পুরুষদের কাছেও তাদের ছিল অনেক বেশি মহত্ব, লেখিকা সে কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

''নিজেদের ভাত কাপড়টা হাট মাঠ বন বাদাড় থেকে উপার্জন করে নেয়, তার কারণ এদের জাতের মেয়ে পুরুষ বড় স্বাধীনতা প্রিয়। খুব একটা আঁট-সাঁট সইতে পারে না। তা বলে স্বাধীনতা অপব্যবহারও এ জাতের পুরুষেরা সয় না।''

অর্থাৎ এই জাতির মেয়েরা নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা প্রেমী। এরা বিশেষ কোনো বাঁধনে বাঁধা থাকতে চায় না। পুরুষদের মতোই এরা সমাজে সমান অধিকার পেতে চায় এবং স্বনির্ভর হয়ে থাকতে চায়। তবে এদের সমাজও পুরুষ শাসিত, তাই এদের জাতের পুরুষেরা নারীদের অধিক স্বাধীনতা বরদাস্ত করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীতে যেমন তাদের মেল, বিলাপ, তেমনি আবার ঝগড়া ঝাঁটি। রামাই বাগদীর স্ত্রী পরি তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাছাড়া এদের মধ্যে পাতনি পিসির মতো সৎ-সাহসী রমণীর দেখা পাই, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জানতো। পাতানি পিসি এক অসামান্যা নারী। তাকে প্রশ্ন তুলতেও দেখি। জরুরী পঞ্চায়েতে পাতানি পিসি বলেন—

''পাঁচমাথা এক ঠাঁই হয়েছে, এখন শুধোই আমরা মেয়ে ছেলে দশহতে কাছা নেই, তা তোমরা তো সবাই ছিলে, এত বড় একটা চেরেকার কান্ড ঘটে গেল আগে পারিনি।''

—এখানে তাদের সমাজে নারীর দশার পরিচয়টিও বিধৃত হয়েছে। পাখমারা জাতির নারীরা আবার দুঃসাহসী কম নয়, তারাও অনেক টুকিটাকি জানে। তাদের সমাজেও আবার ডান ডাইনির বিশ্বাস আছে। পাখমারা জাতির এক বুড়ি এবং তার নারী দলবল নিয়ে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর সঙ্গে কথোপকথনের বিষয় তুলে ধরে ঐ জাতির মেয়ে মানুষদের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লেখিকা প্রসঙ্গেক্রমে কুলীন জাতির নারীদের সামাজিক এবং পারিবারিক দুর্গতির চিত্রটিও তুলে ধরেছেন তাঁর 'আঁধার মানিক' উপন্যাসে। আবার এমন দুর্গতির নানান পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে নিম্নবর্গের সমাজের নারীদেরও।

মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসেও বাংলার অরণ্যাশ্রয়ী রাঢ় বাংলার আদিবাসী চুয়াড় সমাজের নারী বা মেয়ে মানুষদের সামাজিক অবস্থার পরিচয়টি তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে ষোড়শ শতকে মধ্যযুগের রাঢ় বাংলার এক অরণ্য-যুবকের কবি খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবাধ্য বাসনার চরম পরিণতির ঘটনা হৃদয় বিদারক হয়ে চিত্রিত হয়েছে। এই চুয়াড় যুবকের জীবন ও মৃত্যুর মর্মন্তুদ কাহিনী লিখতে গিয়ে ঐ সমাজের পুরুষদের সঙ্গে নারীদের জীবনবোধ ও অস্তিত্বেরও কিছু সংকেত প্রদান করেছেন লেখিকা। যে অঞ্চলের কথা নিয়ে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাস রচিত, সেই অঞ্চল কলিঙ্গ সীমান্ত মেদিনীপুর। এই মেদনীপুর হল বিচিত্র আদিবাসী সম্প্রদায়, অরণ্যজীবী অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ তথা লোকসংস্কৃতির জন্ম ও

ধাত্রীভূমি। লেখিকা তাঁর উপন্যাসের শুরুতেই গোলক শুঁড়ি ও মাতঙ্গীর প্রসঙ্গটি তুলে ধরে ঐ সমাজের দুই শ্রেণির নারীর সামাজিক অস্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সংকেত দিয়েছেন। এই সময় তাদের সমাজে এক জাতের নারী ছিল, যারা গণিকা অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে দিন কাটাতো। যত দিন তাদের দেহে রূপ যৌবন থাকতো ততদিনই তাদের কদর। রূপ যৌবন শেষ হলে বৃদ্ধা অবস্থায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যৌবন লালসী পুরুষেরা তাদের চোষা আমের আঁঠির মতো দূরে সরিয়ে দিত। শুধু গণিকাদের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য ছিল তা নয়, এমনকি সংসারী স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেও অনেকটা সেই একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যে মাতঙ্গী এক দিন তার যৌবনের রূপ সৌন্দর্যের জন্য গোলক শুঁড়ির ভাগিখানার শ্রী বৃদ্ধি করত, যৌবন চলে যাওয়ার পর তার দশা সম্পর্কে লেখিকা লিখেছেন—

''কেননা, মাতঙ্গীর এখন সে বয়স নেই যে বয়সে স্ত্রীলোকের শরীরের সাধ আহ্লাদের সময় ফুরোয় এবং এখন থেকেই মেয়েদের দেহ ক্রমে মাটি হতে থাকে। এ সময়ে স্ত্রীলোক মাত্রেই অনুভব করে স্বামী বল, পুত্র বল, প্রণয়ী বল, পুরুষজাত তাকে ঠকিয়েছে। কেন ঠকিয়েছে কিভাবে পাওনা ফাঁকি দিয়েছে তা সম্যক বোঝে না এবং মেয়েরা কটুভাষী হয়ে ওঠে, পুরুষদের কথায় কথায় আরে আমার পুরুষরে মাগের অধম, বলে মনে আঘাত করে। এ বয়সে এমন মনে বিকার সংসারী স্ত্রীলোকেরও হয়, মাতঙ্গী তো কোন ছার।''

এর দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, এই সমাজের মেয়ে মানুষদের কদর বা ইজ্জৎ অনেকটা নির্ভরশীল ছিল যৌবনের উচ্ছলতা ও দেহসৌন্দর্যের উপর। গোলক শুঁড়ির পিতামহ ও সিধু হাড়িনী যুবতীর প্রেমাশক্ত হয়েছিলেন। তার দৃষ্টিতে ''যুবতীর দেহটি সুরা-পাত্র, যুবতীর যৌবনটি মহুয়ার কাথ বিশেষ।'' গোলক শুঁড়ির একমাত্র পুত্র বারবণিতার চক্করে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। এসব বারবনিতা বা বেশ্যাবৃত্তির নারীরা অত্যন্ত ঈর্ষা কাতরও ছিল। দেহ বিক্রিই ছিল ঐ জাতীয় নারীদের প্রধান জীবিকা। পুরুষদের দেখে অঙ্গ প্রদর্শন করায় তাদের কোনো লজ্জাবোধ ছিলনা। অন্যদিকে ঐ একসময়ে অরণ্যশ্রয়ী আদিবাসী শবর জাতির মধ্যে নারীদের পুরুষদের মতো সমান অধিকার ছিল। সমাজে তাদের যথেষ্ট কদর ছিল। পুরুষেরা তাদের ভালোবাসত। মেয়েরা বিপথগামী হলে তাদের সংসারে হা-হাকার উঠত। শবরজাতির লোকেরা মেয়ে মানুষদের শ্রদ্ধা করত এবং মাতৃশক্তির উপাসকও ছিল। তারা নরনারীর প্রেমের স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নদ-নদীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত করত। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসের প্রারম্ভিক অধ্যায়েই তার বর্ণনা পাওয়া যায়—

''কিন্তু রূপনরায়ণ, গত কয়েক শতকে খাত পরিবর্তন করলেও এখনত বেশ কিছু দিন স্থির, একই পথে ভাগীরথীর দিকে নিরন্তর ধাবমান। নদটি ক্ষেপা ঠাকুর পারাগ, তাইত শিলাই নদী উনিকে বিভাব সলেননা, দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মিলে ধাউয়া ধায় চুলে

যে উলেন, তা থেকেই রূপনারায়ণ উ-দের গ্রাস করে নিলেন।' নদনদীর পূর্বরাগ ও বিয়ের এ আশ্চর্য উপাখ্যান ভীমাদলের শবর জাতি এখনও চণ্ডী পূজার শারদ রাতে গল্প করে থাকে।"

লেখিকা কাহিনী বিস্তারের প্রসঙ্গক্রমে বেদে জাতির যুবতী রমণীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসঙ্গটিও তুলে ধরেছেন। বাদিয়া যুবতীর তীর স্পন্দন ও নাচ দেখার সময় বুকের আঁচল খুলে তাদের সুউচ্চ বক্ষস্থলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন জয় করার চেষ্টা করে। তাদের উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবনের ছবিটি তুলে ধরতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন—

'এ বাদিয়ানীদের জন্ম বুঝি কোন উচ্ছৃঙ্খল নক্ষত্রের মিথুন ক্ষণে, কেননা যত দিন না মাটিতে মাটি হয়, ততদিনই তারা মাংসের দেহটি বেচে আর বেচে। সংসারের পাপ অঙ্গে ধরিগ' বিধাতা সেই বুলেই আমাদের সিজেচেন"।

লেখিকা অন্ত্যজ জাতির নারীদের সমাজে যে কোনো মহত্ব নেই, তাদেরও যে সামান্য পণ্য সামগ্রীর মতোই হাটে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, সেই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ভীমাদলের মুন্ডাঘাটে প্রতি তিন মাস অন্তর বান্দাহাট বসে। সেখানে অন্ত্যজ জাতির শত সহস্র দাস বিক্রি হয়।"

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন চুয়াড় চন্ডালদের মতো এক বিশেষ শ্রেণির চণ্ডালদের সমাজে নারীরাই সংসার চালানোর ভাগিদারী। আবার তাদের সমাজের পুরুষ স্ত্রী উভয়ই বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহের উপায় খুঁজে বেড়ায়। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন—

"এই চূড়ন আর তার স্বজাতীয়রা যারা কারাগারের রক্ষী হয়, তারা এক বিশেষ শ্রেণির চণ্ডাল। এদের পুরুষেরা জায়াজীবী অনেক সময়ই বউয়ের রোজগার খায়।"

ফুল্লরার জীবনের কারুণ্য প্রসঙ্গে এবং বেনে জাতির মেয়েদের দুঃখ কষ্টের কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি তাঁর এই উপন্যাসে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যযুগের রাঢ় বাংলার উচ্চ ও নিম্নবর্ণের নারীদের অবস্থা ও সামাজিক অস্তিত্বের ছবিটি অঙ্কন করেছেন। লেখিকা 'বন্দঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসের ছয় অধ্যায়ের লিখেছেন—

"...সুলভার মুখে শুধু কুমার, কুমার কুমার। তখন রাজা সুলভাকে অন্ধকার পাতালে বন্দিনী করলেন। ফুল্লরার কবিকে প্রেম করতে গিয়ে চরম দুর্দশা।"

লেখিকা সাত অধ্যায়ে লিখেছেন— "গর্গরাজা তখন বললেন, মাধবের কন্যা যদি এখনো ক্ষয় ক্ষতি চাহে তঙে বোলুক কেনে উয়াকে কানি পরায়্যে লাওয়ে ভাসায়ে দিব।" সুলভার যেমন কুমারের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে চরম সর্বনাশ হয়েছিল সেই সর্বনাশ ঘটেছে ফুল্লরার জীবনেও।

বাংলার প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যাশ্রয়ী আদিবাসী সাঁওতাল ও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জনজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার', 'বীরসা মুন্ডা', 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর', 'যে যুদ্ধ থামল না' প্রভৃতিতেও আদিবাসী পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে

মহিলাদের জীবন কথাও চিত্রিত হয়েছে। লেখিকা তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আদিবাসীদের অরণ্য বিষয়ে তীব্র অধিকারবোধ এবং সেই অধিকার রক্ষার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম মুখরতার আলো ছায়ায় আমরা তাদের যে সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হই, তার মধ্যে আদিবাসী রমণীদের সামাজিক জীবন চর্চার সঙ্গেও পরিচিত হতে পারি। এই উপন্যাসে লেখিকা দেখিয়েছেন আদিবাসী মুন্ডা সমাজে মহিলাদেরও পুরুষদের মতোই স্বতন্ত্র বিচারের অধিকার রয়েছে। তারা পুরুষদের সঙ্গে সমান সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে চলে। মুন্ডাদের সমাজে মায়েদের খুব সম্মান। বীরসা মুন্ডার করমির কথা প্রসঙ্গে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে—

''করমির মায়ের মন বলল, আট বছরের ছেলেকে আঁচল চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু ও তো শুধু মা নয় মুন্ডারী মা। মুন্ডারী মা জানে, আট বছরের ছেলে গাইচরি করে হোক বা কোনো দিকুর কামারে ঝাট পাট দেবার কাজ করে হোক, পেটের খাটো যোগাড় করে নেয়।"

প্রসঙ্গটি এসেচে বীরসার জেড়তোতে মামার সঙ্গে মাসির বাড়ি কুন্ডীবর তোলি নিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে। এখানে আমরা সুগনা মুন্ডার স্ত্রী বীরসার জননী করমির বিচক্ষণতার সঙ্গেও পরিচিত হই এবং মুন্ডাদের সমাজে মেয়েদের কথার মূল্য কত বেশি তাও জানতে পারা যায়। এই মুন্ডা মায়ের সন্তান বীরসা শুধু মার কাছ থেকে বুক ভরা স্নেহ ভালোবাসাই পায়নি, পেয়েছে অরণ্যের অধিকারের প্রেরণা, দেখেছে বীর যোদ্ধা হওয়ার স্বপ্ন আর নিজের অধিকার, স্বতন্ত্রতা রক্ষা, শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিরল সংগ্রামের অপরিসীম শক্তি। মুন্ডা সমাজের মা বোনেরা পত্নী সবাই মিলে ঘর পারিবারের কাজ কর্ম ছাড়াও নিজের সমাজের মর্যাদা ও অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য পুরুষদের মতোই সব কিছু করেছে এবং প্রয়োজনে তারা বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে ভয় করেনি। লেখিকা তাঁর 'অরণ্যের অকির' এবং 'বিরসা মুন্ডা' উপন্যাসে সেই পরিচয় বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন। মুন্ডা সমাজে নারীর অবহেলিত নয় বরং মর্যাদিত, এই দুটি উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে 'যে যুদ্ধ থামল না' এবং 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' এই উপন্যাস পড়েও তা জানতে পারি।

'বিরসা মুন্ডা' উপন্যাসে ইংরেজ শাসন ও শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা ও অরণ্যের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ঘটেছিল, সৈন্য রাখাবে সেই যুদ্ধে মুন্ডা জাতির মেয়েরা কেবল যে মুন্ডা সৈন্যদের জঙ্গলে গিয়ে খাবার যোগাত তাই নয়, এমন কি অনেক মুন্ডা মেয়ে সৈন রাকাবে থেকে পাথর ছুঁড়ে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কমিশনার ফর্বসের নির্দেশ অবহেলা করে ক্যাপ্টেন রোশ মেয়েদের উপরও গুলি চালিয়ে ছিল আর তার ফলে সরকারী রিপোর্ট অনুসারে তিনজন রমণীও একটি শিশু নিহত হয়। অনেক মেয়ের কাছে

থেকে অনেক হাতিয়ার পাওয়া যায়। 'বিরসা মুন্ডা' শীর্ষক উপন্যাসে এই ঘটনার উল্লেখ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, 'বীরসা মুন্ডার' বিদ্রোহ বা উলগুলান সময়ে মুন্ডা জাতির মহিলারা তাদের সমাজ ও স্বতন্ত্রতা এবং তাদের অধিকার সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিল। সৈন্য রাকাবে বীরসা মুন্ডার শেষ যুদ্ধের সময়ে মুন্ডা রমণী এমন কি শিশুরা পর্যন্ত যুদ্ধ করত পিছপা হয়নি। তারাও স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষদের মতো নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করে। আবার শেঠ, সাহুকার ও মহাজনদের শোষণ, অত্যাচার এবং নোংরামির বিরুদ্ধে যুবতী দুর্গামনি, কল্লাবুড়ি, ভগবানী, রায় দাসী প্রভৃতি যুবতী ও বয়স্কা রমণীরা এক জোট হয়ে তাদের গৃহস্থের কাজ না করার সংকল্প নিয়েছে। তারা বলেছে— ''মোরা মিটিন করেছি। মোদের বিটিয়া আর বাবুদের রাঁড় হবে না।" অর্থাৎ তারা অভাবী হলেও আর কোনো সামাজিক অন্যায় অত্যাচার এবং শোষণকে সমর্থন করবে না। তারা তাদের সমাজ ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। মুন্ডা সমাজের বয়স্ক রমণীরা আবার হাটে যাওয়ার সময় ইংরেজ পুলিশ ও মিলিটারিদের গতি বিধির দিকেও লক্ষ্য রাখত। পার্বণী ও ভগবানী, রায়দাসী এরা অত্যন্ত জেদি ও চাপা মেয়ে, তারাই জঙ্গলে যেত। অন্যদিকে ভগবানী এক লড়াকু মেয়ে। লেখিকা এসব কথা তাঁর 'সিধু কানুর ডাকে' শীর্ষক উপন্যাসের 'ঘন্টাবাজে' অংশে তুলে ধরেছেন। মুন্ডা আদিবাসী সমাজে সেই সময় যে নারী শিক্ষার প্রচলন ও ব্যবস্থা ছিল না, আমরা তা লেখিকার ভাষায় মুন্ডা যুবতী পার্বণীর উক্তিতে বুঝতে পারি। পাবর্ণী বলে— ''লিখাই পড়াই শিখতে হবে, তুমারদের কাজ করতে হবে, লইবে ভারত সিংয়ের বেটা আরন্দি করবেক নাই।" অবশ্য এ উক্তি দ্বারা অনেকটাই প্রতিপন্ন হয় যে, আদিবাসী মুন্ডা সমাজ ধীরে ধীরে শিক্ষা ও নারী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল। মুন্ডা মেয়েরা শিক্ষিত না হলেও তারা যে কত চৌকস ও চতুর ছিল, তার পরিচয় আছে দুর্গামনির সুবলকে সাবধান করে দেওযার মধ্যে। দুর্গামনি প্রভাস ভূঞা ও বিজিত দত্তের ছল চাতুরীটা ভালো করে বুঝেছিল এবং এও বুঝেছিল সুবল সিং একদিন ওদের চক্করে পড়ে সর্বাশান্ত হবে। সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় মুন্ডা আদিবাসী সমাজের নারীরা সামান্য ঘরোয়া মহিলা ছিল না। পরিবার এবং সমাজে তারাও একটি বিশিষ্ট স্থান পাওয়ার যোগ্য ছিল।

''চোট্টি মুন্ডা' উপন্যাসে লেখিকা মুন্ডা বিদ্রোহের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী রচনার প্রসঙ্গে বীর চোট্টি মুন্ডার বীরত্ব গাথা, সংসার বা পরিবারের ইতিবৃত্তি খুলতে গিয়ে মুন্ডা রমণীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন। লেখিকা বলেছেন, ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার পূতি মুন্ডা নিজের বউ ছেলে মেয়ে প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অজুহাতে আড়কাঠির (দালাল) সন্ধানে বাইরে যাওয়ার সময় অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে ছেলে হলে তার নাম চোট্টি রাখার দায়িত্ব দিয়েছিল। লেখিকা জানাতে চেয়েছিল তৎকালীন মুন্ডা সমাজে পুরুষদের অবর্তমানে মুন্ডা নারীদের এমনতর দায়-দায়িত্ব দিয়ে তাদের নারী

মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হত। মুন্ডা সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানে ছেলেদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় মেয়েরাও যে নাচ গানে যোগদান করত, লেখিকা সে কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন বিজয়া দশমীর দিন চোট্টি মেলাতে। সেদিন পাঁচিশ তিরিশটি গ্রামের আদিবাসীরা সে মেলায় আসে। বাঁশের মাচায় কাগজ জুড়ে ওরা অতিকায় বাঘ, হাতি, ঘোড়া বানায়। সেগুলি বয়ে নিয়ে নাচে। মেয়েরাও নাচে। মুন্ডা আদিবাসীদের মেয়েরাও যে পুরুষের সঙ্গে নাচে, সেই প্রসঙ্গে লেখিকা তাঁর এই উপন্যাসে ষষ্ঠ (ছয়) অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন—

''পুরুষেরা পিছিয়ে গেল। মেয়েরা গোল হয়ে নাচল। নাচতে নাচতে চোট্টির বউ বলল, মরদরা কি মরে গেলি? বাজনা কোথা। কোয়েলরা বাজনা বাজাল। মেয়েরা নাচতে নাচতে গাহিল''।

অর্থাৎ মুন্ডাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষ এক সাথে নাচ গান করে, তাতে তাদের কোনো বাধা নেই। এদের সমাজে কর্তারা না থকলে মুন্ডা মায়েরাই আবার সংসারের কৃর্তিত্ব নিয়ে থাকে। লেখিকা দেখিয়েচেন— ''চোট্টি মুন্ডার বাবার অবর্তমানে সংসারের তার মায়ের লেবার কথা।'' মুন্ডা জাতির নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সংসারে থেকে সব কিছু কাজ করে, সুখদুঃখের ভাগীদারী হয়। মুরগী পালন করে অর্থ সঞ্চয় করে, স্বামীদের নানাভাবে সাহায্য করে। লেখিকা চোট্টির মা, বউ হরমুরমা, কোয়েলের স্ত্রী ডোনকা মুন্ডার মেয়ে এবং হরমুর বউ কোয়েলী স্ত্রী মুংরী প্রভৃতি মুন্ডা নারীদের সামাজিক জীবন কথার সামান্য পরিচয় তুলে ধরে তৎকালীন সময়ে মুন্ডা রমণীদের সামাজিক অস্তিত্ব ও মর্যাদা বিষয়ে অনেক কিছু সংকেত দিয়েছে 'চোট্টিমুন্ডা ও তার তীর' উপন্যাসে। লেখিকা আমাদের মুন্ডা আদিবাসীদের সংগ্রামশীল পুরুষ ও নারীর জীবন কথাকে সাহিত্যের ভাষায় তুলে ধরে ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পগ্রন্থটিতেও কেন্দ্রীয় চরিত্র তিন নারী, যারা ব্রাত্য সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে। তাঁর গল্পগুলিও মূলত অরণ্যাশ্রয়ী আদিবাসী মানুষদের জীবন বিপর্যয়ের কথা নিয়ে রচিত। শ্রেণিবৈষম্য ও ভূমি ব্যবস্থার শিকার ও সামন্ত জমিদারদের শাসন, শোষণ ও উৎপীড়নের মর্ম বিদারক ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তি গল্পগুলিতে সাহিত্যিক ভাষায় প্রকাশিত। এখানেও লেখিকা দেখিয়েছেন, আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা দুঃখ দুর্দশার কপালরেখা নিয়ে জন্মে। পুরুষের অনুসঙ্গীরূপে তাদের মহত্ব কোনো অংশেই কম নয়। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অস্তিত্ব যথেষ্ট। তথাপি তাদের অসহায় অবস্থার কথা অস্বীকার করা যায় না। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর 'রুদালী' গল্পগ্রন্থের প্রথম কাহিনী 'রুদালী'। এই গল্পে আছে অন্ত্যজ জাতির রমণীর দুঃখের কাহিনী। টাহাড় নামক গ্রামটির অধিকাংশ বাসিন্দা গঞ্ঝ ও দুসাদ জাতের লোক। 'রুদালী' গল্পের প্রধান চরিত্র শনিচরী গঞ্ঝ জাতের বউ। ওর সারাটা জীবন কেটেছে

দারিদ্র্যে। গঞ্ঝু জাতির মেয়েমানুষেরা এমনিতেই অবহেলিত ও লাঞ্ছিত, তার উপর শনিবার দিন জন্ম বলে শাশুড়ি পর্যন্ত তাকে অপয়া বলত। শনিচরী তার জীবনে শাশুড়ি, স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূ সব হারিয়ে নিঃসহায়। সংসারটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখার জন্য মহাজন মালিকের বাড়িতে কাজ করেছে, স্বামীর সঙ্গে ক্ষেত খামারের কাজেও সে যোগ দিয়েছে। সংসার বাঁধার কত আশা সে পোষণ করেছে। কিন্তু এক এক করে তার সমস্ত আশার মুকুল না ফুটেই শুকিয়ে গেছে। 'রুদালী' সব হারিয়ে শেষপর্যন্ত নিজেদের মানুষের জন্য কাঁদতেও পারে নি। তার চোখের জল ফুরিয়ে গেছে। এই দরিদ্র অসহায় নারীর কথা কেউ ভাবেনি। বরং গ্রাম সমাজ তার দোষটুকু খুঁজে পেয়ে শনিচরী যে তার নিজের লোকদের জন্য কাঁদে নি সেই নিয়ে সমালোচনায় মুখর। শনিচরীর বুকে এক রাশ মায়ের ভালোবাসা। অসুস্থ পুত্র বুধুয়ার সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব সে নিয়েছে। অথচ পুত্রবধূ সময় বুঝে অন্য পুরুষ ধরে পালিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে নি। নিজের পেটের ছেলেকেও সে ফেলে রেখে চলে যায়। অথচ দুলনের বউ ধাতুয়া ও লাটুয়ার মা ঝগড়ুটে মেয়ে মানুষ হয়েও বুধুয়ার ছেলে শনিচরীর নাতিকে তুলে নিয়ে যায় ধাতুয়োর বউয়ের দুধ পান করাতে। লেখিকা এখানে দুসাদ ও গঞ্ঝু সমাজের অন্ধকার ব্যবস্থা থেকে খুঁজে নিয়ে এসেচেন কত বিচিত্র মহিলাদের, আর লিখেছেন তাদের জীবনকথা। শুধু শনিচরী নয় বিখনিরমতো আত্মাভিমানি, জেদি রমণীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। লেখিকা বলেছেন—

''ওদের জীবনে সহজে কিছু মেলে না। ভুট্টার খাটো ও নিকম যোগাড় করতে জান নিকলে যায়। কি সন্তান জন্মে, কি স্বামী মরলে এরা মহাজনের কাছে বাঁধা।''

লেখিকা এখানে দুসাদ ও গঞ্ঝুজাতির নারীর মর্মন্তুদ জীবন কাহিনী চিত্রিত করেছেন।

''রুদালী'' কাহিনী গ্রন্থের আর একটি গল্প 'টুংকুড়'। 'টুংকুড়' শব্দের অর্থ কাটা ধানের শিষ। গল্পে লেখিকা দরিদ্র মানুষদের প্রতি অত্যাচারী ধনী মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের ছবি তুলে ধরার প্রসঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণির নারী জীবনের দুঃসহ দুরবস্থার কথা তুলে ধরতে গিয়ে আলতা দাসীর দুঃখ দীর্ণ জীবনকাহিনী তুলে ধরেছেন। তৎকালীন পুরুষ শাসিত সমাজ কিভাবে অসহায় নারীদের জীবন নিয়ে টানাটানি করত, সেই উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার আলাতা দাসী। দুলে ঘরের মেয়ে আলতা দাসী। গ্রামের ধনী জমিদার মণ্ডলের লালসার কারণে তাদের জমি জমা নষ্ট হয়েছে। তাই কেবল মাত্র 'টুংকুড়' অর্থাৎ কাটা ধানের শিষ কুড়ানোর অধিকারটুকু পেয়েছে। অথচ তাতেও শান্তি নেই। এক দুর্যোগের সময়ে মণ্ডলের বড় ছেলে গোপাল আলতা দাসীর যৌবন নিয়ে খেলা করে তাকে গর্ভবতী করেছে। তার এই অন্যায় আচরণকে সে স্বীকার করতে রাজী নয়। এক দিন আন্দিবুড়িও তার যৌবনকালে সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছিল গৃহকর্তা মন্ডলের হাতে। এমনভাবে অনেক মেয়েকে নষ্ট করেছে তারা। আলতা দাসী তার সমাজ থেকে যেমন

লাঞ্ছিত, অবহেলিত এবং অপমানিত হয়েছে, তেমনি শেষপর্যন্ত সে মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর মণ্ডলদের কুকর্ম, অন্যায়-অত্যাচার, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

লেখিকার আর একটি গল্প 'গোহুমনি'। এই গল্পের নায়িকা বিশাল ভুঁইয়ার স্ত্রী ঝালো মজুরের কাজ করতে গিয়ে মাটির তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে। এ খবর সবাই জানে। সুতরাং ঝালো তখন বিধবা। গোহুমনি সকলের কাছে পরিচিত। 'গোহমনি' শব্দের অর্থ গোখরা সাপ। বিধবার অভিনয়ে ঝালো এক সময় অত্যাচারী ও শোষকদের কাছে গোহুমনি রূপেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। লেখক এই গল্পে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও পালামৌয়ের সুবিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে কিভাবে পেটবেগায় শ্রমিকদের উপর নানাভাবে শাসন শোষণ, উৎপীড়ন ও অত্যাচার করত, তারই একটি মর্মন্তুদ বাণীচিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অরণ্যজীবী আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজের নারী জাতির ব্যাথার কথাও প্রকাশ করেছেন। লেখিকা এখানে শুধু ঝালোর কথাই বলেন নি, কথা প্রসঙ্গে ঝালোর জ্যোঠাইন অর্থাৎ সাতবানের বউ, পারহাইয়া বুড়ি, মোরি তার প্রৌঢ়া মেয়ে বাসনি, ঝালোর কন্যা সোনা প্রভৃতি মহিলাদের অবহেলিত জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী প্রকাশ করেছেন। গোহুমনি গল্পের ঝালো ওরফে গোহুমনি লেখিকার একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্র। ভুঁইঞা জাতির নারী ঝালো সমস্ত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার। কিন্তু সে নিজের অস্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লড়াই করতেও সে ভয় করেনি। লেখিকা গোহুমণিকে- গোহুমনি রূপেই চিত্রিত করেছেন। ঠিকাদারের প্ররোচনায় পড়ে ঝালোর স্বামী বিশাল ভুঁইঞা বেশকিছু দিনের মতো নাপাত্তা থেকেছে। সবাই ভেবেছে বিশাল মারা গেছে। ঝালোকে জোর করে সমাজ বিধবা করেছে। বিধবা হয়েও সমস্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঝালো বিশ্বাস হারায় নি। বরং সংগ্রাম করে গেছে এবং একদিন তার স্বামীকে সে ফিরে পেয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাস, মনের জোর এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং লড়াই করে ঝালো সংসারের সুখ কায়েম করেছে। ভুঁইঞা নারীদের একটি প্রতিনিধি চরিত্ররূপে ঝালো ওরফে গোহুমনিকে অঙ্কিত করে লেখিকা তাকে একটি ঐতিহাসিক স্থান দিয়েছেন।

'স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের সংকলিত অধিকাংশ গল্পগুলিতেও নারী জীবনের মর্মবেদনার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। 'জগন্নাথের রথ' শীর্ষক গল্পে আছে পূণ্যদাসীর বেদনাবিধূর জীবনের ইতিহাস, আছে তার বিশ্বাসের কথা। সমাজে এরা কতখানি উপেক্ষিতা, অবহেলিতা লেখিকা তাদের জীবনের সেই মর্মবিদারক দৃশ্যটিও তুলে ধরেছেন। 'বান' গল্পে রয়েছে বাগদিনীদের অসামান্য জীবন কথা। 'বান' গল্পের পটভূমি হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবীয় প্রেম ধর্মের প্রচারকে আশ্রয় করে আদ্বিজচণ্ডাল, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রেম বন্যার প্রবাহ সৃষ্টি। এই গল্পের কথাবস্তুর আড়ালে রয়েছে প্রবল অন্ন চিন্তা। অসহায় দরিদ্র মানুষের অন্ন ব্যঞ্জন পেটে ভরে খাওয়ার লালসা। গল্প বলতে

গিয়ে লেখিকা বলেছেন চিনিবাসের মা রূপসী বাগদিনী এবং বুড়ো দিদিমার দুঃখময় জীবন কথা। রূপসীর ছেলে চিনিবাসের প্রতি অপার ভালোবাসা, তাই তার আত্মবিশ্বাসের পরিচয় উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন-''রূপসীর মনে হতে লাগল যেন গৌরাঙ্গ এসে গেছেন, যেন চিনিবাসকে বুকে টেনে নিয়েছেন। যেন যত দুঃখ যত কষ্ট সব ঘুচে গেছে রূপসীর''। 'রূপসী' গরিব বিধবা। সে জাতিতে বাগদিনী। তাই বর্ণশাসিত সমাজে সে উপেক্ষিতা ও অবহেলিতা। তাদের মতো নিম্ন পর্যায়ের নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই। লেখিকার 'স্তন দায়িনী ও অন্যান্য গল্প'গুলির মধ্যে এমন অনেক নারীরই জীবন-কাহিনীর সামাজিক অস্তিত্ব বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে। তাঁর 'বায়েন' গল্পে ভগীরথের সতমা যশির দুঃখদীর্ণ নারী জীবনের অসামান্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। বুড়ি হয়েও যশিকে ঘর সংসারের সমস্ত কাজ, রান্নবান্না, মেয়ে দুটি গৌরবী আর সৌরভীর উকুন বেছে দেওযা, সতীনের ছেলে ভগীরথকে ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করার কাজ করতে হয়েছে। তার বুড়ো বয়সের মুখশ্রী নিয়েও তার দুঃখের অন্ত নেই। সে যে এখন সকলের কাছে ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা ডোম জাতির নারী চণ্ডাল। শশ্মান মানুষ পোড়ানোর কাজ এদের বংশগত। ভগীরথের আপন মা গঙ্গা পুত্তের বিটি চণ্ডী, তার বংশে ভাই, কাকা, দাদা কেউ না থাকায় বাপের বৃত্তি সে নিজেই নিয়েছিল। তার কোনো ভয় ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় লণ্ঠন হাতে একা বটগাছের তলায় ঘুরে বেড়াত। সে তার কাজকে বিধাতার দেওয়া বলে মনে করত। ভগীরথের বাবা মণীন্দ্র ডোম তাকে বিয়ে করেছিল, ভালোবাসতো। একদিন তাদের কুৎসিৎ সমাজ চণ্ডীকে বায়েন বলে অপবাদ দিয়ে ঘৃণা করেছিল। বায়েন ওদের সমাজে ডাইনের মতো অপরাধী, তাদের দৃষ্টি খারাপ। সমাজে তাদের কোনো স্থান নেই। সমাজ অকারণে তাদের শাস্তি দেয়, পাথর ছুঁড়ে মারে। চন্ডী এরূপ অপরাধের তীব্র প্রতিবাদ করে নারী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সে বায়েন নয় বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে চেয়েছে বুক ফাটা ক্রন্দন আর মর্মন্তুদ হা-হাকারে, সবাইকে জানিয়ে দিতে চেয়েছে সে তাদের বংশগত পেশা কর্ম করলেও বায়েন নয়। এই সমাজ নারীদের প্রতি এতই নিষ্ঠুর যে, সত্য মিথ্যের বিচার করতে পারে নি। স্বামী মণীন্দ্র ডোমের মনেও সন্দেহ জেগেছে। গ্রাম সমাজ জোর করে তাকে বায়েন বলে প্রতিপন্ন করেছে। চণ্ডী বলেছে—

''আমি বায়েন লই গো মোক বুকে কঁচি ছেলা, মোক দুধে বুক ফেটে যায়। বায়েন আমি লই। গঙ্গাপুত্র তুমি বলনা গো, তুমি তো সব জান।''

মনিন্দরও শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করতে না পেরে বায়েন বলে স্বীকার করেছে। আর চণ্ডী শুধু অন্তরের গভীরতর বেদনায় কেঁদেছে। একদিন ঐ চণ্ডীই নিজের প্রাণ দিয়ে ফাইভ আপ লালগোলার মেলব্যাক ট্রেনকে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের সমাজের এক শ্রেয়সী নারীর পরিচয় দিয়ে সরকারী বিভাগ এবং নিজেদের সমাজে একটি বিশিষ্ট

স্থান করে নিয়েছিল। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী বাঁয়েন গল্পের এই মহোত্তম নারী চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করেছেন। লেখিকা লিখেছেন—

''লণ্ঠন হাতে চণ্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগল। একহাত তুলে মানা করতে লাগল- এস না, আর এসো না গো এখানে পাহাড় প্রমাণ বাঁশগাড়া। ট্রেন দুরন্ত ছেলের মত কোন বাধা না মেনে একে বারে চণ্ডীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাণ দিয়ে ট্রেনটিকে দুর্ঘটনার থেকে বাঁচাবার জন্যে চণ্ডীর নাম অনেক দূরে পৌঁছে গিয়েছিল। বুঝি বা সরকারের ঘরেও।'' তার মৃত আত্মার সম্মানে সরকার মেডেলও দিয়েছিল। নারী সমাজের কত প্রয়োজনীয়, কিন্তু কুৎসিৎ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তাদের মর্যাদা বোঝে না।

''সাঁঝ সকালের মা'' গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়ের সাধন কান্দোরীর মা জঠি ঠাকুরাণীর আশ্চর্য জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। এ জটেশ্বরীকে সূর্য ওঠার আগে এবং অস্ত যাওয়ার পর মা বলে ডাকার নিয়ম ছিল। তাই তাকে 'সাঁধ সকালের মা' বলা হত। দিনের বেলায় সে জটি ঠাকুরানী। লেখিকা জটেশ্বরীকে একাধারে সাধনের মা এবং অন্যদিকে মানুষের কাছে ঠাকুরানী নারী— এই দুই রূপে প্রকাশ করেছেন।

লেখিকার 'স্তনদায়িনী', 'ডাইনি', 'যশোমতি', 'বিশালাক্ষীর ঘর', 'হারুন সালেমের মাসি', 'যমুনাবতীর মা', প্রভৃতি গল্পগুলিতেও আমরা নারী জীবনের করুণাঘন বেদনার্ত জীবন কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হই। 'নৈঋতে মেঘ' গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেই তিনি গঞ্জু, দুসাদ, ওঁরাং, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের দুঃখদীর্ণ শোষিত অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িত জীবনকাহিনীর বাস্তব ইতিহাসকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সমাজের অসহায়, অবহেলিতা, লাঞ্ছিতা, নারীদের জীবনের ব্যথাতুর কথা বলতে ভুলে যাননি। বরং তিনি দেখিয়েছেন সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তাদের কেন এত অধোগতি! সমাজ ব্যবস্থায় কেন তাদের অবমূল্যায়ন! লেখিকা সহৃদয় সহানুভূতি দিয়ে সেদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন।

লেখিকার কতকগুলি গল্প সংকলিত হয়েছে 'বাছাই গল্প' শীর্ষক গল্পগ্রন্থে। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এই গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ লেখা বলে স্বীকার করেছেন এবং এগুলির অধিকাংশই যে পালামৌয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী সে কথাও বলেছেন। সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে 'জগমোহনের মৃত্যু', 'স্তনদায়িনী', 'হুলমাহরমা', 'ধৌলী', 'সংরক্ষণ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই গল্পগুলির মধ্যে আছে কত নারীর যন্ত্রণাকাতর জীবন কাহিনী। লেখিকা স্বয়ং তাঁর এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির প্রসঙ্গে তাঁর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'সংরক্ষণ' থেকে 'স্তনদায়িনী' প্রত্যেকটিতে আমি যা ঘটে আসছে একইরকম ভাবে, প্রাচীন দিন থেকে আজ, এবং আগামী শতকেও সেই কথাই লেখেছি। শোষণ-নির্যাতন, প্রশাসনের মানুষ মারা ঘোলা, অরণ্য,

অরণ্যপ্রাণী-সংস্কারের দাসত্ব, নারীর অবস্থান, অতীতে যা ছিল, আজও তাই আছে। প্রতিবাদে জ্বলে ওঠা এ কাহিনীও নতুন কিছু নয়।"

লেখিকা ''গণেশ মহিমা''য় পরিবেশন করেছেন অসহায় হরিজনদের শোষিত ও বঞ্চিত জীবনের বেদনার্ত কাহিনী। লছিমা অদৃশ্য অন্ত্যজ জাতির নারী। কিন্তু তার রূপ যৌবন লালিত শরীরের প্রতি উচ্চবর্ণের রাজপুত মেদিনী সিংদের অন্তহীন লালসা, তার দেহকে উপভোগ করে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ে। 'দ্রৌপদী' গল্পে লেখিকা এক লাঞ্ছিতা নারীর প্রতিবাদ মুখর অসামান্য দৃঢ়তাকে সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

অরণ্যের স্নেহকাতর প্রকৃতি সুন্দর পরিবেশে যুগযুগান্তর ধরে যে জাতির মানুষ বসবাস করে আসছে তারই আদিবাসী এই নামে সুপরিচিত। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তাদের রহস্যঘন জীবনবৃত্তান্ত নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। লেখিকা স্বয়ং এক গবেষিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সুদূর বিস্তৃত ঝাড়খণ্ড তথা উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের অরণ্য সংলগ্ন তপশীলভুক্ত জনজাতি ও অন্যান্য তথা-কথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের জীবনকথা প্রকাশ করেছেন তাঁর রচিত বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটোগল্পে। আদিবাসীদের জীবন প্রণালী, তাদের খাদ্য, তাদের নেশা, তাদের আশা, ভরসা, তাদের সমাজ সংসার, তাদের পরিবার, তাদের সংস্কৃতি, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের ব্যক্তি মানসিকতা, তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে যে সম্যক জীবন, তার নিখুঁত পরিচয় বিধৃত হয়েছে লেখিকার কথাসাহিত্যে। প্রকৃতি প্রেমিক এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংসার ও সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী ও সহায়ক যে নারী, তাদের জীবনের বহু বৈচিত্র্যময় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলিতে। তাঁর লেখায় সমাজের উচ্চ ও নিম্নবর্ণের, তথা আদিবাসী ও অনাদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী জীবনের বিপন্নতা, অসহায়তা, অধোগতি, অবমূল্যায়ন এবং অবহেলা, তার সাথে সাথে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় অস্বাধীনতা ও অসুরক্ষা কীভাবে ক্লিষ্ট, ব্যথাহত করছে তাদের জীবন, তার সকরুণ চিত্রও এখানে প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান নারী স্বাধীনতার বৈধনিক স্বীকৃতি দিয়েছে। পুরুষের সঙ্গে তারা সমান অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। সমান সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনেও তারা তৎপর। অথচ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেও পুরুষ ও নারী Superorety এবং inferiorety-এর শিকার। বিশেষ করে আদিবাসী তপশীলভূক্ত জাতি ও জনজাতি এবং তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণি বা সম্প্রদায়ের নারীদের জীবন এখনও কত দুঃসহ, দুর্বহ; তাছাড়া তারা প্রথাবদ্ধ সমাজ জীবনের কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের ধাক্কায় কীভাবে আছাড় খাচ্ছে, তারা সমাজের অভিন্ন অঙ্গ তথা সামাজিক ও সংসারিক জীবন নিবাহের অংশিদার হয়েও আজ শোষণ এবং বঞ্চনার জ্বালা বুকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তার বিশ্বস্ত জীবন আলেক্ষ্য প্রস্তুত হয়েছে তাঁর লেখায়।

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী সুদীর্ঘকালের আদিবাসী আন্দোলনের বহুচর্চিত অথচ উপেক্ষিত অলিখিত ইতিহাসকে বাস্তব তথ্য ও সত্যে সমৃদ্ধি করে তাঁর কথা সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। 'শাল গিরার ডাকে' থেকে তাঁর আদিবাসী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভুলে যাওয়া ইতিহাসের পটভূমি তৈরি হয়ে বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পের মধ্যদিয়ে তার সমাপ্তি হয়েছে 'হাজার চুরাশীর মা' এবং দু-একটি অন্য গল্পে। অবশ্য তারপরও ১৯৭৯-৮০-র ভূমিদাস 'বনডেড্ লেবার' প্রথার বিরুদ্ধে সংগঠিত পালামৌর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'রূদালী', 'টুংকুড়', এবং 'গোহুমনি' এই সব রচনায় আমরা খুঁজে পাই আদিবাসী নারীদের সামাজিক এবং সংসারিক জীবনের ইতিহাস। মহাশ্বেতা দেবী ১৭৮৫-র বাবা তিলকা মাঝির বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬-র সাঁওতাল ও খের বিদ্রোহ, ১৮৪৫-র বীরসা মুন্ডার বিদ্রোহ ছাড়াও অনেক ছোটো খাটো আন্দোলনের ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ করে তাঁর কথাসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে সাঁওতাল নারীদের সামাজিক অবস্থা বা স্থিতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তৎকালীন প্রকাশিত বেঙ্গল গেজেটের এবং অন্যান্য ডিসট্রিয়ার ও বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে তথ্যসংগ্রহ করে, তার সঙ্গে সঙ্গে জনশ্রুতি, মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, সাঁওতাল ও মুন্ডা গান, কিছু সংখ্যক প্রশাসনিক ও আদালতি রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে যে বাস্তব তথ্যগুলি আহরণ করেছেন, তা থেকে এক সুবিস্তৃত অরণ্যভূমির আদিবাসী নরনারীর জীবন ইতিহাস উঠে এসেছে। যে আদিবাসী নারী এক সময়ে পুরুষদের সঙ্গে তাদের সাংসারিক জীবন নির্বাহের সক্রিয় শরিকদার হয়ে, এমন কি তাদের সঙ্গে ভারতের বীরাঙ্গনাদের মতো নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে এবং তাদের অরণ্যের অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে লড়াই করে এসেছে, সেই তাদের জীবন কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজের হাতে লাঞ্ছিতও হয়েছে, তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর লেখায়। ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজের সকল স্তরের নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নারী স্বাধীনতার কথাও ঘোষণা করেছে। নারীদের সমান অধিকার লিখিত হয়েছে ভারতের সংবিধানে। নারীদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। আবার তাদের জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সময় সময় কত অধিসূচনা (ordinance) জারি হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজও সভ্য মানুষের পুরুষ শাসিত সমাজ নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের নির্যাতিত হওয়ার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে নি। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথাসাহিত্যে সেদিকে ইশারা করেছেন। সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী, সকল সম্প্রদায় তথা অন্ত্যজ শ্রেণির সমাজে নারীরা আজও সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, নিয়ম, কানুন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শিকার। আজও তাদের সমাজের চোখে কেউ ডাইনি বলে প্রতিপন্ন হয়। তবে শুধু যে তাকে সমাজ ছাড়া করা হয় তাই নয়, তাকে নানারকমের দুঃসহ অত্যাচার ভোগ করতে হয়, এমনকি তাদের

জীবন খুনেরও শিকার হয়ে থাকে। আদিবাসী সমাজ বর্তমান সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়েও তারা আদিবাসী মেয়েদের বিজাতীয় বিবাহকে স্বীকার করে নিতে পারে নি। বরং উল্টে ঐ সমস্ত মেয়েদের জীবন সমাজের কঠোর শাসনে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। যদিও আজ আদিবাসী মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এখনও তাদের স্বতন্ত্র জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পদে পদে নানারকমের বাধা উৎপন্ন হয়ে থাকে। আজকের ক্রমোন্নতি ও পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র আইন করে নারীদের পৈতৃক সম্পত্তির অংশদানর এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জমির মালিকানা সত্ত্বও প্রদান করা হচ্ছে। অথচ তাদের স্বামী পুত্রহীনা জননীদের মুখাগ্নির অধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আজও তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শবযাত্রার অংশগ্রহণ করে শ্মশানে যাওয়ার অধিকার পায় নি। তবে বিবাহাদি শুভ কর্মে বা উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের স্ত্রী আচার মর্যাদা দিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য যুগের হাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী এবং তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সমাজে নারীদের অবস্থা ক্রমোন্নতির পথে। এখন তারাও সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ ও বিচার প্রকাশের অধিকার পেয়েছে। রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাদের অবাধ প্রবেশ লক্ষ্য করার বিষয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এমন কি তাদের সমাজ ব্যবস্থাও নারী বিকাশ প্রকল্পকে প্রোৎসাহিত করতে প্রয়াসী। কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল তাদের আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলেও তাদের অগ্রগতির পথে বাধা দিতে সক্ষম নয়। আদিবাসী সমাজে নারীদের জীবনের সেই দূরপনেয় দুর্দিনের ঘনঘোর অন্ধকার কেটে গিয়ে উন্নতগামী আশার আলোক ঝলমলিয়ে উঠেছে।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা

১. 'মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র' ১-২০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।

২. সুমিত-চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের বিষয় আশয়', পুস্তক বিপণী, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪

৩. শম্পা চৌধুরী, 'আদিবাসী সমাজ, ঔপনিবেশিক প্রকল্প ও মহাশ্বেতার উত্তর ঔপনিবেশিক মানসিকতা' প্রবন্ধ বিংশ উজ্জীবনী পাঠমালায় প্রদত্ত ভাষণাবলী, ২০০৭।

৪. শিপ্রা দত্ত, 'মহাশ্বেতা দেবীর কথা সাহিত্যে আদিবাসী জীবন', অক্ষর পাবলিকেশনস।

৫. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'মহাশ্বেতা নানা বর্ণে ও নানা রঙে', দিয়া পাবলিকেশনস্, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, কলকাতা।

৬. সুবোধ ঘোষ, 'ভারতের আদিবাসী', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা- ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০০।

৭. মহাশ্বেতা দেবী, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৪।

ওড়িয়া হরফে রবীন্দ্রসাহিত্য : বিবরণ উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

শান্তনু দলাই*

আমাদের আলোচ্য বিষয় ওড়িয়া সাহিত্য সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রচর্চা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কীভাবে ওড়িশার সাংস্কৃতিক মনোজগতে আলোড়ন ফেলেছিল এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব ও প্রতিফলন কতখানি ওড়িয়া সাহিত্যের উপর পড়েছে সে বিষয়ে একটি কালানুক্রমিক ধারণা এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত হবে। এই আলোচনার বিষয়বস্তু মূলত কয়েকটি ক্রমবিন্যাসে উপস্থাপিত হবে, যেমন প্রথমতঃ ঠাকুরবাড়ীর জমিদারী দেখভাল সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাথে ওড়িশার বৈষয়িক ও রাজনৈতিক যোগসূত্র, দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদচর্চা, তৃতীয়তঃ ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা, চতুর্থতঃ রবীন্দ্র জীবন ও দর্শন বিষয়ে ওড়িয়া ভাষায় প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা, এবং পঞ্চমতঃ ওড়িশার সাহিত্যিক সমাজে রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সারা বিশ্ব জুড়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাবানুবাদ ও ভাষানুবাদ চলতে থাকে। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদের প্রচেষ্টা হয়। ঠিক এই সময় ওড়িয়া ভাষায় রীবন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ করে গীতাঞ্জলির অনুবাদ হতে শুরু করে। শুধুমাত্র গীতাঞ্জলি নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাস, নাটক ও কাব্যের ওড়িয়া অনুবাদ প্রকাশ হতে শুরু করে। অনুরূপ ভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে ওড়িয়া ভাষায় বেশ কয়েকটি সাহিত্যের অনুবাদ ও সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ওড়িশার সাথে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগ অনেক দিনের। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষ নীলমনি ঠাকুর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ওড়িশার জমিদারী সূত্রে যাতাযাত ছিল। বাংলাদেশের যশোহর জেলা থেকে এককালে রামজয় ঠাকুরের পুত্র নীলমনি ঠাকুর কটকে এসেছিলেন ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এক জমিদারের সেরেস্তাদারির কাজে। সেখান থেকে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে ১৭৬৫ খ্রীঃ বসবাসের জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িটি নির্মাণ করেন। তিনি ১৭৯১ খ্রীঃ মারা যাওয়ার পর তাঁর পৌত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ওড়িশার কটক জেলার পাড়ুয়ায় ১৮৪০ খ্রীঃ জমিদারি ক্রয় করেন। কটকের তুলসীপুরে দ্বারকানাথ ঠাকুর বসবাসের জন্য একটি

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ।

বাংলোও নির্মাণ করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের হাতে পাণ্ডুয়ার জামিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নেন ও পাণ্ডুয়ার জমিদারি পরিদর্শনে যান। সেই সময় তিনি কটক ও পুরীতেও থেকেছিলেন। ওড়িশার শিক্ষা ক্ষেত্রে ও ওড়িশার ব্রাহ্ম সমাজ গঠনে দেবেন্দ্রনাথের অনেক অবদান আছে। সেই সময় তিনি কটকের রেবেনশ ডিগ্রি কলেজকে দুই হাজার পাঁচশ টাকা দান করেন এবং ওড়িশার কটক শহরের ওড়িয়া বাজারে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন।[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য ঠাকুরবাড়ির সদস্যগণ নিয়মিত ওড়িয়া পরিদর্শনে যান। কটকে থাকা কালীন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ পুরীতে থাকাকালীন কয়েকটি চিত্র অঙ্কন করেন। ওড়িশার কোনারকের সূর্য মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরের শৈল্পিক ও দার্শনিক তাপর্য নির্ভর কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পাথারপুরী নামে পুরীর সমুদ্র সৈকতে ঠাকুরবাড়ির সৈকতাবাসটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সজ্জিত ছিল। এই সকল পরিবেশ ঠাকুর পরিবারের শিল্পীদের নন্দন চর্চায় অনুপ্রাণিত করতো। সেই সময়ের ওড়িশার বিখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি মহাপাত্র, গিরিধারী মহাপাত্র এবং শ্রীধর মহাপাত্র প্রমুখ শিল্পীগণ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস-এর প্রতিষ্ঠাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে এসে কলা বিদ্যা লাভ করেন। অবনীন্দ্রনাথ এই ভাস্করদের যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং তাঁদের নির্মিত শিল্প সকল সোসাইটির তত্বাবধানে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শিল্পগুলি সোসাইটির আর্ট গ্যালারির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করে রাখা হয়।[২]

ওড়িশায় রবীন্দ্রনাথ

১৮৯০ খ্রীঃ ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার কয়েক মাসের পর ওড়িশার পাণ্ডুয়ার এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রায় ছয় বছর দায়িত্বভার পালনের সময় ওড়িশার গ্রাম ও শহর উভয় জনজীবনের সাথে কবির নিবিড় যোগসূত্র তৈরী হওয়ায় সেখান থেকে কবি সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অনেকটা রসদ পেয়েছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জমিদারি দেখাশোনার কাজে কটকে যান তখন রবীন্দ্রনাথ বাবার সাথে ওড়িশায় যান। তাঁরা দ্বারকানাথ ঠাকুর নির্মিত কটকের তুলসীপুরের বাড়ীতে বসবাস করেন। ঐ বাড়ীতে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি আসর বসে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১৪ বছর। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি সুধী সমক্ষে পাঠ করেন। এই খবরটি ১৮৭৫ খ্রীঃ ২৯শে মে ওড়িয়া সাপ্তাহিক 'উৎকল দীপিকা'য় উল্লিখিত হয়। এই সাপ্তাহিকটি কটক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরের শিরোনামটি ছিল 'বিদ্বতজন সমাগম'। পরে এই খবরটি বাংলা 'তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৫ খ্রীঃ জুন মাসে প্রকাশিত হয়।[৩]

১৮৯১ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথ যখন ৩০ বছর বয়স তখন দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে পান্ডুয়ার জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। কলকাতা থেকে পান্ডুয়ায় কবি গেছিলেন, স্টীমার ও পাল্কী করে। সেই যাত্রাপথের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার কথা ভাইঝি ইন্দিরাদেবীকে পত্রের মাধ্যমে লেখেন। পান্ডুয়ায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের অজুন চিত্রাঙ্গদার কাহিনী পরিকল্পনায় 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যটি রচনা করেন।[৪]

এরপর রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ খ্রী ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে পান্ডুয়া যান। এস্টেট পরিদর্শনের পর দু'জন মিলে কটক, পুরী ও ভুবনেশ্বর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁরা দু'মাসের মত ওড়িশায় কাটান। কবি সেই সময় কটক থেকে ১০.০২.১৮৯৩, ১৭.০২.১৮৯৩, ২৫.০২.১৮৯৩, ২৭.০২.১৮৯৩, বালিয়া থেকে ২৮.০২.১৮৯৩, ০১.০৩.১৮৯৩, পুরী থেকে ১৪.০২.১৮৯৩ এবং তিরান থেকে ০৪.০৩.১৮৯৩ তারিখগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ, ধর্মচর্চা, যাতায়াত ব্যবস্থা, ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার, ওড়িশার মানুষজনের সারল্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জোড়াসাঁকোয় পত্র প্রেরণ করেন। কবি রাস্তার দুপাশে তাল-নারিকেল-আম-কলার বাগান ইত্যাদি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আবেগাপ্লুত ও বিমোহিত হয়ে পড়েন। পাখির ডাক, কাঠবেড়ালির নাচ, সমুদ্রের গর্জন, দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ, উন্মুক্ত আকাশ, চন্দ্রালোকিত রাত্রি কবির মনকে মুগ্ধ করেছিল। এই সকল অনুভূতির কথা তাঁর পত্রগুলিতে লিখে গেছেন। পান্ডুয়া থেকে কটক যাওয়ার পথে ঠান্ডা ও সামুদ্রিক আবহাওয়ায় কবি দু'দিন সময় কাটান। সেই সময় তিনটি কবিতা রচনা করলেন 'অনাদৃত', 'নদীপথে', ও 'দেউল'। ওড়িশায় থাকাকালীন তিনি অন্যান্য দুটি কবিতা যেমন 'বিশ্বনৃত্য', 'সমুদ্রের প্রতি' রচনা করেন। শেষবারের মতো কবি ওড়িশায় আসেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি জমিদারি তদারকির কাজে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'মালিনী' শুরু করেন।৫

দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে জমিদারি ভাগ করেন এবং ওড়িশায় অন্তর্গত পান্ডুয়ার জমিদারি দেখভালের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর। ফলে পরবর্তী সময়কালে দেখছি জমিদারি সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ওড়িশায় যাননি। ১৯৩৯ খ্রীঃ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস কোলকাতায় এসে কবিকে ওড়িশায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ করে যান। কবি সানন্দ চিত্তে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলাপচারিতায় কবি বলেন;

"I belongs also to Odisha. I entertain goodwill, love and effection for the people of Odisha, so i am closely watching the political devlopment of Odisha"[৬]

পরবর্তীকালে ১৯৩৯ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথ পুরীতে এসেছিলেন। কয়েকটি কবিতার অনুপ্রেরণা ও সৃষ্টি হয় ওড়িশার মাটিতে;

"He came to Odisha in the third week of April 1939 as state guest. He left Puri in the second week of May. During his stay composed three poems: 'Prabasi' (the outsider), 'Janmadin' (birth day) and 'Epare opare' (this side and that). He wrote about nineteen poems in Odisha, a few of them importent ones"[৭]

ও বিষয়ে অন্য এক গবেষক বলেছেন যে;

''মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে কবি পুরীতে এসে কিছুদিনের জন্য সমকালীন মন্ত্রীদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে গিয়ে তিনি এই ভাবে আতিথ্য গ্রহণ করেননি। তাঁর আতিথ্য গ্রহণের সময় কোন অভিমানী ওড়িয়া তাঁকে 'ঝুঁটিবাঁধা উড়ে' সম্পর্কে আক্ষেপের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন। এতে কবি কিছু পরিমাণ দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এভাবে বিচার করলে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের অবকাশটিই হয়ে পড়বে সংকুচিত।"[১]

ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব

ওড়িশার সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের এক চিরন্তনী আবেদন আছে। ওড়িশার রবীন্দ্রসাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকেরা এখনও রসতৃষ্ণা নিবারণে নিমগ্ন। এখনও ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ, সাহিত্য পাঠ, সমালোচনা ইত্যাদি দ্রুততার সাথে চলছে। প্রায় শতাব্দী ব্যাপী ওড়িশার কবি ও পাঠকের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ে আসছে একথা বলা যেতে পারে।

১৮৯৩ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে জমিদারির কাজে ওড়িশায় গিয়েছিলেন কবি তখন কটকে ডিস্ট্রিক ও সেশন জর্জ বি.এল গুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন।[২] সেই সময় তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থাপিত ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিয়ে নিজের একটি কবিতা গান করেন। কবিতাটি 'কি গাব আমি কি শোনাব...'। যথা সম্ভব আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি মধুসূদন রাওয়ের (১৮৫৩-১৯১২) সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তার কারণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'নব্যভারত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কবি মধুসূদনের 'ঋষিচিত্র' নামে কবিতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পাঠ করে সেই বছর 'সাধনা' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় অভিমত দেন;

''প্রচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহাপর লেখেন, তাহার মধ্যে প্রচীনত্বের প্রকৃত রসাস্বাদন পাওয়া যায় না, কিন্তু 'ঋষিচিত্র' কবিতাটির মধ্যে একটি প্রচীন

ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে।”[৩]

মধুসূদন রাওয়ের সাথে কটকে কবির সাক্ষাৎ হওয়ার পর উভয় কবির মধ্যে বহুবার দেখা হয় এবং অনেকটা আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

‘‘উপনিষদের ভাবনায় আলোকিত দুই কবির রচনাগত সাদৃশ্য দেখা যায়। মধুসূদনের ‘কুসুমাঞ্জলি’ (১৯০৩,) ও রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০) উভয় গ্রন্থে বিশ্ব নিয়ন্ত্রক অসীম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ও অকপটে সর্বস্ব নিবেদনের সুর ধ্বনিত।”[৪]

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে মধুসূদন শান্তিনিকেতনের অতিথি হন। সেখান থেকে ফিরে কবি মধুসূদন নিজের ডায়েরিতে (০৯.০৩.১৯১১) লিখেছেনঃ

‘‘রবিবাুর সঙ্গে বাঙলা ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা হল। দীনেন্দ্র বাবুর কণ্ঠে রবিবাবুর কয়েকটি ধর্ম সঙ্গীত শুনলাম। রবিবাবু শুধু সাধারণ কবি বা লেখক ছিলেন না, তিনি বাস্তবে একজন ঋষি। তাঁর বিনয়, বিশ্বাস ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কার্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং সরল সুন্দর জীবন আমাকে যেভাবে প্রভাবিত করল সেইভাবে খুব কম জীবনই করেছে।”[৫]

রবীন্দ্রনাথের মূলত জাতীয় চেতনার আদর্শ ও ভাবধারার সাথে ওড়িয়া সাহিত্য ধারায় ‘সত্যবাদী’ গোষ্ঠীর লেখকদের মিল ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনার প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্যবাদী সাহিত্য গোষ্ঠীর উপর পড়েনি। এই গোষ্ঠীর প্রবর্তক গোপবন্ধু দাস (১৮৭৭-১৯২৮) শিক্ষা প্রসার ও সংস্কারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন। ‘‘গোপবন্ধু ১৯১৮ সালে কবিগুরুর অতিথি হয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ‘শান্তিনিকেতন ভারতের প্রাচীন ঋষি আশ্রমের আদর্শে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল”[৬]

ওড়িয়া সাহিত্য ধারায় ‘সবুজ গোষ্ঠী’র (১৯২০-১৯৩৫) লেখকবৃন্দ রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্র ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার গন্ডী ও কুসংস্কারমুক্ত এই কবিদের রবিন্দ্রনাথের ছন্দশৈলী অনুসরণে যে গীতিধর্মী কবিতা রচিত হয়েছিল, তাতে বিশ্বমানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘সবুজ গোষ্ঠী’র যে সকল কবি রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, শরৎ মুখার্জী ও হরিহর মহাপাত্র। ‘সবুজপত্র’-এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর মত ব্রাহ্ম নেতা বিশ্বনাথ করের সম্পাদিত ‘উৎকল সাহিত্য পত্রিকা’ কে মাধ্যম করে এই সকল ওড়িয়া কবিগণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ‘সবুজপত্র’ কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যবহৃত ‘সবুজ’ শব্দটিকে আহরণ করে কবিতায় সম ব্যঞ্জনাধর্মী ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সুতরাং ‘সবুজ’ নামটি প্রতিবেশী বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক আবহ থেকে গৃহীত। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’ প্রকাশিত ১ম সংখ্যায় রবিন্দ্রনাথের ‘সবুজের অভিযান’ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সবুজগোষ্ঠীর অন্যান্য

সাহিত্যিকেরা এই কবিতাটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন;

''উৎকল সাহিত্য'ক্রমে আমাদের কয়েকজনের মুখপত্র হয়ে গেল। লোকে বলল, 'সবুজ দল' বলে এক লেখক গোষ্ঠী আছে। এ নামকরণ কার কৃতিত্ব, আমার মনে নেই। বাংলা 'সবুজপত্র'-এর সঙ্গে আমার আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' আমাদের মূলমন্ত্র ছিল।''[৮]

ওড়িয়া কবি বৈকুণ্ঠ নাথের 'সবুজ পরী' একটি ব্যঙ্গ কবিতা বিশেষ। তারা গঠন করেছিলেন 'সবুজ সহিত্য সমিতি'। কবি অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির অবলম্বনে লিখলেন 'সবুজপরী' কবিতাটি যা তার 'পরীমহল' কাব্যে অন্তর্ভূক্ত। এই কবিতায় কবি জীর্ণজরাকে বিদায় দিয়ে নব চেতনায়, যৌবনের অফুরন্ত গতিতে উজ্জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন;

''সবুজপরী, আস!
পত্র রহে কান ডেরি
উর্দ্ধে চাহে ঘাস।
শীত গলা বনে বনে পল্লব ঝড়াই
উত্তরা পবণে তার উত্তরী উড়াই।
দিগে দিগে সংরচিলা শুষ্কতার শ্বাস
সবুজপরী, আস!
যৌবনের মন্ত্রে সখি, জীর্ণজরা নাশ।''[৯]

সবুজ যুগ ও রবীন্দ্রপ্রভাব প্রসঙ্গে ওড়িয়া কবি মায়াধর মানসিংহ বলেছেন;

''একদল আন্ডার গ্যজুয়েট বাংলা ট্রেড মার্কা মারা তরুণ সত্যবাদী দলের পরে আবির্ভূত হন। তখন রবীন্দ্রনাথের নাম ও যশ শীর্ষস্থানে পৌঁছেচে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মদ্যের উগ্রস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।''[১০]

সবুজ যুগের পর সমাজবাদ বাস্তববোধের, চিন্তাধারা ওড়িয়া কবিতায় সংক্রমিত হয়। ''কবি সচ্চিদানন্দ রাউতরায়, অনন্ত পট্টনায়ক, ও মনমোহন মিশ্র প্রমুখ প্রগতিশীল কবিরা সর্বহারা জয়গান করতে এগিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শবোধ তাঁদের অনুপ্রণিত করতে পারেনি, এইকারণে কবি রাউতরায় 'রাজজেমা' কবিতায় 'আমি টেগোর বা শৈলী নই' বলে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন।''[১১]

বিশেষ করে ১৮৯১-৯৩ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ওড়িশা ভ্রমণের সময় লব্ধ অনুভুতি কবি প্রায় ষোলটি চিঠিতে লিখে গেছেন। কবির ভাষায় ''এই চিঠিগুলির মধ্যে আমার মনের সমস্ত ভাব যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি আমার আর কোন লেখায় হয়নি।''[১২] ১৯৩৯ সালে ২৮ শে এপ্রিল পুরীর মুক্তিমন্ডপ সভার পক্ষ থেকে কবিকে

সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেদিন কবি ওড়িশা লেখক ও কবিকুল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলে সেদিন সেই সভায় কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিজেদের ধন্য বলে মনে করেছিলেন। রাজা যে মানপত্র প্রদান করেন তাতে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে উল্লেখ করা ছিল এইরূপ;

''ভারত কবি কুলতিলক বিশ্ববরেণ্য সুধীপ্রবর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঙ্কর অসাধারণ কবি প্রতিভা সসাগরা প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য ধরাপৃষ্ঠুরে প্রাচীন আর্যবিভব মন্ডিত ভারতবর্ষকু দেশীয় সাহিত্যকলা উৎকর্ষসাধন দ্বারা গৌরবান্বিত কবি থিবারু বিশ্বকবিষ্কু আন্তে আনন্দিত হোই আজি এহি সর্বধর্ম সমান্বিত নীলাচল দামরে পরমগুরু উপাধিরে ভূষিত করি শাড়ী শিরোপা আজ্ঞা দেলু। ইং তাং ২৮/০৪/১৩৩৯''[১৩]

বিশ্বকবিকে দেওয়া মানপত্রটির বিশ্বভারতী সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

''১৯৭৫ সালের ৯ই মে তারিখে ঝাউবন বেষ্টিত অতিথিশালায় গুরুদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। নবকৃষ্ণ চৌধুরীর পত্নী, কবি শিষ্য মালতী চৌধুরী কবিগুরুকে দেখাশোনার জন্য কাছাকাছি ছিলেন। মালতী সেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। মালতী সেনের সহপাঠী ছিলেন নবকৃষ্ণ চৌধুরী। ১৯২৭ সালে উভয়ে পরিণয়ে আবদ্ধ হন। উভয়ে কবিগুরুর আর্শীবাদ পেয়েছিলেন। নবকৃষ্ণ চৌধুরী পরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হন। অতিথিশালায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও শঙ্খধ্বনির সমারোহে লেখক - শিল্পী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্য অনুরাগীগণ কবির জন্মদিন পালন করেন''[১৪]

এই সভায় কবি কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তাঁর 'রবীন্দ্র বন্দনা' কবিতাটি পাঠ করেন। কবিতাটির প্রথম পদটি ছিল 'চল্লিশ কোটী ভিতরু আজি কোটীএ লোক যে ভাষা কহে, সে ভাষা কবি জনায়ে তার অন্তরর বন্দন হে'। সভাস্থলে রবীন্দ্রনাথ কালিন্দীচরণের পঠিত কবিতাটির সম্পর্কে বলেন যে, কবিতার অর্থ কিঞ্চিত অবোধ্য হলেও ছন্দ ও ভাষা অবোধ্য ছিল না। এই কথা বলার পর কবি ওড়িয়া সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ''ওড়িয়া সাহিত্যের গতি, লেখকদের সমস্যা, সাহিত্য সংগঠন ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কালিন্দীচরণের উপস্থিতিতে স্টেটস্‌ম্যান ও অ্যাসোসিয়েট প্রেস-এর একজন সাংবাদিক কবিগুরুর সাক্ষাৎ নিতে চাইলে কবি কথা বলতে অসম্মত হন।''[১৫]

'১৯৩৫-১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথের কটক যাওয়ার কর্মসূচী ছিল। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। কবির আগমন উপলক্ষ্যে কবি মায়াধর মানসিংহ 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। তার তিন বছর পর ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ওড়িশায় এলেন তখন 'সহকার' পত্রিকায় (দ্বাবিংশ ভাগ, নবম ও দশম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।'[১৬] কবি মানসিংহ সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী ও প্রকৃতির উপাসক কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দ্যেশে বলেন, 'ক্ষণিক বিমূঢ় বনিক যুগরে হে চারণ এশিয়ার, শুনাইছ তুমি চির সনাতন সত্যর সমাচার।'

ওড়িশার অন্যতম কবি বিছন্দ চরণ পট্টনায়ক তাঁর 'কবীন্দ্র বন্দনা'তে লিখলেন–

'কবিতার কুঞ্জবন এ উৎকল কলা-মরালীর লীলাসর
প্রকৃতি-কমলা-চারু-চিত্রশালা উল্লাসিত আজি তা অন্তর
তুম্ভ আগমনে,
সাহিত্য সমাজ অর্ঘ্য দানে,
কোনার্ক পথর অবলা বন্দানে বন্দে পূর্ণ হুলোহুলি শুনে।'[১৭]

'কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও নবকিশোর দাস কবি পুরীর আগমনের সময় 'রবীন্দ্রবন্দনা' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি পরের মাসে (১৩৪৪ জৈষ্ঠ্য) 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মনে হয় এই কবিতায় কবির প্রতি নবকিশোরের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রীতি সর্বাপ্রেক্ষা অধিক স্ফূরিত হয়েছে। যেমন-

'ক্ষুদ্র কবি পুজে ভোলে তোলি অর্চ্চনা
এ শুভ তিথি হে কবি! মধুর মূর্ছনা
জাগে মম প্রাণে, মনে কী গাইবি গীতি?
ব্যক্ত নাহি হুএ হৃদ ভরা ভক্তি প্রীতি'[১]

কবি গুরুর নোবেল প্রাপ্তির পর ভারতীয় সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রসাহিত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হতে শুরু করে। পূর্ব থেকে উৎকলের সাহিত্য সমাজের সঙ্গে কবির পরিচিতি গড়ে উঠেছে। ওড়িশার সঙ্গে বাংলার আত্মিক যোগসূত্র ও ধর্মীয় যোগসূত্র মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে। মধুসূদন রাও ও গোপবন্ধু দাসের পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল কবি ও প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন ১৯২৪ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর থেকে ১৫ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করেন। তার ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্কর এসে গুরুদাবের আশীর্বাদ গ্রহণ করে যান। শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয় বার এসে যে অনুভূতি গ্রহণ করেন তিনি 'শান্তিনিকেতন' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে;

''বর্ষক তলে যেতেবেলে আসি থিলি আশ্রম উপরে সেতে দৃষ্টি দেই ন থিলি, যেতে দেই থিলি আশ্রম প্রাণ রবীন্দ্রনাথস্ক উপরে। আজি সে South America রে। তাস্কর অভাব বিশেষ অনুভব করুছি। কিন্তু সুখর বিষয়, আশ্রমর এবে অনেক বিখ্যাত লোক অছন্তি এবং শিঘ্র অনেক আসিবে।''[১৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ওড়িশায় কর্মরত বেশ কয়েকজন বুদ্ধজীবী ওড়িয়া ভাষাকে বিলোপ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা ভাষার প্রচলন করার জন্য উদ্দ্যেগ নিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল হন। সেই সময় এই ভাষা বিলোপের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ওড়িশাবাসীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

পরবর্তী সময়ে তাঁর 'ভাষা বিচ্ছেদ প্রবন্ধে' (ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ) কতকগুলি অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন, যার ফলস্বরূপ ওড়িশার কবি- সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্র বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পর ওড়িশার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কবিগুরুকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ, কর্মময় জীবন, রবীন্দ্র দর্শন ইত্যাদিকে বিষয় করে ওড়িশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রকাশ হয়। কিন্তু সমস্ত লেখালেখি পাঠক সমাজের কাছে আসতে পারেনি। কটকের 'উৎকল সাহিত্য সমাজ' ১৩২৩ সালের মাঘ মাসে কবিকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন। 'সহকার' সাহিত্য পত্রিকা ১৩৪৬ সালের বিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় নবকিশোর দাসের 'পূরবী ও কবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হয়। সেই বছর 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ওড়িশার অতিথি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে ১৩৪৬ সালের মাঘ দশম সংখ্যায় 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পটি ওড়িয়া ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়। 'পারলাখেমুন্ডির সাহিত্য সমিতির আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্র ক্ষুদ্র গল্প অনুবাদ প্রতিযোগিতা'য় আর্তত্রাণ মিশ্র এই গল্পের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন।'[২০]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর ওড়িশার সাহিত্যিক ও পাঠক সমাজের মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ওড়িশাবাসী বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সভা, আলোচনা চক্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোকদিবস পালন করেন। 'দৈনিক সমাজ' 'প্রজাতন্ত্র' 'সহকার' ও 'উৎকল সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ও কবির সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন করে। 'সহকার' পত্রিকায় (১৩৪৮, আষাঢ়-শ্রাবণ) তাঁর 'রবীন্দ্র তর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেদনাসিক্ত অন্তরে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন কবি দেবেন্দ্র কুমার সিংহ। গীতাঞ্জলি, নৌকডুবি, চোখের বালি, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, বলাকা, সোনার তরী, প্রাচীন সাহিত্য, ভানুসিংহের পদাবলী, চণ্ডালিকা, বাঁশরী, চয়নিকা, ঘরে বাহিরে, বৌ ঠাকুরানীর হাট, কড়ি ও কোমল, পূরবী, বিসর্জন, নটীর পূজা, জীবনস্মৃতি, যাত্রী, তাসের দেশ, কল্পনা, স্বদেশ, সঞ্চয়, ডাকঘর, গোরা, রাজর্ষি, কথা ও কাহিনী, গল্পগুচ্ছ, বিশ্ব পরিচয়, পঞ্চভূত, সাহিত্যের পথে, ব্যঙ্গকৌতুক, চিরকুমার সভা, চতুরঙ্গ, প্রবাহিনী, বিচিত্রিতা, বীথিকা, শিশু ভোলানাথ, রাজা-প্রজা, ফাল্গুনী, অচলায়তন, বাল্মীকি প্রতিভা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি সৃষ্টি সম্ভারে বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বর্ণিত হয়েছে এই কবিতায়।

ওড়িশার রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আলোকর কবি রবীন্দ্রনাথ' নামক সংকলিত গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে বিভিন্ন

দেশের লেখকদের রবীন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ওড়িয়া অনুবাদ একত্রে সংকলিত করা হয়। পরবর্তীকালে সংকলক এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশ করেন। ওড়িশার গবেষক প্রাবন্ধিক কুশ নন্দ ও শান্তিসুধা নন্দ ১৯৮৫ সালে কটক থেকে প্রকাশ করেন। 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও ভক্তকবি মধুসূদন' নামক একটি বৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ওড়িয়া ভাষায় তুলনামূলক রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় গ্রন্থটি অনবদ্য। অপর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ 'রবীন্দ্র সমকালীন ওড়িয়া কবিতা'। এই গ্রন্থটির প্রকাশক হৃষিকেশ পন্ডা। ১৯৮৮ সালে কটকের ওড়িশা বুক স্টোর থেকে প্রকাশিত হয়। ওড়িয়া ভাষায় তুলনামূলক রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার গ্রন্থটির গুরুত্ব আছে। গ্রন্থকার গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় এবং ওড়িয়া কবি রাধানাথ রায় থেকে কুঞ্জবিহারী দাস পর্যন্ত কবিদের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্র কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অন্যতম উদ্যোক্তা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'Tagore in Orissa' একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওড়িশার সম্পর্ক নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা আছে। ''দৈনিক প্রজাতন্ত্র'এ গোরাচাঁদ মিশ্রের ওড়িশার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এবং তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উপর ধারাবাহিক লেখা বেরিয়েছে। ড. রাধানাথ রথের কবিতাও 'দৈনিক সমাজ' এ স্থান পেয়েছে।''[২১]

ওড়িয়া ভাষায় সবচেয়ে বেশী অনূদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য। বহু অনুবাদক 'গীতাঞ্জলি'র ওড়িয়া অনুবাদ করেছেন। কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর অল্প সংখ্যক অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ধারাটি রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে প্রতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শুধু 'গীতাঞ্জলি' নয় অন্যান্য রবীন্দ্রসাহিত্য ওড়িয়া ভাষায় অধিক পরিমাণে অনুবাদ ও চর্চা হতে থাকে। এই ধারাটি এখন পর্যন্ত সাফল্যের সাথে বহমান। রবীন্দ্রএ জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক গোপালচন্দ্র মিশ্র ১৯৬১ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রাঞ্জল ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের জন্য তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ শুভেচ্ছা পত্র প্রেরণ করেন। শুভেচ্ছা পত্রসহ গ্রন্থটি পরকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্র দাস কটকের মনমোহন প্রেস থেকে প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের শুভেচ্ছাবার্তাটি ছিল এইরূপ;

''To familliarise ourselves with his thought and writings and thus try to imbibe at least a part of his lofty idealism express in a equally lofty and excellent style; is the highest tribute we can pay to Tegore's memory. ''

১৯৭৬ সালে লীলা রায়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত নির্ভর বাংলা গ্রন্থটির অনুবাদক ক্ষীতিশ রায় 'রবীন্দ্রনাথ টাকুরঙ্ক জীবন চরিত' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ভারত সরকারের সূচনা ও প্রকাশক মন্ত্রালয়ের প্রকাশন বিভাগ থেকে অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ষোলটি অধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমে জীবন চরিত গ্রন্থটি বিন্যস্ত। পঁচিশে বৈশাখ, বাল্য বিদ্যালয় জীবন, পর্বত যাত্রী, নতুন কবি, বিলাত পথে, দিব্যদৃষ্টি, দেশপ্রেমী, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, গুরুদেব, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি বিষয় বিন্যাসের মাধ্যমে গ্রন্থটি উপস্থাপিত।

অনুবাদক ঈশ্বরচন্দ্র সামল ১৯৮৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি বালেশ্বর থেকে প্রকাশ করেন। শ্যামাপ্রসাদ বেহেরা। অনুদিত গ্রন্থটির ভুমিকা লেখেন ওড়িয়া কবি সচ্চিদানন্দ রাউতরায়। ভুমিকাংশটি এইরূপ;

''রবীন্দ্রনাথ টাকুরঙ্ক অনবদ্য গীতিগুচ্ছ 'গীতাঞ্জলি' পুস্তকর ওড়িয়া অনুবাদ পাঠকমন্ডলীস্কু উপহার দেইছন্তি। মূল বংলাকু ওড়িয়া ভাষান্তর করিবাকু বেলে শ্রী সামল সমস্ত প্রকার জড়তা এবং ভাষাগত অসুবিধা অতিক্রম করিবাকু চেষ্টা করিছইন্ত। মূল কবিতা গুটিকি গীতিধর্মী হোইথিলাকু তাঁহির প্রাসঙ্গিকতা, ধ্বনিসাম্য ভাষান্তরে রক্ষা করিবা প্রকৃতরে এক সঠিক কার্য্য। সুখর কথা শ্রী সামল প্রণীত গীতিকর সাংগীতিকতা রক্ষা করিবারে বেশ সফল হইছন্তি।''

শ্রী সামলের অনুবাদ কর্মটি যে সম্পূর্ণ ভাষানুবাদ তা অনুবাদক 'অভিজ্ঞতা' অংশে উল্লেখ করেছেন;

''গীতাঞ্জলি আজি দেশ বিদেশর বহু ভাষারে অনুবাদ হোইছি ও তারি মধ্য অনেক সমীস্যা হইছি। ওড়িয়া ভাষারে এ অনুবাদ করিবাকু পাই চেষ্টা করিচি। কবিস্কর মূল লেখার পরিবর্তন ন করি প্রকৃত ভাবে উপস্থাপন করিবা পাই, এহা পাঠক মানস্কু অনুপ্রণিত করিব বোলি আশা নেই প্রকাশ করিবার প্রয়াস করুছি।''

ওড়িশার লোককবি শ্রী কৃপাময় মহাপাত্র 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ করেন ১৯৯৩ সালে। এই গন্থটি প্রকাশ করেন শ্রী সুবলকিশোর মহাপাত্র। ওড়িশার কুর্লা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অনুবাদক হরপ্রসাদ রায় কটকের বালুবাজারের ফ্রেন্ডস পাবলিশার্স থেকে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ প্রকাশ করেন। পুরী থেকে অনুবাদক নারায়ণ সিংহ 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ প্রকাশ করেন ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে। গ্রন্থটির প্রকাশক ক্ষণপ্রভা সিংহ। পুরীর ইউনিভার্স প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। Song offerings থেকে W.B Yeats এর মুখবন্ধ বা ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি সহ মূল গ্রন্থের সমান্তরালে ওড়িয়া ভাষায় তা অনুবাদ করেছেন অনুবাদক নারায়ণ সিংহ। গ্রন্থটির প্রথমে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির শংসাপত্র মুদ্রিত করা হয়েছে। পাঠক পাঠিকা যাতে মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে ওড়িয়া অনুবাদটি পড়তে পারেন অনুবাদক তার জন্য এইরূপ পরিকল্পনা করেছেন। এই ভাবে বহু অনুবাদক বিভিন্ন সময়ে ওড়িয়া ভাষায় 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ করেছেন ও এখনও করে চলেছেন।

ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্র সৃষ্টির সমালোচনা

ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্য, জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, ব্রাহ্ম ধর্ম, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ইত্যাদিকে বিষয় করে নানা সময় ওড়িয়া ভাষায় বেশ কয়েকটি সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাৎসকি রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবং জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের লেখা প্রবন্ধ সমূহ সংকলিত রূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র সমালোচনামূলক গ্রন্থ এবং সংকলিত প্রবন্ধ গ্রন্থের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিম্নরূপ;

১৯৬০ সালে কটকের রেবেনস কলেজের অধ্যাপক শ্রী গঙ্গাধর বল 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' নামক একখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন শ্রীকান্ত কুমার রাউতরায়। কটকের বাঁকা বজারের রাউতরায় প্রকাশনী থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবি সাহিত্যিকের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখের মতো প্রাচ্য পণ্ডিতগণ অপরদিকে শেক্সপীয়ার, মিল্টন, ভলতেয়ার গেটে, টলস্টয়ের মতো পাশ্চাত্য কবি সাহিত্যিকবৃন্দ। গ্রন্থটির মধ্যে ওড়িয়া কবি জগন্নাথ দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ ও রাধানাথ রায়ের পাশাপাশি ৬১ সংখক্য পৃষ্ঠায় 'বিশ্বকবিব রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক এই প্রবন্ধে কবিগুরুর জীবন দর্শন, ধর্ম চেতনা, সাহিত্য ভাবনা, গীতাঞ্জলির স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং পিতৃ আদশে আদর্শায়িত রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিচালনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষেদিক ভাবনা ও বিশ্বমানবতাবোধের আদর্শ।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ অর্থাৎ ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মে বিশ্বভারতী ওড়িয়া সাহিত্য পরিষদ একখানি 'রবীন্দ্র স্মরণিকা প্রকাশ করেন। বিশ্বভারতীর তৎকালীন ওড়িয়া বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক ওড়িশার 'সমাজ' প্রকাশন থেকে স্মরণিকা গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। মোট বারো খানি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সূচীপত্রটি নিম্নরূপঃ

বিষয়

(প্রথম পর্ব)

শতবার্ষিকীর ভাবনা - শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস - ১

রবীন্দ্রনাথ - শ্রী গোপীনাথ মহান্তি - ১৬

রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা ওড়িয়া - শ্রী কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী -৩৯

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসাহিত্য - শ্রী কুঞ্জবিহারীদাস - ৪৬

রবীন্দ্রসঙ্গীত - শ্রী দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক - ৫৩

রবীন্দ্র চিত্রকলার গোটিএ দিগ - শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - ৫৯

জমিদার রবীন্দ্রনাথ - শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় - ৬৪
বুদ্ধিজীদ্ধি রবীন্দ্রনাথ - শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিশ্র - ৭১
রবীন্দ্রনাথঙ্ক নাটক - শ্রী শিবনাথ মহান্তি - ৭৯
(দ্বিতীয় পর্ব)
রবীন্দ্রনাথঙ্কর কেতোটি কবিতা - শ্রী বিনোদ রাউতরায় - ৮৭
কাব্যের উপেক্ষিতা - শ্রীমতী কমলা সাহু - ৯২
কর্তাঙ্ক ভুত - শ্রী শ্রীনিবাস মিশ্র - ১০০

ওড়িয়া সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি পদ্মভূষণ শ্রী কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তার কয়েকটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'কালিন্দীচরণ প্রবন্ধ সমগ্র' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মিশ্র কটক স্টুডেন্টস স্টোর থেকে ১৯৮৬ সালে। গ্রন্থটিতে মোট ২৯ খানি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধ দুটি এবং 'বঙ্গ উৎকল দুইটি ভাগিনী' শীর্ষক বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার তুলনালক প্রবন্ধ একটি, রবীন্দ্র বিষয়ক দুটি প্রবন্ধের মধ্যে ৬৯ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশ্বপ্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি চরণ উপস্থাপিত হয়েছে এইরূপ- 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গলা খুলি/জগৎ আসি তঁহি করুচি কোলাকুলি'। রবীন্দ্র সৃষ্টির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে। সোনার তরী, মানসী, চিত্রা, বলাকা ইত্যাদি কাব্যের বিশ্লেষণ যেমন করা হয়েছে পাশাপাশি নৌকাডুবি গোরা ইত্যাদি উপন্যাসের পর্যালোচনাও করা হয়েছে। কাবুলিওয়ালা গল্পটির প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। অপর প্রবন্ধটির শিরোনাম 'রবীন্দ্র গল্পের বিশেষত্ব'। এই প্রবন্ধটি ১৯৫৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কবিগুরুর তিরোধান দিবসে আকাশবানী কটক থেকে সম্প্রচারিত হয়। পরে প্রবন্ধটি 'কালিন্দীচরণ প্রবন্ধ সমগ্র'এ স্থান পায়। এই প্রবন্ধে নষ্টনীড়, মাস্টার মশাই, অতিথি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিতপাষাণ ও কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি ছোটগল্পের শিল্পরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক টলস্টয়, গোর্কি, চেকভ, ও হেনরি, বালজাক প্রমুখ বিশ্বনন্দিত ছোটগল্পকারের সমান সারিতে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়া 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক ড. তারিণীচরণ দাস। অধ্যাপক দাসের গ্রন্থটির নাম 'গীতাঞ্জলি এক বিশ্লেষণ'। ১৯৮৩ সালে প্রকাশক গোপীনাথ সাহু গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

ওড়িশা রিজিওনাল কলেজ ফর এডুকেশন' এর অধ্যাপক ড. বসন্ত কুমার পান্ডা ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৯৯ সালে ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত 'জাতীয় জীবন চরিতমালা'র গ্রন্থ বিশেষ। ড. পান্ডার এই গ্রন্থটি আসলে ১৯৭১ সালে কৃষ্ণকৃপালিনী রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থের ওড়িয়া অনুবাদ। এই অনূদিত গ্রন্থটি ড. পান্ডার শান্তিনিকেতন থেকে প্রাপ্ত

পি.এইচ.ডি ডিগ্রির গ্রন্থরূপ। গ্রন্থটির মধ্যে আলোচিত হয়েছে নানাবিধ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, যেমন বংশানুচরিত, কৌতুহলি শিশু, মুকুলিত কবি, হৃদয়ারণ্য, অন্বেষণ, কবিত্বর নবজন্ম, মাটির কাজ, জনগনর কবি, নিঃশঙ্ক পদাতিক, পাশ্চাত্যর মুখামুখি, দেশ ও বিশ্ব, অতিকায় ভারতীয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, যাত্রী দূত, শেষ ফসল, সূর্য্যাস্ত ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২০১১ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) থেকে 'Nameless Recognition' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং বিদেশি ভাষায় কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তার সৃষ্টি নিয়ে চর্চা হয়েছে প্রাবন্ধিকগণ তাদের প্রবন্ধে তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন স্বপন চক্রবর্তী। কলকাতা আনন্দমোহন কলেজের ওড়িয়া বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা 'Impact of Rabindranath on odia literature' শীর্ষক একটি ইংরেজি প্রবন্ধে ওড়িশার সাথে ঠাকুরবাড়ী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং ওড়িয়া সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব ও রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ কীভাবে চলছে সে সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন।

ওড়িয়া কবি কুঞ্জবিহারী দাশ কয়েকজন মহাপুরুষের জীবন নিয়ে ১৯৪৯ সালে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের ১৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথকে তিনি কীভাবে জেনেছেন ও চিনেছেন সে বিষয়ে কবি স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। এছাড়া এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যের ও চিত্রাঙ্গদা নাটকের মৌলকত্ব ও বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এইভাবে নানা জন নানা সময় ও উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ এবং ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যচর্চা করেছেন। নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে এপর্যন্ত ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার ধারাটি অব্যাহত আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই ধারাটির কালানুক্রমিকযুক্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপস্থাপন আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এরজন্য বিস্তর অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন এবং এটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। যদিবা সম্পূর্ণ নয় তথাপি গবেষকের পাঠানুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার একটি কালানুক্রমিক বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ

১. দুই বোন, চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, ১৯৫০
২. রবীন্দ্র গল্প চয়ন (নির্বাচিত গল্প), চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, ১৯৫০
৩. রাশিয়ার চিঠি, চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, ১৯৫১
৪. রক্তকরবী, প্রফুল্ল পট্টনায়ক অনূদিত, ১৯৫৭
৫. গীতাঞ্জলি, গোপালচন্দ্র মিশ্র অনূদিত, ১৯৬১

৬. রবীন্দ্রগল্প ও কবিতা সংকলন, রবি মহাপাত্র অনূদিত, ১৯৬১
৭. চিত্রাঙ্গদা, প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, ১৯৬১
৮. চার অধ্যায়, অশোক রাও অনূদিত, ১৯৬১
৯. একোইশ গল্প, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অনূদিত, ১৯৬১
১০. বিশ্বমানবের পথে, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অনূদিত, ১৯৬৩
১১. যোগাযোগ, গোপীনাথ মিশ্র অনূদিত, ১৯৬৬
১২. ঘরেবাইরে, সীতাদেবী খাড়ঙ্গা অনূদিত, ১৯৬৮
১৩. চোখেরবালি, চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, ১৯৭২
১৪. নিবন্ধমালা ১ম খন্ড (নির্বাচিত প্রবন্ধ), গৌরী কুমার ব্রহ্মা অনূদিত, ১৯৭২
১৫. শেষের কবিতা, সীতাদেবী খাড়ঙ্গা অনূদিত, ১৯৭৪
১৬. একোত্তর শতী (নির্বাচিত কবিতা), শচী রাউতরায় অনূদিত, ১৯৭৫
১৭. জীবনচরিত-ক্ষীতিশ রায় অনূদিত, ১৯৭৬
১৮. নিবন্ধমালা ২য় খণ্ড (নির্বাচিত প্রবন্ধ), চিন্তামণি বেহেরা অনূদিত, ১৯৭৭
১৯. পাঞ্চ নাটক (পাঁচটি নাটক), প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, ১৯৭৯
২০. গীতাঞ্জলি, ঈশ্বর চন্দ্র সামল অনূদিত, ১৯৮৩
২১. নৌকডুবি, বনজা দেবী অনূদিত, ১৯৮৩
২২. গীতাঞ্জলি, জগন্নাথ পাত্র অনূদিত ১৯৯১
২৩. গীতাঞ্জলি, কৃপাময় মহাপাত্র অনূদিত, ১৯৯৩
২৪. গোরা, রবীন্দ্রপ্রসাদ পন্ডা অনূদিত, ২০০২
২৫. গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত গল্প), রবীন্দ্রপ্রসাদ পন্ডা অনূদিত, ২০০৪
২৬. গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত গল্প), রবীন্দ্রপ্রসাদ পন্ডা অনূদিত, ২০০৬
২৭. গীতাঞ্জলি, নারায়ণ সিংহ অনূদিত, ২০০৯

ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্র সৃষ্টির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

১. স্রষ্টা ও সৃষ্টি (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ) গঙ্গাধর বল, ১৯৬০
২. রবীন্দ্র পূজা, সরলা দেবী, ১৯৬১
৩. Tagore in Orissa, Transleted (in odia) by Prabhat Mukhopadhya, 1961
৪. প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবন কথা, ভাবগ্রাহী মিশ্র অনূদিত, ১৯৬১
৫. আলোকর কবি (রবীন্দ্রনাথ নির্ভর), চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯৬১
৬. রবীন্দ্র স্মরণিকা, দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক সম্পাদিত, ১৯৬১
৭. আমার কবি (লীলা মজুমদার রচিত), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অনূদিত, ১৯৬৩
৮. সারস্বত গৌরব, জানকী বল্লভ মহান্তি, ১৯৮৩

৯. Tagore in Orissa, Transleted (in odia) by Prabhat Mukhopadhya, 1984

১০ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও ভক্তকবি মধুসূদন, কুশ নন্দ ১৯৮৫

১১. গীতাঞ্জলি এক বিশ্লেষণ, তারিণীচরণ দাস, ১৯৮৬

১২. রবীন্দ্র সাহিত্যরে বিশ্বপ্রেম (প্রবন্ধ), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, ১৯৮৬

১৩. রবীন্দ্র গল্পর বিশেষত্ব (প্রবন্ধ), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, ১৯৮৬

১৪. রবীন্দ্র সমকালীন কবিতা, হৃষিকেষ পন্ডা, ১৯৮৮

১৫. Tagore in Orissa, Transleted (in odia) by Prabhat Mukhopadhya, 1999

১৬. Impact of Rabindranath on odia literature, K.C. Bhunia, 2011

ওড়িশার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এবং ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক অনেকটা নিবিড়। রবীন্দ্র চেতনা ওড়িশার শিল্প ও সাহিত্য জগতে বিপুল সাড়া ফেলেছে এবং ওড়িয়া সাহিত্য সংস্কৃতি রবীন্দ্র ভাবনাকে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদের সাথে সাথে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওড়িয়া ভাষান্তর বিপুল পরিমাণ চলছে। বিশ্বভারতীয় ওড়িয়া বিভাগের অধ্যাপক এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ওড়িয়া সাহিত্যের সাথে রবীন্দ্রসাহিত্যের তুলনামূলক চর্চা ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ করে চলেছেন। কটকে স্থিত 'উৎকল সাহিত্য সমাজ' রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে থাকেন। আমাদের বিশ্বাস ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্র চর্চার এই ধারাটি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য:

১. বিষ্ণপদ পান্ডা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সম্পা, বুদ্ধদেব চৌধুরী, প্রত্যয় প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩০

২. অবন্তী দেবী, ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ, পৃষ্ঠা ঃ ১২২

৩. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৪১৭, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬

৪. মৃণালকান্তি দাস, প্রগতি ভাবনা ঃ বাংলা কবিতা ও ওড়িয়া কবিতা, দে পাবলিকেশনস ২০১৩, পৃষ্ঠা ঃ৮৯

৫. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৭ পৃষ্ঠা ঃ ৮৬

৬. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, 'সমাজ পত্রিকা, বর্ষিক সংখ্যা, ১৯৭৬ জুন, পৃষ্ঠা ঃ ২৩

৭. মৃণালকান্তি দাস, প্রগতি ভাবনা ঃ বাংলা কবিতা ও ওড়িয়াক্ষ কবিতা, দে পাবলিকেশনস ২০১৩, পৃষ্ঠা ঃ ১০০

৮. সুমিতা চক্রবর্তী, বাংলা আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৬

৯. অন্নদাশঙ্কর রায়, সবুজপরী (কবিতা), সবুজ অক্ষর, পৃষ্ঠা ঃ ২৯

১০. মায়াধর মানসিংহ, ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থমন্দির, কটক, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭

১১. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৭ পৃষ্ঠা ঃ ৮৭

১২. পশ্চিমবঙ্গ (পত্রিকা), ৮ই মে ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ১

১৩. দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক প্রজাতন্ত্র (ওড়িয়া সংবাদ পত্র), ৩১ জুলাই, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ঃ ২

১৪. কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, অঙ্গে যাহা নিভাইছি (আত্মকথা), কটক স্টুডেন্টস স্টোর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪৫-৪৬

১৫. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৭ পৃষ্ঠা ঃ ৮৮

১৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯

১৭. বিছন্দ চরণ পট্টনায়ক, কবীন্দ্র বন্দনা (কবিতা), উৎকল সাহিত্য পত্রিকা ১৩৪৪, বৈশাখ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ৭

১৮. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৭ পৃষ্ঠা ঃ ৮৯

১৯. অন্নদাশঙ্কর রায়, শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ), 'সহকার' পত্রিকা, ১৩৩২, মাঘ-ফাল্গুন, সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ২

২০. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৭ পৃষ্ঠা ঃ ৯০

২১. কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৭ পৃষ্ঠা ঃ ৯১

1. Rabindranath Tagore, on the edges of time, page : 43

2. K.C Bhunia, Impact of Rabindranath on odia literature, Nameless Recognition, page : 17

3. Do

4. Do

5. Do

6. Do

7. Do

সুন্দরবনের পীর পালার গান

মলয় দাস*

দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যা সমগ্র মানবজাতির ঐতিহ্য হিসাবে পরিচিত। এ বনের অপরূপ সৌন্দর্য, সমুদ্র মোহনায় শতাধীক ব-দ্বীপ অঞ্চল, সদা বয়ে যাওয়া নদীর জোয়ার-ভাটার টান এর সঙ্গে প্রকৃতির খামখেয়ালি, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, হিংস্র বাঘ-কুমিরের আক্রমন যেন এখানকার মানুষের জীবনে এনে দেয় এক দোলায়িত ছন্দ। চব্বিশ পরগণা তথা দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে এই অঞ্চলের লৌকিক দেব-দেবীর পূজাচার সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস-সংস্কার এবং আখ্যান-মূলক লোকায়ত পালাগানের সুবিপুল ঐতিহ্য। লোকায়ত পালাগানের উদ্ভব ও বিকাশের একটি অন্যতম আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যময় ক্ষেত্র চব্বিশ পরগণা। আদিম ও লোকলোকায়ত ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের লৌকিক পীরগাজী বিষয়ক পালাগানগুলির একদিকে যেমন ২৪ পরগণার ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ের মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে, তেমনি আছে তার সাহিত্য রসগত আবেদন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে যার মূল্য অপরিসীম।

সামগ্রিক বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে সুন্দরবন (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। চব্বিশ পরগণা জেলার ইতিহাস ও ভূগোলের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে নানা প্রকার সংস্কৃতির ধারা। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লোকস্কৃতির গৌরবময় স্থান অধিকার করেএবং যার বিশিষ্ট সম্পদ লোকায়ত পালাগান। দঃচব্বিশ পরগণার ভূমি সন্তান হিসাবে এই অঞ্চলের জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছে।

২৪ পরগণা তথা সুন্দরবনের 'পীর ও পালার গান' সম্পর্কে আলোচনা করলে যাঁর নাম সর্বাগ্রে করতে হয় তিনি হলেন 'মানিক পীর'। দঃ ২৪ পরগণার প্রচলিত লৌকিক দেব দেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পিরালী পালাগান হল মানিক পীরের গান।

মানিক পীর ঃ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত পিরুলীগান কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পীর সম্পর্কিত গানকে সাধারণত পিরুলীগান বলে, কিন্তু প্রচলিত অর্থ আরও ব্যাপক। পীর ও বিবি (পিবানী) তথা সমস্ত লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কিত পালাগানকেই সামগ্রিক ভাবে এই অঞ্চলের মানুষ পিরুলীগান বলে এবং এই গানের দলকে পিরুলীগানের দল বলে। 'পীর' হল ফার্সি শব্দ, যার অর্থ মুসলমানদিগের মধ্যে ঈশ্বর জানিত পুরুষ। তিনি

*শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, সাহাপুর হরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)।

কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং সবার নিকট অতিশয় মান্য ব্যক্তি বলে চিহ্নিত থাকেন। তিনি পুন্যাত্মা, মহাপুরুষ বা মুসমান সাধু। 'আলী' আরবী শব্দ, যার অর্থ হল উন্নত বা উদার। সুতরাং 'পীর আলি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল উদার মুসলমান সাধু। এঁদের সম্পর্কিত গান ভাষান্তরে পিরালীগান নামে লোকসমাজে প্রচলিত। অখন্ড চব্বিশ পরগণায় মানিক পীরের বহু স্থান দৃষ্টি হয়। মানিক পীরের একক স্থান যেমন আছে তেমনি অন্যান্য লৌকিক দেব দেবীর সাথে মানিক পীরের মূর্তি পূজিত হয়। মানিকপীর যে ভাবেই পূজিত হোন না কেন তাঁর অবয়ব সম্পর্কে চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে যে ধারণাটি সুস্পষ্ট তা অনেক পালাগানের মধ্যেই নিহিত আছে যেমন–

মাথায় রঙিন টুপি বোধের জাম্বিল
হাতে লয়ে আশাবাড়ি ফেরে মানিকপীর।

পীরের বেশভূষা বাদ দিলে গুণ ও মহিমার বিচারে মানিকপীরের তিন রকম পূজা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমতঃ পীরের মূর্তিপূজা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর নিরাকার পূজা ও তৃতীয়ত পীরের প্রতীক পূজা। মানিক পীর যে মূর্তি পূর্জিত হয় তা হল – পীরবৃষ বা বলদের পৃষ্ঠে আরূঢ়। চেহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান যুবকের মত। পরনে কুর্তা, মাথায় টুপি পায়ে নাগরা জুতো, হাতে আশাদন্ড ও ব্যাধির জাম্বিল (রোগ পাত্র)'। মানিক পীর সুন্দরবনে বসবাসকারী সব সম্প্রদায়ের গৃহে নানা আচার আচরণ সহ পূজিত হন। মানিক পীরের মাহাত্ম জ্ঞাপক পালা গান সমুহ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট অতিশয় প্রিয় এবং পালাকারগণও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। একই আসরে বসে হিন্দু মুসলমান মানিক পীরের পালা শ্রবণ করেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। সতবার মানিকপীর মিশ্র সংস্কৃতিজাত লৌকিক দেবতা সে সম্পর্কে কোন সংশয় নেই।

সুন্দরবন তথা ২৪ পরগণাঃ বিশেষ জনপ্রিয় গানহল মানিকপীরের গান। এই অঞ্চলে এই গানের তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। যা নিম্নরূপ।

মানিক পীরের ধারা

গইলে গান বা গোয়ালে গান, পথে গান বা মানিকপীরের ফকিরি গান, আসর করে গান বা পালা গান।

প্রথমত গইলে গান বা গোয়ালে গান। এই গানের গায়ক মুসলমান, কদাচিৎ হিন্দু। দ্বিতীয়ত রাস্তায় গান বা ফকিরি গান, এই গানের গায়ক কেবল ফকির বেশধাবী মুসলমান। তৃতীয়ত আসর করে গান বা পালাগান। এই ধারার গায়ক হিন্দু মুসলমান উভয়ই, বরং বলা যায় তুলনা মূলকভাবে হিন্দু বেশি। মানিক পীরের গানের তৃতীয় ধারাটি ২৪ পরগণায় অর্থাৎ সুন্দরবনে অতিশয় জনপ্রিয়। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পালাগায়ক মানিকপীরের পালাগান করেন। এরা সাধারণত রাতের বেলায় অথবা বিকাল থেকে গান শুরু করেন। একজন মহড়া বা মূল গায়ক থাকেন আরও কমপক্ষে তিনজন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে থাকেন ও মূল গায়কের দোহার গান করেন।

মানিকপীরের চারটি কাহিনী যুক্ত পালাগান ক্ষেত্রানুসন্ধানে সংগৃহীত হয়েছে।

(১) কিনু ঘোষ (২) রঞ্জন বিবি (৩) মুরদ কাঙাল (৪) সুরত বাদশা , মানিকপীরের যে সমস্ত লিখিত পুঁথির পরিচয় জানা গেছে তা নিম্ন রূপ–

(ক) মানিক পীরের কেচ্ছা-মুনশী মোহম্মদ পিজিরুদ্দিন

(খ) মানিক পীরের গীত - ফকির মোহম্মদ

(গ) মানিক পীরের জহুরানামা - জয়রদ্দিন

(ঘ) মানিক পীরের গান - নয়ব শহীদ

মানিক পীরের গানের একটি বিখ্যাত পংতি হলো

''মুশকিল আসানকর দয়াল মানিকপীর।

বড়পীর সাহেব ঃ চব্বিশ পরগণা তথা সুন্দরবনে জনপ্রিয় পালাগানের মধ্যে লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালাগানের মধ্যে বড়পীর সাহেবের লোকায়ত পালাগান অন্যতম। সুন্দরবনের লোকসমাজে বড়পীর সাহেব বহু পূজিত এক লৌকিক দেবতা। সুন্দরবনে বড়পীর সাহেবের নামে যে পালাগান প্রচলিত আছে তা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা বড়পীর সাহেবের পালা, এরেনশা বাদশার পালা, সুরজ জামালের পালা ইত্যাদি। নাম ভিন্ন হলেও পালার বিষয়বস্তুর তেমন কোন পরিবর্তন নেই।বড়পীর সাহেবকে নিয়ে যে ফকিরি গানের প্রচলন আছে তাকে অনেকে 'বড়পীর সাহেবের অকেয়া' বলে। তাঁর পিতার নাম হজরত আবু সালেই মুশা জঙ্গী এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফতেমা। ইংরাজী ১০৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বা ৪৭০ বা ৪৭১ হিজরীর ১লা রমজান ইরানের জ্বিলান জেলার নীপ নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি অলির সম্মান পান।

চব্বিশ পরগনার বা সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় বড়পীর সাহেবের বহু কাল্পনিক দরগা আছে। জয়নগর থানার শান্তিপুর গ্রামে বড়পীর সাহেবের থান খুবই জাগ্রত। চব্বিশ পরগণায়গুলির মধ্যে বড়পীর সাহেবের পালা খুবই জনপ্রিয়। এই অঞ্চলে পিরুলী পালার দুটি ধারা প্রচলিত আছে। যা নিম্নরূপ–

পিরালী গান– পালা গান , কাওয়ালীগান

দুই ধারতেই বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম কীর্তিতহয়। সুন্দরবন-ঘেঁষা অঞ্চল গুলিতে বড় পীরের পালাগানের প্রচলন খুব বেশি। এই অঞ্চলে যত পালাগায়ক আছেন, অধিকাংশ পালাগায়ক এই পালাটি গান করেন।

বড়পীর সাহেবের কাওয়ালীগানের ধারা প্রত্যক্ষ করা যায় সাধারণত মুসলমান ফকির বা কাওয়াল দিগের নিকট। তাঁরা পালাগানের পরিবর্তে কাওয়ালী সুরে বড়পীর সাহেবের পালা বিভিন্ন পীরের দরগায় গান করেন। বড়পীর সাহেবের কাওয়ালীগানকে 'বড়পীরের ওকেয়া' বলা হয়।

বড়পীর সাহেবের অকেয়া

আমায় ভুলোনা ভুলোনা শেষের দিনেতে ওগো গহপিয়া।
তোমা বিনা কেহ নাই তোমার কীছে ভিক্ষা চাই

তোমা বিনা গতি নাই, এই তুফান ঘেরা দুনিয়াতে।
আমি চাইনা হতে হজের হাজি ইচ্ছা নাই মোর হতে গাজী
দোজকে আমি যেতে রাজি কান্নাতে যদি না পাই ঠাঁই।
তোমার নাম নিতে নিতে দুনিয়া হতে চলে যাই।।
আমি জেনেশুনে করেছি পাপ কত যে তার নাইকো হিসাব
কেমন করে দেব হিসাব, তাই ভাবি যে মনেতে।।

২৪ পরগণা তথা সুন্দরবনে বড়পীর সাহেবের যে লোকায়ত পালাগানটি প্রচলিত আছে তা এ অঞ্চলে অনেক পালা গায়ক গান করেন এবং পালাটি খুবই জনপ্রিয়। যেমন একটি গানে এরেনশা বাদশা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

''করকি কর কি একি দেখি, ফকিরের বেশ কেন ধরেছ।
ত্যেজে রাজ আভরণ কিসের কারণ তগদীর গলে কেন পরেছ?
রাজ্যধন সকল ছাড়িয়ে কোথায় যাবে আমায় ফেলে
আমায় অনাকিনী করবে এই কি মনে ভেবেছ''?

আবার আর একটি গানে বড়পীর সাহেব সম্পর্কে বলতে শোনা যায়–

''এমন গুণের দয়াময় দেখিনি কোথাও গো
মরাছেলে বাবা আমার বাঁচাইয়া দেয় গো
সেই বাবার নামে যদি মাঙন কর দান গো
যে যেভাবে ডাকবে তারে ডাকের সাড়া দেবে গো।

পালাগান চলাকালীন ক্ষেত্রবিশেষ পালা গায়ক মঙ্গলপাত্র হাতে নিয়ে শ্রোতাদের নিকট হতে কিছু পয়সা মাঙন করেন। একে 'প্যালা তোলা' বলে। পরিশেষে মূলগায়ক, দোহার ও শ্রোতাগণ সমস্বরে বড়পীর সাহেবের জয়ধ্বনি দেন এবং আসর ভঙ্গ হয়।

সত্যপীর ঃ সত্যপীর সুন্দরবনের লৌকিক দেবতাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা। সত্যপীরের পরিচয় সম্পর্কে লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ নানামত পোষণ করেন। কেউ বলেন সত্যপীর মিশ্রসংস্কৃতির লৌকিক দেবতা, কেউ বলেন ইনি ঐতিহাসিক ব্যাক্তি, আবার কেউ বলেন ইনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক পীর। কিংবদন্তী অনুসারে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন। শাহের কোন এক কন্যার গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারো মতে বাগদাদের বিখ্যাত সুফী সাধক মনসুর আল্ হাল্লাজ যিনি নির্দ্ধিধায় 'আমিই সত্য' ঘোষনা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনিই নাকি মূল সত্যপীর। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন 'বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন হেতু হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারতা অবলম্বন করেছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্র দেবতার আবির্ভাব সেই উদারতার ফল''।

সুন্দরবনের মানুষজন বিশ্বাস করেন, সত্যপীরের নিকট শিরণির মানত করে কোন মনস্কামনা করলে সত্য নারায়ণ তা পূরণ করেন। এই বিশ্বাসে বেকার যুবক চাকরি পাওয়ার জন্য মানত করেন, কেউ মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভের জন্য মানত করেন,

ভূমি ক্রয় করে বাবা সত্য নারায়ণের পূজা দেন, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে শিরণি দেন, কোন হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরে পেলে শিরণি দেন, সন্তানহীন সন্তান কামনা করে সত্যপীরের নিকট মানত করেন, গৃহে অশান্তি, রোগপীড়া, শত্রুভয় ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতেও মানুষ সত্য নারায়ণের নিকট শিরণির মানত করেন ও মনস্কামনা পূর্ণ হলে শিরণি দিয়ে মানত চুকোন।

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কালসরা নামক গ্রামে সত্যনারায়ণের দরগা আছে। সেটেলমেন্ট রেকর্ডে (১৯২৮-৩১) এর সত্যতা মেলে। আমুমানিক তিনবিঘা জমির উপর এই দরগাটি আছে। বজবজ থানার বাওয়ালী গ্রামে সত্যপীরের স্থান আছে। দঃ২৪ পরগণা জেলার পাথর প্রতিমার পূর্ব সুরেন্দ্রনগর গ্রামে একটি সাধারণ স্থানে বিভিন্ন দেব-দেবীর সাথে সত্যপীরের একটি মৃন্ময় মূর্তি আছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা তথা সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান থেকে সত্যপীরের পালাগান ও মুদ্রিত পাঁচালি সংগ্রহীত হয়েছে। এর মধ্যে সোনারপুর থানার কুসুম্বাগ্রামের আবদুল জব্বার গায়েনের নিকট হতে একটি স্যতনারায়ণের পালাগান, অক্ষয় লাইব্রেরী হতে প্রকাশিত 'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা' বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রমেশ্বরী-সত্যনারায়ণী কথায় দুটি কাহিনী আছে। একটি কাহিনী শঙ্করাচার্যের ভনিতাযুক্ত, অপরটি দ্বিজরামের ভণিতাযুক্ত। দ্বিজরামের ভণিতাযুক্ত পালাটি এই অঞ্চলের অনেক পালাগায়ক সত্যনারায়ণের পালা হিসাবে গান করেন।

সত্যপীরের গানের আসরেরনিয়ম ঃ- সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায় গায়ক প্রথমে আসরে আশাদন্ড পুঁতে তার সামনে মোকাম পাতেন। তারপর গায়ক ধূতি পাঞ্জাবি বা লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরে হাতে চামর নিয়ে গান শুরু করেন। মূল পালায় প্রবেশের আগে মালিকের নামের সাথে হাসান-হোসেন, মা-ফতেমা, আলি কুরমুল্লা, অজয়, মুসলিম ধর্মের বিশেষ সাধক যাঁরা সাধনাবলে উপরওয়ালাকে রাজী করিয়েছেন, তাঁদের নাম স্মরণ করেন। এর পর সত্যপীর বাবাকে আসরে উপনীত হওয়ার জন্য প্রার্থনামূলক গান করে পালায় প্রবেশ করেন।

সুন্দরবনে সত্যপীরের পালা গায়ক বর্তমানে কম হলেও কাওয়ালী সুরে অনেকেই পীরের মাহাত্ম কীর্তন করেন, এ ছাড়া পূজা বা শিরণিকালে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত নিজেই সত্যপীরের পাঁচালি পাঠ করেন। সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় যে, সুন্দরবন তথা দুই ২৪ পরগণাঃ লোকসমাজে মিশ্র সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আবর্তে সত্যপীরের পূজাহাজত এবং লোকায়ত পীরপালা জনপ্রিয়রূপে প্রচলিত আছে।

বাড়ির মঙ্গলের জন্য সত্যপীরের গান ঃ

যে জন তো নামে বাবা গান হাজত দেয়
কৃপা করে বাবা সত্যপীর রাখিবে বজায়।
যে জন তো নামে বাবা দান করে যায়
দয়ার সত্যপীর বাবা কৃপা করবে তায়।

এই স্থানে উপনীত হয়ে যতজন
সবার প্রতি কৃপা করবে সত্যপীর হয়ে একমন।

গোরাচাঁদ পীর ঃ- উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাড়োয়া নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পীর গোরাচাঁদের স্মৃতি। ইনি গোরাইচাঁদ নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম মক্কায় ৬৯৩ হিজরীর ২১ রমজান। আনুমানিক ১৩২০-১৩২২ সালের মধ্যে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সময় পীরগোরাচাঁদ ২১ জন বীরভ্রাতা সঙ্গে নিয়ে আসেন বালান্দা পরগনায়। পীর গোরাচাঁদ মারা যান ১৩৭০ সালে। তখন তার বয়স আশি। কুলটী বিহারী গ্রামে কালু ঘোষের গৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁকে হাড়োয়ায় এনে সমাহিত করা হয়েছিল। সমাধির উপর মসজিদ নির্মাণ করিয়ে দেন গৌড়ের শাসনকর্তা আলাউদ্দিন।

পীরগোরাচাঁদকে নিয়ে অনেক কবি পালাগান রচনা করেছেন। তার মধ্যে মুনশী মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ সাহেব প্রণীত 'গোরাচাঁদ পীরের কেচ্ছা' নামে বহু পুরাতন একটি মুদ্রিত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। গোরাচাঁদ পীরের মাহাত্ম কাওয়ালী রীতিতে গান করেন উত্তর ২৪ পরগণার বকজুড়ি গ্রামের বিখ্যাত কাওয়াল রফিকূল ইসলাম ও শহীদূল ইসলাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুসুম্বা গ্রামের আবদুল জব্বার গায়েন ও পাটিকেল পোতার আব্দুল ফকির কাওয়াল প্রমুখ শিল্পীগণ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কোন কোন গায়ক গীতিনাট্যের ধারায় পালাগান হিসাবে এই পালা আসরে উপস্থাপন করেন। গোরাচাঁদ পীরের পালায় গোরাচাঁদ পীর রাজরোষ বা রাক্ষসের হাত থেকে আর্ত মানুষকে রক্ষা করেছেন। এ ছাড়া সমাজ কল্যাণমূলক কাজও তিনি করেছেন, যেমন বিশাল এক দীঘি কাটাবার ব্যবস্থা করে তিনি মানুষের জলকষ্ট দূর করেছেন। পীরমোবারক গাজী ও অনুরূপ একটি দীঘি কাটিয়ে মানুষের তথা সমাজের উপকার সাধন করেছেন।

পীরগোরাচঁদের পালার একটি গান ঃ

''গারাই কহেন মেরা দিল্লীতে মোকাম।
কুফরি তুড়িয়া ফিরি এই মেরা কাম।।
পয়দা ছৈয়দ কুলে গোরাই নাম ধরি।
তুড়িয়া কুফর যত মুসলমান করি।।
আকানন্দ বাকানন্দ হাতীগড় বাসি।
মারিতে তাদের তরে এত দূর আসি।।

তথ্যসূত্রঃ

১. চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা - ডঃ দেবব্রত নস্কর

২. ২৪ পরগণাঃ উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন - কমল চৌধুরী।

বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ

মিজানুর রহমান*

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন

''এক আলালের ঘরের দুলাল গাড়ির মধ্যে জেগে
বাংলাদেশের পাতা ছিঁড়লো ভূগলের বই থেকে''

কবি দেশভাগের বেদনাকে খুব সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সামান্য কয়েকটি শব্দে। কবি দেশবিভাগ মেনে নিতে পারেননি, মেনে নিতে পারেননি সীমান্তের পাহারা। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা এমনভাবে রক্তের বিনিময়ে, দ্বিখণ্ডিত করণের মাধ্যমে আসবে কেউ ভাবতে পারেনি। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করা হল। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হল। হাজার হাজার বাঙালি তাদের ঘর বাড়ি ফেলে উদ্বাস্তু জীবনকে সঙ্গী করে আশ্রয় নিল ভারতে। এন্যদিকে ভারত থেকেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আশ্রয় নিল পাকিস্তানে। পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাদের মনে হল তারা অপরের দেশে এসেছে। ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার উদ্বস্তু ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে আসলে তাদের বলা হল, তারা স্বাধীন ভারতে অবঞ্চিত, অতিরিক্ত, তারা বিদেশী উদ্বাস্তু। তারা পেছন ফিরে দেখতে চেষ্টা করল স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদানের কথা। হাজার হাজার মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর খুঁজতে লাগল, কোন স্বাধীনতার জন্য তারা এতকাল সংগ্রাম করেছিল। যাই হোক ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট জন্ম হল পাকিস্তানের, আর ১৫ই আগষ্ট জন্ম হল স্বাধীন ভারতের। বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে ভূখণ্ড ও জনগণের যে শতকরা হিসাব তা ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এই রকম ঃ

''র‍্যডক্লিফের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে এল ৩৬% এলাকা ও ৩৫% অধিবাসী। মুসলমানদের ১৬% পড়ে পশ্চিমবঙ্গে আর হিন্দুদের ৪২% পড়ে পূর্ববঙ্গে...পূর্ব পাঞ্জাব প্রায় সমগ্র পাঞ্জাবের ৩৮% ও জনসংখ্যার ৪৫% ভাগ ...লক্ষণীয় যে পাঞ্জাবের পড়ে ৬২% ভূভাগ ও ৫৫% অধিবাসী...।(১)

দেশভাগের সম্পূর্ণ হলে পূর্বপাকিস্তান থেকে দলে দলে সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মান-সম্মান বাঁচাতে দিশাহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করে। অন্যদিকে পাঞ্জাবের লাখ লাখ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এবং পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে অসংখ্য শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের বিপরীত দেকে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে আরম্ভ

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ।

করে। এছাড়াও পূর্ববঙ্গের পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সন্ত্রাস চালায়। বাধ্য হয়ে তারা ভারতে পালিয়ে আসে। এই উদ্বাস্তু আগমনের হার সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন;

''সরকারী সূত্রনুযায়ী ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে ৪২,৫৯, ৬০৪ জন মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়।...সমগ্র পশ্চিবঙ্গের জনসংখ্যার ১৩.৫৪ শতাংশই ছিন্নমূল মানুষ। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরেও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু এসেছে।'' (২)

আমাদের এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে এই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের ইতিহাস। ভারতীয় সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই কমবেশি এই নিপীড়িত মানুষের কথা স্থান পেয়েছে। আমরা এই অংশে বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগের ছবি নিয়ে শুধু আলোচনা করব। এই আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত লেখকদের প্রকাশিত গল্পগুলি। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগের প্রস্তুতি পর্বের কিছু গল্পের আলোচনা করতে পারি।

এই পর্যায়ের আলোচনায় প্রথম যে গল্পটির কথা উল্লেখযোগ্য সেটি হল সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নেড়ে' (১৩৩৮)। এই গল্পে পূজোর ছুটির পর এক ব্যক্তি স্বস্ত্রীক জাহাজে উঠেন। কুলি না পেয়ে বিপদগ্রস্থ সেই ভদ্রলোককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এক তরুণ। সে ভিড় ঠেলে মালপত্র জাহাজে তুলে দেয়। ভদ্রলোক তরুণের সঙ্গে রাজনৈতিক গল্প জুড়ে দেন। মহাত্মা গান্ধীর খদ্দের পরিধান ও ছুৎমার্গ পরিহারের অনেক উপদেশ দেন। তিনি বলেন, সে একেবারে ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না। মুচি মসুলমান যেহেতু মানুষ, তাই তাদের সঙ্গে একত্রে আহারে আপত্তি নেই। আলাপচারিতার মধ্যে ভদ্রলোক তরুণের মুখে জোর করে খাবার গুঁজে দেন। গন্তব্যে পৌঁছে ব্যস্ততার মধ্যে নামার সময় ভদ্রলোক তরুণের নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন সে মুসলমান। মুহূর্তে ভদ্রলোকের চেহারা বদলে গেল। 'আপনি' থেকে তরুণকে 'তুমি' বলতে লাগল, জাত নষ্ট করার জন্য তরুণকে গাল দিয়ে এবং খাবার সময় পরিচয় গোপন করার জন্য বকতে শুরু করলেন। তরুণ ভদ্রলোককে গল্পের সময় জাত না মানার কথা মনে করিয়ে দিলে, ভদ্রলোক আরো রেগে বললেন ''আলবৎ মানি। সাত পুরুষ মেনে এসেছেন আর আমি মানি নে। আবার প্রাচ্চিত্তির ফেরে ফেললে। হতভাগা নেড়ে!'' -(৩) মুজতবা আলীর প্রথম প্রকাশিত এই গল্পটি প্রমান করে বিভাগপূর্ব সময়ে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল।

মনোজ বসুর দুটি গল্পে দেশবিভাগ পূর্ব হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পকারের 'ইয়াসিন মিঞা' গল্পে ইয়াসিন মিঞার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে জাতি ভেদ নেই। জাতিভেদ আছে ধনী দরিদ্রের মধ্যে। ইয়াসিন গল্পের শেষে বুঝেছে স্বার্থপরতা আর গরিব ঠকানোতে ভিনজাত বারিধি সেন, নন্দা সেন,

রজনীকান্ত এবং জাতভাই কাজি সাহেবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শেষে ইয়াসিন অনুধাবণ করেছে সেই সাধুচরণই প্রকৃত পক্ষে তার জাতভাই।

মনোজ বসুর 'হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা' গল্পে দেশভাগের পূর্ববর্তী সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। বিপিন রাজনৈতিক কর্মী। সে দুবছর জেলে থাকার পর মুক্ত হয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রামে ফেরার সময় আহমদ মাঝির কাছে শুনল নদীর দুই পারে হিন্দু মুসলমানের গ্রামে দাঙ্গা বেঁধেছে। অন্ধকারে বিপিন বাড়ির কাছে খেতে নিজের ছেলের ছোঁড়া ইটের আঘাতে আহত হল। বিপিন বুঝতে পারে দিন হলে ছেলে ইট ছুঁড়তো না তার দিকে। তাই লেখকের আশাবাদী উচ্চারণ ''পূর্বে ফরসা দিচ্ছে, সূর্য উঠছে, মানুষ মানুষকে চিনবে, ঐসব পোড়া ঘর-বাড়ির ছাইয়ের গাদায় ফুল ফুটে উঠবে।" - (৪)

সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটি ঢাকার সাম্প্রদায়িক পটভূমিতে লেখা। গল্পে দেখান হয়েছে দাঙ্গার সময় কিভাবে সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে সম্পৃতি থাকার পরেও দাঙ্গার শিকারে পরিণত হয়। দাঙ্গা বিদ্ধস্ত ঢাকা শহরে এক পুরানো গলির সন্ধিস্থলে দুই দিক থেকে দুজন ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ এক জায়গায় মিলিত হল। দাঙ্গার অবিশ্বাসের বাতাবরণে কেউ কারো জাত ধর্ম সম্পর্কে জানায় না। কারণ অন্যজন অপর ধর্মের হলে প্রাণ যাবে। ক্রমে তারা একে অপরের কাছে এসে জানতে পারে, তারা হিন্দু ও মুসলমান। একজন ণারায়ণগঞ্জের সুতাকলের মজুর, অপরজন বাদামতলি ঘাটের মাঝি। তারা একে অপরকে প্রশ্ন করে ''আমি জিগাই, মারা মারি কইরা হইব কী। তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা মরব, তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব।"-(৫) এর পর তারা বিশ্লেষণ করে উঁচুতলার নেতাদের জন্য এই দাঙ্গা হয় তা ব্যক্ত করে। পরে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ দুটি মানুষ আদাব জানিয়ে বিদায় নেয়। একটু পরে মাঝির মৃত্যু হয় গুলিতে। এই মৃত্যু দাঙ্গাবাজদের গুলিতে নয়, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ডাকাত সন্দেহে। গল্পে দুজনের কোন নাম নাই। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে সমরেশ বসুর প্রথম রচনা 'আদাব' গল্পটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

এছাড়াও স্বাধীনতা পূর্ব ছোটগল্পগুলির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পতাকা' সোমেন চন্দ্রের 'দাঙ্গা' সামসুদ্দিন আবুল কালামের 'রক্তের স্বাদ' রশীদ করীমের 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, বজলুল হকের 'ভাগ না দিয়ে ভাগানো', অঞ্চলি দেবীর 'নবীন আশার খড়গ' ইত্যাদি গল্পগুলি দেশভাগের পূর্ববর্তী সময়ের অবস্থার বিশ্বস্থ বর্ণনা উঠে এসেছে।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দিশাহারা করে দেয়। সেই সময়ের রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পে সেই সব অবস্থার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'পুনশ্চ' গল্পটির কথা বলতে পারি। এই গল্পে দেশভাগের পর এক সধবা

নারী উমা ধর্ষিতা হয়ে নারী কল্যান সমিতির মাধ্যমে স্বামীর কাছে পৌঁছায়। স্বামী কিন্তু উমাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর ব্যবসায়িক বন্ধু উমার দিকে হাত বাড়ায়। উমা এই নিয়ে স্বামীকে অভিযোগ জানালে স্বামী উমাকে স্মরণ করিয়ে দিল, সে সতী নয়, সে ধর্ষিতা। তাই স্বামীই বাধ্য করল তার বন্ধুর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'লাঠিয়াল' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। পূর্ব বাংলার গণি মিঞার সাগরেদ নন্দ লাঠিয়াল। দেশভাগের পরে খিড়কি দুয়ার দিয়ে রাতের অন্ধকারে কলকাতা চলে আসে। পূর্ববঙ্গে থাকার সময় দোকান ঘর ভাঙতে উদ্যোত পুলিশের প্রতিবাদ করেছিল নন্দ। কলকাতাতেও তেমনি এক রাতে পুলিশের সামনে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা করে নন্দ। আগুন জ্বলে নন্দর বুকে, আর সে পালাবে না।

ঋত্বিক ঘটক নিজে পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। দেশভাগের পর বহরমপুর চলে আসেন। তিনি নিজে দেখেছেন উদ্বাস্তু মানুষের দুঃখ কষ্ট। সেই অভিজ্ঞতা আত্মকথন রীতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন 'স্ফটিক পাত্র' গল্পে। লেখকের অপর গল্প 'সড়ক'-এ শিকড়ছেঁড়া মানুষের দেশভাগ জনিত ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া ইসরাইলকে চলে যেতে হবে সেই দেশে, যেখানে কেউ তাকে চেনে না। পার্কসার্কাস এর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সন্তান এমদাদ মারা গেছে। এতদিনের ঘর বাড়ি একজনকে ছেড়ে দিতে হবে ভেবে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু একটু পরেই দেখা যায় পদ্মা পারের এক উদ্বাস্তুর কাছে নিজেই বাড়ির সব বুঝিয়ে দিয়েছে। গল্পে সে বলেছে ''তোমারে তো কইছিই বাবা, এই ঘর আমার পছন্দ না ...-(৬)

নির্মলেন্দু মান্নার 'নীড় ভেঙে দাও' গল্পটি ১৯৫০ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক পৌঢ় সারা জীবন সংসারের ঘানি টেনে এক সময় তার মনে হল নীড় বাধার স্বপ্ন ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। তাই তার ঘরে যখন দুটি চড়ুই পাখি নীড় বাঁধল তখন তা ভেঙে দেবেন মনস্থির করলেন। তার মনে হল ঘর না বাঁধলে অসীম আকাশে পাখি দুটো ডানা মেলে উড়তে পারবে। ঠিক সেই সময় পূর্ববঙ্গ থেকে দেশভাগের পরে দাঙ্গার মধ্যে পড়ে স্বামীকে হারিয়ে নিজের মেয়ে ফিরে আসে। ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন নীড় ভেঙে গেলে কেমন ব্যাথা লাগে। তাই বাসা অক্ষত রেখে দিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'গোপাল উড়ের লেন' গল্পে এক উদ্বাস্তু নারীর ট্রাজিডি স্থান পেয়েছে। পূর্ববাংলার ঝুমঝুমপুর গ্রামের নন্দরাণীর স্বামী হরিদাস থাকে কলকাতায় গোপাল উড়ের লেনে। সে ইলেট্রিক মিস্ত্রী। গ্রামে দাঙ্গা বাধায় সবার সঙ্গে স্বামীর ঠিকানা লেখা একখানা কাগজ নিয়ে কলকাতা আসে। স্থান পায় শেয়ালদা স্টেশনে। স্বামীকে খুঁজে দেবার নাম করে নন্দরাণীকে নিয়ে গিয়ে একটি লোক শেকল দিয়ে একটি ঘরে বন্দী করে অত্যাচার চালায়। জানালা দিয়ে নন্দরাণী এক ফেরিওয়ালাকে ডেকে অবস্থার

কথা জানাতে বলল স্বামীকে। স্বামীর নাম নেওয়া স্ত্রীর বারণ, তাই স্বামীর নাম নিল না। শুধু বলল গোপাল উড়ের লেনে মিস্ত্রী স্বামী থাকে। ফেরিওয়ালা গোপাল বাবুর লেন চেনে। নন্দরাণীকে কথা দিল সে তার স্বামী হরিদাসকে সংবাদ দেবে। সরলা বালিকা নন্দরাণী স্বামীর প্রতিক্ষায় থাকে। এক সময় দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পায়, ''নন্দরাণী চোখ কান মেলে রইল। হরিদাসই বুঝি আসছে। নন্দরাণীকে এমন আশ্বস্থ অথচ উৎকর্ণ অবস্থাতেই রেখে দিয়েছেন লেখক। সে যেন স্বামীর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, পাঠক জানে এ শব্দ কোন লম্পট লুণ্ঠন কারীর। যে মুহুর্তে সে নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষায় উদগ্রীব, তখনই প্রকৃত পক্ষে তার ভাগ্যে ঘনিয়ে আসছে ভয়ংকর পরিণতি।'' -(৭)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জত' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে এক মুসলমান ফকিরের কবর এবং হিন্দু ডাকাতে কালীর থান নিয়ে হিন্দু মুসলমানের ইজ্জতের লড়াই। গল্পে মুসলমান পাড়ার ধলা মন্তাই হিন্দু নমঃ শূদ্র পাড়ার জগন্নাথ ঠাকুরকে জানিয়ে গেল, এবার কালীর থানে পূজো চলবে না। জগন্নাথ ঠাকুরও ক্ষেপে উঠল। ধলা মন্তাই ও জগন্নাথ ঠাকুর দুজনই গরিব, পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। বাধ্য হয়ে দুজনই গেল গ্রামের মাতব্বর হাবিব মিঞার কাছে কাপড় চাইতে ইউনিয়ণ বোর্ডের সভাপতি হাবিব দিতে অস্বীকার করল। দাঙ্গা বাধবে জেনে হাবিব মিঞা খুব খুশি। এমন সময় হাবিবের ছোট স্ত্রীর মৃত্যু হল। রাত্রে সংবাদ পেল স্ত্রীর কবরে চোর হামলা করেছে। শোকার্ত হাবিব চোর ধরার জন্য কবরের কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই দেখল, ধলা মন্তাই ও জগন্নাথ ঠাকুর দুজন মৃতার কাফন চুরি করছে। লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন ইজ্জতের লড়াই প্রকৃতপক্ষে ঘরের ইজ্জতের লড়াই।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন খুব বেশি হয়। ১৯৫০ সালে 'নেহেরু-লিয়াকত' চুক্তি সাক্ষরিত হলে উদ্বাস্তু আগমণ কমে যায়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে এ. কে ফজলুল হকের সরকারের পতন হলে হিন্দুরা ভয়ে আবার দেশত্যাগ করতে থাকে। এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের নিয়ে সমকালীন তরুণ লেখকবৃন্দ বিশেষ করে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মত শক্তিশালী লেখকরা গল্প লিখতে শুরু করেন।

পরিচয় পত্রিকায় ১৯৫১ সালে মিহির মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'জীবিকা' প্রকাশিত হয়। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয় গোবিন্দ। সে একটি উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে চাকুরী পায়। কিছু চাকুরীর মেয়াদা শেষ হয়ে আসছে দেখে মন খারাপ হয়। এমন সময় খবর আসে রুগী এসেছে। এই খবরে গোবিন্দ খুশি হয় যে আরো কিছুদিন চাকুরী থাকবে। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখে তারই একমাত্র শিশু সন্তানটি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। যেন তার অশুভ প্রার্থনার জবাব নিয়তি সাথে সাথে দিল গোবিন্দকে। গল্পে গোবিন্দকে বাঙাল বলে পাশের এক বৃদ্ধ অবজ্ঞা করে

বলেছে - ''মাগো মা, কোথাকার গতর খেকো বাঙাল এসে ছুটেছে-হাড় জ্বালিয়ে খেলে... চলে যা নারে বাপু।'' (৮)

কালী নাগ রচিত গল্প 'নবজাতক'' পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, দেশভাগের পর হিজলা গ্রামে দাঙ্গা বেধে গেলে মুষড়ে পড়েন বৃদ্ধ মইনুদ্দিন পণ্ডিত। এমন সময় পূর্ববঙ্গে একটা ভুল খবর আসে যে, হিন্দুস্থানে একটিও মুসলমান বেঁচে নেই। আগুনে ঘি পড়ার মত দাঙ্গা বেধে যায়। হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে মইনুদ্দিন পণ্ডিতের পুরনো ছাত্র আজিজ দাঙ্গাবাজদের হাতে প্রান দেয়। মইনুদ্দিন পণ্ডিত নিজেও যশোদা নামের এক সন্তানবর্তী তরুনীকে কন্যাস্নেহে আশ্রয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনা। জমিদার ইসমাইল চৌধুরীর গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে যশোদা নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। পাটাতনের নিচে লুকিয়ে রাখা যশোদার বাচ্চাকে কোলে তুলে গ্রামে ফিরে আসে মইনুদ্দিন পণ্ডিত। পণ্ডিত আশা রাখে এই সন্তান একদিন এর প্রতিশোধ নেবে।

শিশির কুমার লাহিড়ীর গল্প 'ঘর নেই' ১৯৫২ সালের 'দেশ' সপ্তাহিক পত্রিকায় বের হয়। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে সবছেড়ে কলকাতায় বস্তির একটি ঘরে স্থান নেয়। বাবা মার স্নেহের কথা আজ শুধু স্মৃতি। দমবন্ধ করা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাধুরীর যক্ষা রোগ হয়। এই পরিবেশেই দাদা বিয়ে করলে বেড়া দিয়ে ভাগ করে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। ভ্রাতৃবধু সন্তান সম্ভবা হলে, সোহাগিণী বধু স্বামীর কাছে বায়না ধরে, ঠাকুরঝির অন্য কোন ব্যবস্থা করার জন্য। কারণ মাধুরীর রোগ যদি বাচ্চার মধ্যে আসে তাই। দেশবিভাগের পটভূমিতে এক নিপীড়িত নারী যার কোনদিন ঘর আর হল না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে দেশভাগের চিত্র ধরা পড়েছে। লেখকের ১৯৫২ সালে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত গল্প 'বিদিশা' কে অনেকে উপন্যাস হিসাবে আলোচনা করেছেন। 'বিদিশা' গল্পে দেশভাগের পর তিন বোন বিদিশা, বীণা, ও বিনতির পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে জীবনযুদ্ধের কাহিনী স্থান পেয়েছে। লেখকের 'গন্ধরাজ' গল্প গ্রন্থের 'অধিকার' এবং 'নতুন গান' ও পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'মধুবন্তী' ও 'তিতির' গল্প চারটি দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অধিকার' গল্পটি দেশভাগের পরে ছিন্নমূল পরিবারগুলোর নতুন দেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত। কলকাতায় উদ্বাস্তু পরিবার গুলোর থাকার ব্যবস্থা হল শেয়ালদা স্টেশন, পাথরের পথের উপর, নয়তো অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় বাসের অযোগ্য রিলিফ ক্যাম্পে, বর্তমান সময়ের 'আচ্ছে দিন' শ্লোগানের মত সেই দিনও ''এও এক আচ্ছা তামাশা। দুদিন আগেও যারা পুরো পুরি মানুষ ছিল আজ তারা একরাশ ছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরোর মত মূল্যহীন।'' (৯) এর পর দেড় হাজার মানুষকে পাঠানো হল উত্তর বাংলার মরুপ্রান্তরে। সেখানে উদ্বাস্তুদের নিস্ফলা জমিতে ক্ষেতমজুরের কাজ দেওয়া হল। বিনে পয়সার মজুরীতে লাগানো হল। বাধ্য

হয়ে ট্রাক্টর নিয়ে জমি দখল করতে উদ্বস্তুরা এগিয়ে এল। গল্পটিতে সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মধুবন্তী' গল্পটিতে দেশভাগের বেদনার সাথে সাথে ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার শোনা যায়। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। নায়ক চিত্ত দত্ত পেশায় লেখক। খন্ডনগরে এক চায়ের নিমন্ত্রনে এসে হঠাৎ তার মনে পড়ে বরিশাল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা একটি পরিবারের কথা। মনে পড়ে বারো বছর আগে সেই পরিবারের মেয়ে জয়াকে এক রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় তাকে সাঁকো পার করিয়ে দিয়েছিলেন। হিজল গাছের তলায় দাড়িয়ে লেখক সেই মেয়ের কাছে কথা আদায় করেছিলেন অন্য কোথাও বিয়ে না করার। এতদিন পরে চিত্ত দত্ত ভাবলেন জয়া কি সে কথা মনে রেখেছে? সে কি সেই আগের মতই আছে? উত্তর খুঁজতে জঙ্গল আর ভাঙা বাঁশের সেতু পেরিয়ে প্রায় অন্ধকার জয়ার বাড়িতে পৌঁছালেন। জয়া আজ পরিনত নারী। উদ্বাস্তু শিশুদের পড়িয়ে আটদশ টাকা রোজগার করে, যা দিয়ে আধমন চাল হয়। চিত্ত দত্তের ফেরার সময় জয়া তাঁকে লণ্ঠনের আলোয় ভাঙ্গা সাঁকো পার করিয়ে দিল। এক মুহূর্তের জন্য লেখক চিত্ত দত্তের সেই বারো বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল। ইচ্ছে হল আবার জয়ার হাতটি ধরে পূর্বের কথা স্মরণ করানোর। কিন্তু পারলেন না, কারণ বারো বছরে তাদের সম্পর্কে অনেক দূরত্ব তৈরী হয়েছে। দুজনের পৃথিবী স্পন্দন আলাদা। বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যেতে পারলেন না পূর্বের অবস্থানে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিতির' গল্পটিও দেশভাগের কারণে মানুষের দূরত্ব বাড়ার কথা বলা হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তরেখা, মাঝখানে নো ম্যানস ল্যান্ড। পরিস্থিতি শান্ত থাকলে দুদেশের সীমান্তরক্ষীদের সাথে আলাপ আলোচনা কথা বার্তা হয়। এমন এক শান্ত সময়ে সীমান্তে দেখা হয় দুই দেশের দুই প্রহরীর। সুখলাল ভারতের প্রহরী ও জুলফিকার পাকিস্তানের প্রহরী। কিন্তু দেশভাগের আগে দুজনের শৈশব কেটেছে একই গ্রামে, ঝুমঝুমিয়া নামে এক ক্ষীণস্রোতা নদীর তীরে। কিন্তু দেশভাগ হওয়ার পর সেই গ্রামে ভাঙল মন্দির, ভাঙল মসজিদ, ঝুমঝুমিয়ায় ভেসে গেল অনেক লাশ, দুজন দুদেশে ছিটকে পড়ল। তার পর চাকুরী সূত্রে সীমান্তে দুই বন্ধুর দেখা। তারা এসে বসল নো-ম্যানস ল্যান্ডে। দুই বন্ধুর গল্পে বেরিয়ে এল সেদিন দাঙ্গা বাধিয়েছিল কামতাপ্রসাদ আর রজুব আলী। এখন তারা দুদেশেই ভাল অবস্থানে সুখে বাস করছে। জুলফিকার ও সুখলালের পরিবারের অনেকেই মরেছে। তাদের মনে হল তারা কত বোকা ছিল সেদিন। এমন সময় ঘাসের মধ্যে থেকে গোখরো সাপ বেরিয়ে সুখলাল কে কামড়াতে গেলে জুলফিকার সাপটিকে মেরে বন্ধুর প্রান বাঁচালেন। কিন্তু নো ম্যানস ল্যান্ড এর বাধা দুর করার ক্ষমতা কারো নাই।

প্রতিভা বসুর 'দুকূল হারা' গল্পের বিন্দুবাসিনী দেশভাগের পরেও ছোট তালুকদারী

নিয়ে এবং বিধবা পুত্রবধু ও দুই নাতনিকে নিয়ে পূর্ববঙ্গে রয়ে গেল। কিন্তু ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট চালু হলে বিন্দুবাসিনী ভারতে আর আসতে পারবেনা ভেবে এবং সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হবে এই ভয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসে। রাস্তায় সব হারিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থা হয়। ভারতে খোলা মাঠে রাত কাটিয়ে রিলিফের দুধ, গুড়, চিড়া সংগ্রহ করল লাইন দিয়ে। সন্ন্যাসী বেশে ভন্ড কেশবানন্দের খপ্পরে পড়ল। এর মধ্যে স্বরে এক নাতনি মারা গেল। চাকরীর লোভ দেখিয়ে কেশবানন্দ পুত্রবধুকে এক লম্পটের কাছে রেখে এল। সুন্দরী আর এক নাতনি কে 'বাস্তুহারার বেদনা' ছবির নায়িকা করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিক্রি করে দিল। শেষে বিন্দুবাসিনী কে সবার সাথে দেখা করার মিথ্যা কথা বলে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কেশব। গল্পে প্রতিভা বসুর লেখনীতে এক একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দেখা আমরা পেলেও এটাই বাস্তব।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্পটি দেশভাগ পরবর্তী হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের উপর রচিত। বৃদ্ধ বিপত্নীক রাজমোহন ওরফে ধলাকর্তা পাকিস্তান হলেও একাই রয়ে গেলেন। ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা চলে গেল। বৌমা চিঠি লিখে ধলাকর্তাকে তার বিয়ের সময়ের পালঙ্কটি বিক্রি করে টাকা পাঠাতে বলল। এতে ধলাকর্তার আত্মা সম্মানে লাগল। সে রাগের মাথায় পালাঙ্কটি গরিব মকবুলকে নামমাত্র দামে দিয়ে দিল। পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পালঙ্কটি ফিরিয়ে নিতে চান। কিন্তু মকবুল রাজি হয়না। ধলাকর্তাও সংখ্যালঘু হলেও মকবুলকে ভাতে মারার ক্ষমতা রাখেন। সে সুবিধাবাদী মুসলমানদের সাথে হাত মেলায়। সব দেখে মকবুল অনুধাবণ করে, ''গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই কেবল এক গোরস্থান আছে।'' (১০) এক সময় মকবুল পালঙ্ক বিক্রি করতে রাজি হয়। ধলাকর্তা মকবুলের বাড়ি গিয়ে দেখে সেই পালঙ্কে দুটি শিশু। শিশুদুটিকে দেখে ধলাকর্তার মন পরিবর্তন হয়ে যায়। সে বাচ্চা দুটিকে পরবর্তী প্রজন্ম এবং তার উত্তরাধিকার মনে করে বলল ''আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না।'' (১১)

প্রফুল্ল রায় অবিভক্ত বাংলার ঢাকায় যৌবন পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। তার লেখনীতে দেশভাগের গল্পের চরিত্ররা জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠেছে। যেমন তাঁর 'মাঝি' গল্পটিতে মুসলমান চরিত্রটি। গল্পে ফজল মাঝি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নদীতে নৌকায় লোক পারাপার করে। কারণ সাত কুড়ি টাকা সলিমার বাবাকে না দিলে, সলিমার সঙ্গে ফজলের বিয়ে দেবে না। প্রতিদিন রোজগারের টাকা অনেক যত্নে রেখে দেয়। এক গভীর রাত্রে ইয়াছিন শিকদার এবং বোরখা পরা মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল নদী পার হবার জন্য। ফজল প্রথমে ইয়াছিনের স্ত্রী ভাবল। সেই জন্য মোটা টাকার বিনিময়ে চর ইসমাইল পৌঁছে দিতে রাজি হল। তৎক্ষনাৎ মনে মনে স্বপ্নের নীড় বুনতে শুরু করল, এবার সাইমার বাবা

বিয়েতে মত দেবে। কিন্তু নৌকা মাঝ দরিয়ায় আসতেই ফজল বুঝতে পারল নৌকার ছই এর মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে। একসময় মেয়েটি ছই থেকে বেরিয়ে ফজল মাঝিকে বাঁচাবার ব্যাকুল মিনতি জানাল। সে বামুন বাড়ির বউ এবং স্বামীকে ইয়াবিন শিকদারই হত্যা করেছে। এখন সে তার ইজ্জত নিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে ফজলের মাথায় কি যেন খেলে গেল। সে ধারাল কোচ দিয়ে ইয়াছিনকে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দিল। গল্পে আরও চমক বাকী ছিল। এবার ফজল মাঝি তার উপার্জিত সব অর্থ মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে নিরাপদে স্টিমার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিল, কলকাতা নিরাপদে যাতে পৌঁছাতে পারে। ঘর বাধার স্বপ্ন এই ভাবে ফজলের শেষ হয়ে গেলে সে মনে মনে বলেছে ''বনস্পতির নিভুত ছায়ায় সাহলমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগে রাত্রির ক্রুর অন্ধকারে কতবার ইয়াছিনদের আবির্ভাব হবে? কতবার ? (১২)

প্রফুল্ল রায়ে এই পূর্বে দেশভাগের উপর লেখা উল্লেখযোগ্য গল্প 'সিপি'। সুদূর আন্দামানের ডিগলিপুরে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু কলোনী। সেখানে বসবাসকারী পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু হরিপদ সানা তার ধরম কন্যা বাতাসীকে বিক্রি করে দেয় পানিকরের কাছে। পানিকর এরিয়ল তাকে বোটে তুলে নিলে একসময় অত্যাচারিত বাতাসী জলে ঝাঁপ দেয়। সেই সময় এক ধনী যুবক লাতে হিংস্র হাঙরের বুকে ছুরি চারিয়ে বাতাসীকে উদ্ধার করে। লাতে সারা জীবন সমুদ্রের সম্পদ সংগ্রহ করেছে, যাকে সিপি বলে। সাতাশ বছরের জীবনে লাতে বাতাসীর মত সিপি কোনদিন তোলে নি। পানিকর এবার লাতেকে দেখে পালিয়ে যায়।

এই পর্বে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় দেশভাগ নিয়ে লেখেন তিনটি গল্প। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি হল 'অপহরণ' 'মথুরাকাবিধর মাস্টার' এবং 'অভিযোগ'। অপহরণ গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে স্কুল শিক্ষক জগদীশ ঘোষাল আত্মীয় পরিজন হারিয়ে কলকাতায় এসে একসময়ের ছাত্র প্রিয়নাথের বাড়িতে স্থান নেয়। ধীরে ধীরে সেখানে মাইনের চাকরে পরিণত হন। একসময় চুরির অপবাদ দেয়। দেশভাগের ফলে শিক্ষিত মানুষের কি অবস্থা হয়েছিল তাই গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে।

'পরিচয়' পত্রিকায় সুলেখা সান্যালের গল্প 'অন্তরায়' প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। পূর্ববঙ্গের সুখের সংসার ছেড়ে দেশভাগের পর বৃদ্ধ রসময়ী হারান আত্মজাকে খুঁজে পায় রিফিউজি অবস্থায়। লতা অনেক আগে তার প্রেমিকের সাথে ঘর ছেড়েছিল। অনেক দিন পর লতা মাতা, দাদা বৌদি সবার সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু দুই দিন না যেতেই মা ছাড়া দাদা বৌদির মনভাব প্রকাশিত হয়। তারা লতাকে বলে যেহেতু সে রোজগার করতে পারে, তাই তার উপার্জিত টাকা সংসারে দিতে হবে। লতা তার জমানো সব টাকা দাদা বৌদিকে দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য সংসার ছাড়ে। গল্পে দেখিয়েছেন দেশভাগ কিভাবে মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে নষ্ট করেছিল।

দেবেশ রায়ের গল্প 'নাগিনীর উপমেয়' গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে প্রতিমা নামে এক অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু নারীকে কেন্দ্র করে। গল্পে অরুণ বসু শিলিগুড়িতে তিন চারটি উদ্বাস্তু কলোনির প্রভাবশালী সম্পাদক। প্রতিমা উদ্বাস্তু অষ্টাদশী চাকুরীপ্রার্থী। অরুণ বাবু প্রতিমার কাছে থেকে মাস্তান ধরনের এক ছেলেকে সরিয়ে, এ নিজে প্রতিমার দখল নিতে চাইল। এই ঘটনায় প্রতিমার নারী সত্ত্বায় আঘাত এল। প্রথমে প্রতিমার সঙ্গে অরুণ বাবুর সঙ্গে গড়ে উঠে দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে অভিভাবক এবং শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব দিল। কিন্তু বিয়ে হল না। কারণ বিয়ের আগের রাত্রে প্রতিমা আবিস্কার করল অরুণবাবু সেই মস্তান ছোকরার পাশে নিবিড় হয়ে বসে থাকতে। চোরের মত সরে এল প্রতিমার কাছে থেকে। এই গল্পের বহিঃরঙ্গ দেশবিভাগ কিন্তু অন্তঃরঙ্গ আত্মসম্মান বোধ যুক্ত নারীর সম্মানের লড়াইয়ের ইতিহাস।

দেবেশ রায়ের গল্প 'সাত হাটের হাটুরে' গল্পে তেরো বছরের উদ্বাস্তু কিশোরের জীবন সংগ্রামের কাহিনী স্থান পেয়েছে। সাধন গলায় কাঠের বাক্স ঝুলিয়ে পান, বিড়ি-সিগারেট ট্রেনে ফেরি করে বেড়ায় দূর দূরান্তে। ভোর রাত্রে উঠে রাত্রি বারটা পর্যন্ত চলে এই সংগ্রাম। ট্রেনের চেকারকে লাইসেন্স না দেখাতে পারলে জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে। এই বয়সে সে যেন পরিণত যুবক। দেশবিভাগ যেন তার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। সংসারে মা, ছোট ভাই বোন দের সঙ্গে স্বামী পরিত্যক্তা দিদি তার রোজগারের ভরসায় থাকে। তাই চল্লিশ বছরের নকুলকে তেরো বছরের সাধন বিড়ি টানতে টানতে উপদেশ দেয় ''দ্যাখ্ নকুল্যা তুই চায়ের দোকান করতেছিস তাই কর। হালার চল্লিশ বছর বয়স হইল, বিয়্যা করস নাই-তুই বুঝবি কিরে সংসারের।" (১৩)

জগদীশ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বেয়ারিং চিঠি' গল্পটি পত্রকারে রচিত। অষ্টদশী লীনার বাড়ি ছিল ফরিদহরে। সে কোন এক বল্লবীকে গল্পে চিঠি লিখেছে। দেশবিভাগের সময় ফরিদপুর পাকিস্তানের মধ্যে পড়ায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক পরিবারের সাথে মায়ের হাত ধরে লীনারা দুই বোন ভারতে চলে এসে আশ্রয় নেয় বাবার মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ি। সেখানে কাকিমা অত্যাচার শুরু করে। লীনার মা দেওঘরে একটি স্কুলে চাকরী নিয়ে চলে যায়। কিন্তু সেখানে লীনার মায়ের নামে মিথ্যা বদনাম রটালে চাকরী চলে যায়। বাধ্য হয়ে আবার কাকিমার সংসারে ফিরে আসতে হয়। সেখানে লীনাকে বাড়ির সমস্ত কাজ করতে হয়। ছোট বোনটিকে মিথ্যা চুরির অপবাদে মারধর করে। এই গল্পে উদ্বাস্তু মানুষের দুঃখ কষ্টের কাহিনী উঠে এসেছে।

দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ইন্দ্রজিৎ রচিত 'পরকীয়া' গল্পে ধর্ষিতা নারী সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিকোন প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে দেশবিভাগের পরে এক স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে যায়। শেয়ালদা স্টেশনে এক সময় তার স্বামী খুঁজে পায়। কিন্তু এই শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছাতে তাকে অনেক জায়গায় ধর্ষিতা হতে হয়। এই গল্পে মেয়েটির স্বামী বিষয়টিকে সহানুভূতির

সঙ্গে বিবেচনা করে বলেছে ''আমার কাছে ফিরে আসবার জন্য ওকে কতখানি দাম দিতে হয়েছে সেকথাই ভাবি। সতীত্ব দিয়ে তবে আসল সতীত্ব রক্ষা করেছে।''

যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের 'প্ল্যাট ফরমের গল্প' গল্পে দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্লাটফর্মে আশ্রয় নেওয়ার কাহিনী উঠে এসেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে তারা জঞ্জালের স্তুপের পাশে স্থান নেয়। নাম পরিচয়হীন মানুষগুলোর কোন ভেদ। ভেদ নেই। এখানে একটি পয়সা নিয়ে মারা মারি করতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ল শিশু। একফোটা জলের জন্য মারা মারি করে মাথা ফাটায় ফকির চাঁদ। মুন্সী গঞ্জের পাঠশালার পন্ডিত ভিক্ষা করতে গিয়ে পকেটমার সন্দেহে হাজত বাস করে। পূর্ববঙ্গের কমোর এখন ভিখারী। রাইমোহন ও স্ত্রী মঙ্গলা বাচ্চাদের সামনে সামান্য পান্তা খেয়ে নেয়। নারী লোভী শিকারীর দল ঘোরে চারপাশে। লেখক নিজে বলেছেন - ''এ যে ভাঙ্গা টুকরো মানুষের কাহিনী। এর শুরু কিম্বা শেষ কোনটাই যে নির্দিষ্ট নয়। - (১৫)

মনোজ বসুর গল্প 'দিল্লি অনেক দূর' গল্পগ্রন্থে দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে মাত্র চার বছরে মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছে তার আভাষ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে 'পতাকার নিচে' গল্পের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১৯৫৯ সালে 'দেশ' পত্রিকায় মনোজ বসুর 'দাঙ্গার দাগ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পের শুরুতে দেখা যায় পাকিস্তানগামী ট্রেনের উঁচু ক্লাসের কামরায় দুজন সামনা সামনি বসে আছে। ট্রেন বেনেপোল স্টেশনে থামলে সীমান্ত পুলিশ আর কাস্টমসের লোক এই দুজনের একজনকে মশায় এবং একজনকে মিঞাসাব সম্বোধন করে। পুলিশের লোক হিসেবে ভুল করে। কারণ আজিজ বলে মুসলমান ভদ্রলোকের দাড়ি না থাকায় তাকে হিন্দু মনে করে। আর হিন্দু ভদ্রলোকের মুখে দাড়ি থাকায় মুসলমান মনে করে মিঞাসাব বলে ডাকে। এই কথা শুনে আজিজের তীব্র রাগ ফুটে উঠে। সে বলে ''মসজিদ-মন্দির নয়, পুরাণ -কোরান নয়, ধর্ম তবে এসে দাড়িতে ঠেকেছে?'' - (১৬) ক্রমে পাঠক জানতে পারে দাঙ্গার সময় কলকাতায় এই দুজন মুখোমুখি হয়েছিলেন। আজকের হিন্দু ভদ্রলোক আজিজের বস্তিতে আগুন লাগিয়েছিল। বদলা নেবার জন্য আজিজ হিন্দু পাড়ায় গিয়ে ছুরিকাহত করে দেশ ত্যাগ করে। এতকাল পরে তারা আবার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এখন আর কোন মনে হিংসা নেই। দুজনে হাত ধরা ধরি করে প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানে চা খেতে বসলেন। সময় সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পে সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া বাস্তব সম্মতভাবে উঠে এসেছে। লেখকের ১৯৫১ সালে প্রকাশিত গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত 'দেশের মাটি' 'সাক্ষর' এবং ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'আগে কহ আর' গল্পগ্রন্থের 'কটাক্ষ' শীর্ষক গল্প তিনটিতে দেশভাগের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। 'দেশের মাটি' গল্পে ইয়াসিন সামান্য আদালতের দপ্তরি। কিন্তু সে অসামান্য স্বপ্ন দেখে। সে ভাবে ১৫ই আগষ্ট

দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে তার বাড়ি পাকিস্তানে পড়বে এবং চারিদিকে সোনা ফলবে, বেহেশতের সুখ নেমে আসবে। অবশেষে স্বাধীনতা এল, পাকিস্তান হল, কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না। কিন্তু ইয়াসিন একসময় জানতে পারল তার জায়গা পাকিস্তানে পড়েনি। সে ভাবল হয়তো এই কারণে কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে নিয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দিল। কিন্তু পাকিস্তান গিয়ে দেখল সেখানে কোন পরিবর্তন হয়নি শুধু নয়, চালের দাম পঞ্চাশ টাকা কিলো। একদিন ভোরে ইয়াসিনের স্ত্রী ইয়াসিনকে আবিস্কার করলো গাছের নিচে উদভ্রান্তের মত চেহারায়। ইয়াসিন স্ত্রীকে জানালো সে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। কারণ সে আর পাকিস্তান থাকতে চায়না। ফিরবে এবার ভারতে।

অচিন্ত্যবাবুর 'সাক্ষর' গল্পটি দুই দরিদ্র ফেরিওয়ালা, দীননাথ ও তার বন্ধুর গল্প। দুই বন্ধু দেশভাগের পরবর্ত্তী দাঙ্গার সময় পরস্পরকে আক্রমণ করে। মিলিটারির গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে রাতের অন্ধকারে আবার মিসিত হয়। এবার আর শত্রুভাবে নয় আজীবন বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা করে। লেখকের 'কটাক্ষ' গল্পটিতে রাইপদ দেশভাগের পরে ভারতে চলে আসে। কিন্তু দেশের টানে আবার পূর্বপাকিস্তান হাজির হয়ে দেখে বাড়ি ঘর সব দখল হয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফেরিওয়ালা' গল্পগ্রন্থের 'ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই' গল্পে শোভা ও শোভার মায়ের দেশভাগের পর একটু আশ্রয়ের কাহিনী উঠে এসেছে। অন্যদিকে 'লাজুকলতা' গল্পগ্রন্থের 'সুবালা' এবং 'পাষন্ড' গল্পদুটিতে দেশভাগের প্রত্যক্ষ ছবি ধরা পড়েছে। সুবালা দেশভাগের পর কলকাতা এসে শিশু সন্তান কোলে করে ভিক্ষা করে কলকাতার রাস্তায়। স্বামী হরেন শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে গেলে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হয় এবং সে তার পর রাঁধুনির কাজ নেয়। একদিন সন্তান সহ ফর্সা কাপড় পরে স্বামী হরেন আসে সুবালার কাছে। সুবালা সুখী হয়। কিন্তু মাঝরাতে ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশ হরেনকে নিয়ে যায়। লেখকের 'পাষন্ড' গল্পের নায়ক সমীর শেয়ালদা স্টেশনের উদ্বাস্তুদের দেখে অসৎ কাজ ছেড়ে সৎ রাস্তায় ফিরে আসে।

রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। ১৯৬০ সালে রচিত এই গল্পটির পটভূমি দেশভাগ পরবর্তী দাঙ্গা। এক থম থমে দাঙ্গার মধ্যে কলকাতার এক হিন্দু পাড়ায় হাজির হল একটি সাদা ঘোড়া। পাড়ার ছেলেদের ঘোড়াটিকে নিয়ে উৎসাহের সীমা নেই। কিন্তু ঘোড়াটির পায়ে ঘা নিয়ে অসুস্থ হয়ে ক্রমে খাওয়া ছেড়ে দিল। কয়েকদিন পরে ঘোড়াটির খোঁজে এল মুসলমান সহিস। সহিসের যত্নে ঘোড়াটি আবার সুস্থ হল। কিন্তু দাঙ্গার আবার নিদ্রাভঙ্গ হল। বুড়ো সহিসকে দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচালো পাড়ার ছেলেরা। একসময় মিলিটারির গুলির আওয়াজ থামলে রাস্তায় বেরিয়ে দেখা গেল ঘোড়াটির গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। গল্পে সাদা ঘোড়াটি হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বের মিলনের প্রতীক হয়ে এসেছিল।

সমরেশ বসুর 'জয়নাল' দাঙ্গার পটভূমিকায় মানবিক আবেদনে ভরপুর গল্প। মধু আর জয়নাল দুই বন্ধু ডিঙি নৌকা ভাসিয়ে ঘুরে বেড়াণ তাদের নেশা। এক বর্ষায় তারা দুজন বাঁশি বাজাতে বাজাতে নৌকা নিয়ে যাত্রা করে। এমন সময় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। চকিতে তারা দুজন আবিস্কার করে মধু হিন্দু, জয়নাল মুসলমান। মধু বুঝতে পারে জয়নালের ঠোটে অবিশ্বাসের হাসি। সে মধুকে নিজের বাড়ির দিকে নৌকায় করে নিয়ে গিয়ে বন্ধক বানিয়ে রাখে। কারণ দাঙ্গার সময় জয়নালের বড় ভাই হারিয়ে গেছে। বন্দি জীবনে মধুর প্রাণ শুকিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে তার প্রাণের বিনিময়ে জয়নালের ভাই মসজিদকে ফিরে পেতে পারে। তারপর একদিন পর মজিদ ঘরে ফিরে আসে, কিন্তু জয়নাল মিলিটারির গুলিতে মারা গেছে। মধু বুঝতে পারে এই সব মানুষজনকে তার অবিশ্বাস করা উচিত হয়নি।

সমরেশ বসুর 'গন্তব্য' গল্পটি দেশভাগ পরবর্ত্তী সময়ে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে রচিত। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে একটি বড় উদ্বাস্তু দল অনেক কষ্টে শেয়ালদা স্টেশন পৌঁছায়। এখানে নোংরা দুর্গন্ধ অস্বাস্থকর পরিবেশে সতেরো দিন কাটানোর পর যখন সদ্য বিধবা পোয়াতি বউটির প্রসবযন্ত্রনা শুরু হল, ঠিক সেই সময় উদ্বাস্তু দলের নেতা প্রসন্ন জানাল একটি বড় বাড়ি তারা খুঁজে পেয়েছে থাকার জন্য। অবশেষে সবাই সেই জামিদারের পরিত্যাক্ত বাড়িতে হাজির হল এবং বৌটি সন্তান প্রসব করল। পুলিশ এসে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইল। কিন্তু সদ্যজাতের প্রতিবাদী ক্রন্দনের সাথে সাথে সবাই রুখে দাড়ালো। তারা ঘর ছাড়বে না।

আমাদের এই আলোচনায় ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে প্রকাশিত দেশভাগ সর্ম্পকীত সামান্য কয়েকটি গল্পের প্রতি আলোকপাত করা হল। আমরা জানি ১৯৬০ সালের পরে উদ্বাস্তু আগমনের হার ১৯৬৫ সালে আরো বৃদ্ধি পায় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। তারপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গর্বিত হলে তখনও হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমণ বৃদ্ধি পায়। এই আগমনের হারের শতকরা হিসাব আলোচনার প্রথমেই দেখানো হয়েছে। এমনকি এখনও সেই উদ্বাস্তু আগমনের হার একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়নি। তার পরোক্ষ কারণ দেশভাগ। ১৯৬০ সালের পরে মতিনন্দী অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার, জীবন সরকার, প্রমুখ শক্তিশালী লেখকবৃন্দ দেশভাগকে পটভূমি করে ছোটগল্প রচনা করেছেন। আমরা এই বিশিষ্ট লেখকদের গল্পগুলির আলোচনা পরে অন্য কোথাও করার সুযোগ পাব, এই আশা ব্যক্ত করে এই আলোচনা আমরা শেষ করতে পারি।

তথ্য সূত্র :

১। অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস , ৪৯ পর্ব, দেশ, ৪ঠা মার্চ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ৬০

২। তাপস ভট্টাচার্য, বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৪৪১, পৃষ্ঠা - ৩৯

৩। সৈয়দ মুজতবা আলী, নেড়ে, মুক্তধারা ,১ম বর্ষ, বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ - ১৯৩৮

৪। মনোজ বসু, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, দুঃখ নিশার শেষে, কলকাতা, ১৩৫২ পৃষ্ঠা - ৬৪ - ৭৯

৫। সমরেশ বসু, নিমাইয়ের দেশত্যাগ, পরিচয়, কলকাতা, ১৩৫৭, পৃষ্ঠা - ১৪৯-১৫৪

৬। স্বত্বিক ঘটক, সড়ক, নতুন সাহিত্য, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা- ১৩৫৭ , পৃষ্ঠা - ৪১

৭। সানজিদা আখতার, বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ - ২০০২, পৃষ্ঠা - ৫৯

৮। মিহির মুখোপাধ্যায়, জীবিকা, পরিচয়, বিংশ বর্ষ, হয় খন্ড, ১৩৫৭, পৃষ্ঠা - ৩৩-৪০

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অর্বিকার , শ্বেতকমল, মিত্র ও ঘোষ পাবলির্শাস, পৃষ্ঠা - ৪৩৯-৪৪৭

১০। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পালঙ্ক, আনন্দবাজার পত্রিকা পূজা সংখ্যা, শ্রাবণ -১৩৫৯ সংকলিত গল্পমালা-১, পৃষ্ঠা - ২৪১-২৫৭

১১। ঐ

১২। প্রফুল্ল রায়, মাঝি, দেশ, ২১ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য - ১৩৬১, পৃষ্ঠা - ৪৪০ - ৪৪৫

১৩। দেবেশ রায়, সাতহাটুরে পরিচয়, ২৭ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, পৃঃ- ৪৬৮-৪৮৬

১৪। ইন্দ্রজিৎ, পরকীয়া, দেশ, ২৪শ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৭ই আষাঢ় ১৩৬৪

১৫। যশোদজীবন ভট্টাচার্য, প্ল্যাটফরমের গল্প, দেশ, ২৪ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২১ আষাঢ় ১৩৬৪

১৬। মনোজ বসু, দাঙ্গার দাগ, দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃষ্ঠা - ২৪

‘অন্তঃশীলা’ উপন্যাসের অন্তর্গঠন

সোমা ভদ্র রায়*

বিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমী সাহিত্যে রোমান্টিকতা-বিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। তার জোয়ার এসে লেগেছিল আমাদের তরুণ সাহিত্যিক প্রজন্মের মনে। ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর মূল বিদ্রোহটা শুরু হয়েছিল সেখান থেকেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভাববিলাসের গোলকধারায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা উত্তরণের সঠিক পথটা খুঁজে পাননি। অথচ ভাবাবেগপ্রবণ গল্পকাহিনির পাশাপাশি বুদ্ধিতাড়িত সচেতন জীবনভাবনা কথাসাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে নিজের অবস্থান-ভূমিটি চিনে নিতে ক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধিগত কর্ষণের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর ‘সবুজপত্রে’র ভূমিকা কোনোমতেই অস্বীকর করা যায় না। আর সেই সঙ্গে মনে রাখতে হয় প্রমথীয় চিৎপ্রকর্ষের প্রেরণায় উজ্জীবিত লেখকরা বাংলা সাহিত্যে মননশীল উপন্যাসের একটি ধারাকে বাহিত করেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর প্রতীতি ছিল– ‘‘যার সমাজের সঙ্গে যোল-আনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে।’’[১] অথচ গড়পড়তা বাঙালি স্বভাবে তিনি বিরোধ ও বিতর্কে সজাগ ও সচল হয়ে ওঠার কোনো লক্ষণই দেখেন নি। বরং দৈন্যকে ঐশ্বর্য, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা, আলস্যকে ঔদাস্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা দেখে তাঁর আক্ষেপের অন্ত ছিল না। তাই তিনি মানসিক সঞ্চালন বজায় রাখতে ‘সবুজপত্রী’দের নিয়ে একটি উজ্জ্বল কলাগোষ্ঠী গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল– ‘‘আর্ট জিনিসটির চর্চায় নকলের অধিকার নেই, কেননা দুনিয়ার অধিকাংশ লোক দুনিয়াদারি ছাড়া আর কিছু বোঝেও না, বুঝতে চায়ও না। সুতরাং এ-বিষয়ে সমধর্মী লোকের সংখ্যা অতি কম এবং সেই স্বল্পসংখ্যক লোকদের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গ যেমন প্রয়োজন তেমনি উপকারী’’।[২] স্বভাবতই বীরবলী উদ্যমে সীমিত সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর একটি মানসিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। দেশীয় অতীতকে অগ্রাহ্য করার কোনো প্রবণতা তাঁদের ছিল না। অথচ বিদেশের বর্তমানটা এসে মনের দরজায় ঘা না মারলে আমাদের বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক জীবনে গতিলাভ সম্ভব নয়, এমন একটি বিশ্বাসকেও তারা পরিহার করতে পারেন নি। আবার বিদেশিয়ানার আতিশয্যে মনটাকে ঘুলিয়ে তুলতেও চাননি তারা। এঁদের চিন্তার প্রাখর্য নির্ধারিত নিয়মে প্রবন্ধ রচনার পক্ষেই অনুকূল ছিল। কিন্তু জনাকয়েক লেখক কথাসাহিত্যের প্রচলিত

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়।

আবেগমুখ্য কাহিনি-ধারাকে অস্বীকার করে তার মধ্যে মননের নতুন পরিসর তৈরি করে নিয়েছিলেন। মানুষের আপাত-পরিচয়ের অন্তরালবর্তী চেতনা-প্রবাহের সন্ধানে কেউ কেউ আবার উপন্যাসের-আখ্যানের চেনা ছকটাকেই ভেঙে দিয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার, দিলীপ কুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ধারায় ঔপন্যাসিক।

'সকলেই জানেন যে আমি বীরবলে শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য'—আত্মপরিচয়ের এই ভাষা যাঁর, যিনি 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে বীরবলী ঘরানাকে অহংকারের সঙ্গেই আত্মীকৃত করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সারস্বত মেধাগুণ বুঝে নিতে পাঠকের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বস্তুত বুদ্ধিজীবী ঔপন্যাসিক হিসেবেই পাঠকমহলে তাঁর স্বীকৃতি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর তকমাটা একজন কথাসাহিত্যিকের পক্ষে কতখানি গৌরবের তা নিয়ে নিঃসংশয় হওয়া কঠিন। সমগ্র মানুষকে খুঁজে পাওয়া যদি ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য হয়, তাহলে নিছক বুদ্ধির নিরিখে তার আধখানা দেখাই সম্ভব। ধূর্জটিপ্রসাদ এ সত্যটি জানতেননা এমন নয়। তিনিবুঝেছিলেন, এ-কালের মানুষ যেমন বাস্তব প্রেক্ষিতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে আবেগের অতিরেক বর্জন করতে চায়, তেমনি মননের আতিশয্যে, শুষ্কনীরস বুদ্ধির চর্চায় তার স্বভাবিক জীবনধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটে। 'সবুজপত্রে'র অনুগামী হয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ যেমন নিজের মত ও পথ সন্ধান করতে দুর্বল বা দ্বিধাগ্রস্ত হননি, তেমনি বুদ্ধি-তর্ক বিচারের দুনিয়ায় বারবার ঘুরপাক খেতে খেতে তিনি অনুভব করেছিলেন, এমন একমুখী টানে প্রবণের রসদে ঘাটতি পড়তে বাধ্য। বুদ্ধিজীবী মানুষেরও মনোগত বাসনা নিঃসন্দেহে চেতনার মুক্তি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্র এই মুক্তচেতনার অন্বেষণেই ফিরেছে বারবার। সে প্রয়াস সফল হয়েছে না ব্যর্থ হয়েছে সেই বিতর্কমূলক প্রশ্নের মধ্যে একটি কথা অবদারিতভাবে গ্রাহ্য হয়েছে, বুদ্ধির পথ অনুসরণে মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। জীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছন্ন হতে হতে একসময় সে অতৃপ্তি আর অসহায়তার শিকার হয়। এমন একটা বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা'।

উপন্যাসের অবয়বগত পরিকল্পনায় ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র পথ ধরেছেন। আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত নিটোল কাহিনির প্রথানুগত ধারার বাইরে বেরিয়ে তিনি নতুন নিরীক্ষা শুরু করলেন। ত্রয়ীর প্রথম পর্ব 'অন্তঃশীলা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে (১৩ই জুলাই ১৯৩৫) স্বয়ং স্রষ্টাকে লিখেছিলেন—

> 'আমার ভিতরে আছে একটি অনবচ্ছিন্ন শাঁস, তার মাঝখানটিতে একটিমাত্র আঁটি। দাড়িমের শক্ত খোলার মধ্যে শত শত দানা এবং প্রতেক দানার মধ্যেই একটি করে বীজ। তোমার অন্তঃশীলা সেই দাড়িম জাতীয় বই। বীজবাণীতে ঠাসা। তুমি এত বেশি পড়েছ এবং

এত চিন্তা করেছ যে, তোমার আখ্যানকে শতধা বিদীর্ণ করে বিস্ফূরিত হতে থাকে।'[৪]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসটিতে ডালিমের দানার মতো বহু চিন্তার বীজ ছড়ানো। কাজটা যে লেখক সচেতনভাবেই করেছিলেন, তথাকথিত আখ্যান গ্রন্থনের ঝোঁক যে তাঁর ছিল না, তার প্রমাণ মেলে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিতে– ''সত্যকার নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকে না, তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে।"[৫]

ঘটনাপ্রবাহের বদলে এ ধরণের চেতনাপ্রবাহের প্রয়োগ পাশ্চাত্য দেশে আগেই শুরু হয়েছিল। নিভৃত অবচেতনের যে ভাবনা মানুষের নিজের কাছেও অজ্ঞাত, অস্পষ্ট, তাকে চেতন স্তরে তুলে আনতে পারলে, চেতন-অবচেতনের অভিব্যক্তিগুলিকে মিলিয়ে দেখতে পারলে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে অনেক বেশি সমগ্রতায় ধরা যায়.। অনেক আপাত-অসংলগ্নতার উত্তর পাওয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বা তার উত্তরকালে জীবনের শিকড়-ছেঁড়া বিপর্যয় মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রবল সংকট তৈরি করেছিল। আর তাই লেখকদের মনে হয়েছিল, বর্হিমুখী ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি না করে অন্তরের গহনতম প্রদেশের সন্ধান অপরিহার্য। ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস জয়েস্, ভার্জিনিয়া উলফ্–এই নতুন ধারার সূচনা করে গোটা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী মহলকে জীবনকে নতুনভাবে দেখার এই প্রকল্পে প্রাণিত করেছিলেন। সেই পথ ধরে ধূর্জটিপ্রসাদ বাইরের ঘটে-চলা ঘটনাকে কাহিনির ভিত্তিমূলে না রেখে মানসিক অভিব্যক্তিগুলিকে প্রাধান্য দিলেন। শুরু হল চরিত্রদের নিজের সঙ্গে কথা বলার পালা। বলা বাহুল্য, এই মানসিক চিন্তাস্রোত বিশেষভাবে নির্ভর করল পত্রের উপর। কারণ ডায়েরি ছাড়া পত্রই হতে পারে মানুষের অন্তরঙ্গ কথার সফল বাহন। তাই ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের পাতার পর পাতা জুড়ে রইল চিঠি। এত বেশি সংখ্যায় এত দীর্ঘ মাপের চিঠি আমরা এর আগে বাংলা কথাসাহিত্যে পাইনি।

'একজন তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি'[৬] দেখানোই 'অন্তঃশীলা' রচনায় ধূর্জটিপ্রসাদের প্রধান উদ্দেশ্য। 'তথাকথিত' শব্দটাই বুঝিয়ে দেয়, বুদ্ধিজীবীর নিরাবেগ অহংকারের উপর ঔপন্যাসিকের তেমনি আস্থা নেই। আরও সরল ভাষায় বলতে গেলে, বুদ্ধিজীবীর সংকটকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। গল্পের মূল চরিত্র খগেনবাবু। তাঁর মনন তাঁকে অন্তর্মুখী করেছে। স্ত্রী সাবিত্রী নিজের স্থূল শৌখিনতা, অযৌক্তিক অভিমান ও সন্দেহপ্রবণতা নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোলোকের বাসিন্দা। খগেনবাবুর পক্ষে তাঁকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। দুজনের মধ্যে অলঙ্ঘ্য দূরত্ব তৈরি

হয়েছিল। তারই পরিণামে সাবিত্রীর আত্মহত্যা। সেই অস্বাভাবিক মৃত্যুপ্রসঙ্গ দিয়ে উপন্যাসের শুরু।

স্ত্রীর আত্মহনন খগেনের মনে আলোড়ন জাগিয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আনুভূতিক কোনো শূন্যতা আসেনি। সাবিত্রী-খগেনের অন্তঃসারহীন দাম্পত্য-সম্পর্ককে গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে রেখে মূল বৃত্তান্তের সূচনা হয়েছে সাবিত্রীর বন্ধু রমলা ও খগেনের সম্পর্কের টানাপোড়েন। তার সবটুকু প্রতিবিম্ব পড়েছে তাঁদের পরস্পরকে লেখা চিঠিতে। সাবিত্রীর মৃত্যুর পর সৌজন্যবশে রমলা খগেনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। পরিচারকের মাধ্যমে পাঠানো তাঁর চিঠিতে মামুলি প্রায়োজনিক কথার সঙ্গেও সংবেদনা জড়ানো–'আপনার খাবার তৈরী, অনুগ্রহ করে দেরী করবেন না। শরীর খারাপ হয়নি তো?' এমন গায়ে-পড়া বন্ধুত্ব স্বীকার করার মানসিক প্রস্তুতি ছিল না খগেনবাবুর। সুতরাং তাঁর জবাবী স্বর নির্বিকার–''আমার কি যাবার কথা ছিল! মাপ করবেন, যেতে পারছি না, শরীর ক্লান্ত, সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েছি। আপনি এত রাত অবধি খাননি, সত্যই দুঃখিত।"

রাতের অনুরোধ এড়ানো গেলেও পরদিন আবার চিঠি আসে রমলার। আবারও ভদ্রতাবেশে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে খাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যন করেন খগেনবাবু। আসলে জীবনের কোনো মোহে যেন তিনি বাঁধা পড়তে চান না। বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে জীবন পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রমলার প্রতি আকর্ষণকে খুব সচেতনভাবে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তাই তাঁর চিঠির ভাষাও ছাড়া-ছাড়া। শেষ পর্যন্ত নির্মোহ আত্মপব্ধির বাসনায় খগেনবাবু পরিচিত সমাজ-সংসার ছেড়ে কাশী গিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চান। সেখানে আশ্রয় নেন বিধবা মাসীমার কাছে। কিন্তু সেখানেও সংযম সাধনা সহজ হয় না। সচেতনে যাঁকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেই রমলা অগোচরে বাসা বাঁধেন তাঁর মনে। কাশী থেকে লেখা চিঠিতে তাই পাওয়া যায় জবাবদিহির সুরঃ ''এখনও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারিনি। সেইজন্য আপনাকে পত্র দেওয়া হয়নি। আজ সকালে অবসর পেয়েছি। তাই আপনাকে চিঠি লিখছি।" চিঠিতে মানসিক অস্থিরতার ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যার কাছে মুখোমুখি দাঁড়াতে চাননি, দূরবর্তী অবস্থান থেকে তাঁর কাছে চিঠি লেখা অনেক সহজ। খগেনবাবুর বক্তব্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কাশীর ধর্মীয় আবহাওয়া তাঁর দাবি মেটাতে পারেনি। বরং তাঁর বিরূপতার মূলে আছে রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা। খগেনবাবু চিঠিতে লিখেছেন–''কাশীতে ধুলো আর ভিড়, ভিড় আর ধুলো। মনকে ছোট ও সংকীর্ণ করে দেয়। ওপারে যাবার পুলের আচ্ছাদন ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বোধহয় এদেশের কর্তারা ভাবেন যে পবিত্র স্থানের প্রবেশদ্বার ঐ রূপই হওয়া উচিত এবং সংসারে চাপে মন কুব্জ, ন্যুব্জ সঙ্কুচিত না হলে ভগবানের দিকে মন যায় না, ভক্তিরসে মন আপ্লুত হয় না।... একটি জিনিস ভারী তাজা ও ঝকঝকে পানের দোকানের

পিতলের বাসন ও রঙ-বেরঙের ফুকো গোলা ও শিশি। কিন্তু এত ভোগের চিহ্ন!" তীর্থস্থান সম্পর্কে এই ধরণের মোহভঙ্গ এবং সঙ্গে নিজের অবদমিত বাসনার প্রতিক্রিয়া– দুই মিলে খগেনের মধ্যে কামনার স্রোত দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়েছে। এই মুহূর্তে তিনি শুধু নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায়নি, সামনে রয়েছেন মাসীমা– জীবনীশক্তির অনর্থক অপচয় নিয়ে নষ্টলাবণ্যের জীর্ণতায় আচ্ছন্ন সেই অকালবৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে খগেনের কলমে আরেক ধরণের বিতৃষ্ণা দানা বাঁধে– ''মাসীমার চোখের সে জ্যোতি নেই, মরা মাছের মতন চোখ, বুড়োটে চশমা পরেন সুতো বেঁধে, যখনই সময় পান পাড়ার কারুর না কারুর নাতিপুতির জন্য কাঁথা তৈরি করছেন।"

পরের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনায় নিশ্চয়ই কোনো মহিমা আছে। কিন্তু কাঁথা সেলাই করে সময় কাটানোর মধ্যে খগেন নারীজীবনের বিফলতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাননি কাঁথা বহুকাল ধরে দেশীয় গৃহশিল্পের যে ট্রাজিশন তৈরি করেছে, তার মধ্যে কোনে আত্মতৃপ্তির অবকাশ তিনি খুঁজে পাননি। বরং কাঁথা বললেই তাঁর মনে পড়েছে 'নিয়মিত সন্তান প্রসব, শিশুমৃত্যু, অনশন, অনটন।' সমাজবাস্তবতার বোধ খগেনের কম প্রখর নয়। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর যে সংকীর্ণ বৃত্তে তাঁর বাস, সেখান থেকে বাস্তব সংসারের সঙ্গে তাঁর ব্যবধানও দুর্লঙ্ঘ্য। নিজে বিচ্ছিন্নতার শিকার বলেই যেন নিঃসঙ্গ মাসীমার নিস্পৃহতার নাগাল তিনি পাননি।

কাশী এবং কাশীবাসিনী মাসীমা সম্পর্কে চিঠির দীর্ঘ বয়ান শেষ করে পুনশ্চ অংশে খগেনবাবু রমলার প্রতি নিছক প্রায়োজনিক কিছু নির্দেশ রেখেছেন। আপাততুচ্ছ ও গুরুত্বহীন সেই কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু রমলাকে কিছু দায়িত্বের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার চেষ্টা আছে। প্রত্যুত্তরে রমলা অকারণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে এবং নিজের অধিকারের সীমা এতটুকু লঙ্ঘন না করে খগেনবাবুর নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ কোথাও যেন কাজ করছে সূক্ষ্ম গোপন অভিমান– ''নিজে গিয়ে বইগুলি সাজিয়ে রাখব। তবে আমার সাজানো কি আপনার মনোমতো হবে?" খগেনবাবুর সুখসুবিধাই শুরু নয়, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের সব হদিশ রেখেছেন রমলা। রমলার হাত ধরেই উপন্যাসে আরও দুটি চরিত্র প্রবেশ করছে, সুজন ও বিজন–যারা পরবর্তী কাহিনিতে অনেক গ্রন্থি পাকিয়েছে। চিঠির মাধ্যমে খগেনকে তাদের কথা জানানোর সূত্রে পাঠকের সঙ্গেও চরিত্র দুটির পরিচয় ঘটে গেছে। রমলা লিখেছেন–''সুজন খুব ভাল। তবে কেন ভাল আগে বুঝতে পারিনি।...সুজন বিজনের পিসতুতো ভাই, ছেলেবেলা থেকেই মামার কাছে মানুষ, পিতৃমাতৃহীন, তার বাবা সন্ন্যাসী হয়ে যান শুনেছি, তার মাকে আমি দেখেছি। গোরার আনন্দময়ী মা,...। বিজনই বাড়ির কর্তা, তার পরামর্শেই সংসার চলে। বিজনের মা নেই, কিন্তু সুজনের জন্য শৃঙ্খলার অভাব নেই। বিজনের বাবা বিজনকে সুজনের হাতে সঁপে দিয়েছেন,...সুজনকে আমি এইটুকু জানি। আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু নিজে মানে

না, জ্ঞানে বৃদ্ধ।" লক্ষ করতে হবে, রমলা-খগেনবাবুর পত্রবিনিময়ের মধ্যে বিষয় হিসেবে বারবার উঠে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু আংশিক তুলনা হিসেবে 'গোরা' প্রসঙ্গ নয়, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ''দুই বোন'' উপন্যাস সম্পর্কে খগেনবাবুর অভিমত জানতেও রমলা রীতিমতো উৎসুক। আসলে রমলা চেয়েছেন ভাবনার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে খগেনের মানসিক সান্নিধ্যে আসতে। অন্যদিকে এবারও চিঠিতে সম্বোধনের প্রচলিত সৌজন্য বজায় রেখেও খগেনবাবু যেন রমলার কাছে অনেক বেশি মুখর, অনেক বেশি অনর্গল। সুদীর্ঘ হয়েছে তাঁর চিঠির পরিসর। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাষায় অবিমিশ্র তিক্ততার বদলে যুক্ত হয়েছে কিছু দার্শনিক অনুভুব। খগেনবাবু লিখছেন–

> 'ঘাট আমাকে টানে, তার অসমতা, তার অসমতা, তার সনাতনত্ব, তার বৈচিত্র্য, তার অ-পার্থিব ইঙ্গিত আমাকে স্বপ্নালোকে নিয়ে যায়। ঘাটের উপর সময়ের ছাপ, সভ্যতার পলি পড়েছে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে বিরক্ত সন্ন্যাসী নয়, বিংশ শতাব্দীর বিরক্তিকর স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধ, বিতাড়িত বৃদ্ধা...এই ঘাটের ওপর যে 'ইতর' জনমানব নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা ইতিহাসের দান সম্বন্ধে সচেতন নয়।...পোষ্যপুত্রের মতই এরা অন্তঃসারশূন্য। পোষ্যপুত্র যেমন সম্পত্তি অর্জনের সাধনা ও ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন এবং উদাসীন বলেই সম্পত্তি রক্ষা ও তার চেয়ে দরকারী কাজ সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে দায়িত্বশীল হয় না, কাশীর ঘাটবিহারীরাও তেমনি। ইচ্ছা করে এদেরকে বলি 'ওরে তোরা জানিস কি করে বুদ্ধদেব এইখানে প্রাণহীন ও প্রাণনাশী যাগযজ্ঞের বিপক্ষে মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে বলেছিলেন? তোরা জানিস বুদ্ধদেবের ভাষা? সে ভাষা সংস্কৃত নয়, অন্তরে প্রকৃতি ভিন্ন ধরনেরই, সে অন্তর মহাকাব্য শুনতে তৎপর, উৎসুক, উন্মুখ। তারপর এই কাশীতে এলেন শঙ্কর হিন্দুধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে, কী অদ্ভুত এই লোকটি! আর্যভূমি আর দাক্ষিণাত্যের পার্থক্য ঘুচে গেল, এখন গভর্মেন্টের বড় চাকুরি অধিকার করে শ্রমজীবীরা যেমন ভারতবর্ষের ঐক্য প্রচার করছেন তেমনভাবে নয়, কেবল জেদ ও দুঃসাহসের জোরে।'

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে পারেনি, ইতিহাসের গভীর বোধ থেকে কিছু বোঝবার চেষ্টা করেনি। আসার একটি ধর্মের বোঝা বয়ে বেড়াবার নিস্পৃহতা বা নিশ্চিন্ততাকে খগেনবাবুর মতো বুদ্ধিজীবী মানুষ মেনে নিতে পারে নি। তাঁর চিঠিতে বুদ্ধদেব থেকে শঙ্করাচার্য শুধু নন,

পরবর্তীকালের তৈলঙ্গস্বামীর ভূমিকাও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লোষিত হয়েছে। তাঁর চিঠি তো চিঠি নয়, যেন চিন্তামূলক প্রবন্ধ। সবুজপত্রী কালচারর ছাপ সেখান স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ কেন যে তাঁর উপন্যাসকে ডালিমের সঙ্গে তুলনা করছেন বোঝা যায়। চিন্তার বিচ্ছিন্ন বীজগুলি কোনমতেই যেন গল্পের শাঁসটাকে পরম আস্বাদ্য করে তুলতে পারে না। শ্রমবিমুখ গড়পড়তা বাঙালি পাঠকের কাছে উপন্যাসের নামে বুদ্ধির এই ব্যায়ামচর্চা যে সহজে গৃহীত হবে না, তা বলাই বাহুল্য। আয়াসসাধ্য এই কসরতে খগেনবাবু নিজেও যেন ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। হিন্দু সাধকদের আত্মোপলব্ধির সাধনাকে বুদ্ধিমার্গে বিচার করার স্পৃহা তাঁর যতই থাক, এ পথে যে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়, তা তাঁর কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে।

খগেনবাবুর মনের মধ্যে অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ। অনায়াসে তিনি ধর্ম থেকে সাহিত্যে যাতায়াত করতে পারেন। রমলার চিঠির সূত্র ধরেই এবার তিনি চলে আসেন ''দুই বোন'' প্রসঙ্গে। খগেনের চিঠির ভাষা পাঠককে অবধারিতভাবে মনে করায় ''অন্তঃশীলা'' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি মন্তব্য– ''আমার বোধ হচ্ছিল তোমার এই গল্পটি তোমারই চরিতকথা, গল্পের দিক থেকে নয়, আচরণের দিক থেকে।... তোমার জীবনে ছোট-বড় অভিজ্ঞতাগুলি চিন্তা উৎকীর্ণ করবার উপলক্ষ রূপে প্রাধান্য লাভ করে।'' কথাটা ভুল নয়। রবীন্দ্র-উপন্যাসের ব্যাখ্যাসূত্রে খগেনের নারীসম্পর্কিত দর্শন ধূর্জটিপ্রসাদের দর্শনের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। খগেনের সঙ্গে সাবিত্রীর মানসিক দূরত্বের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর চিঠির বক্তব্যে। মুগ্ধ রবীন্দ্রভক্ত খগেনবাবু যখন ঘরে-বাইরে উপন্যাস পাঠে নিবিষ্ট, ঠিক তখনই সাবিত্রী তাঁকে এসে প্রশ্ন করছেঃ 'আমি যদি মক্ষীর মত অন্য কাউকে ভালবাসতাম তুমি কি করতে?' অরসিকের মনের নিরেট পাথরে রস জিনিসটা ঠিকরে ফিরে এসেছে। তা দেখে ব্যথাহত হয়েছেন খগেন। সেই নির্মম অভিজ্ঞতা থেকেই রমলাকে তিনি জানিয়েছেন, ''সাবিত্রীর মত মেয়েদের রান্নাঘরেই মানায় ভাল।'' এবং ''এদের পালাপার্বণে শাড়ি ও গহনা দেওয়া এবং মাঝে একবার দুবার সিনেমা ও থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাওয়াই ভাল।'' মানসিক অসবর্ণতাজনিত এই বিচ্ছিন্নতায় দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর মতো স্থূল ভোগবাদী-মেয়েদের খগেন যতই কটাক্ষ করুন, রমলাকে তিনি সেই স্বাতন্ত্র্যহীন নারীদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করাতে পারেননি, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর নারীবিষয়ক অভিমতে খুব শ্রদ্ধার জায়গা নেই। অন্তঃশীলা রচনার সাতবছর আগে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন– ''এক একটি মেয়ে সেজেগুজে মাকাল ফলটি হয়ে আসবে, আর প্রেমের কবিতা শুনলে স্বামীর পত্রের কথা স্মরণ হবে–রামায়ণ শুনে রামছাগলের কথা মনে হওয়ার মতন– এইসব চোখে পড়লে সাহিত্যিক উৎস শুকিয়ে যায়। স্ত্রীলোকদের হাটে বাজারে যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে দিন কিন্তু সাহিত্যের আসরে

নয়, এমন মিথ্যা সেজে আসে, এমন মিথ্যা গাম্ভীর্যের ভান করে—এমন শূন্যতাভরা চাউনী চায়, যে দেখলে মনে হয় সরস্বতী ঠাকরণ মেয়েমানুষ হয়ে, একাই বাকী সব স্ত্রীলোকের বিদ্যাটুকু শুয়ে নিয়েছেন।"[৭] এই অবজ্ঞা, এই বিতৃষ্ণার প্রতিধ্বনি আমরা পাই খগেনের কণ্ঠস্বরে। কিন্তু রমলাকে ব্যতিক্রমী নারী বুঝেই তাঁর সঙ্গে তিনি সাহিত্যের আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গানের ক্ষেত্রেও খগেন বিশুদ্ধ রূপের সন্ধানী। এ বিষয়েও তিনি মতের আদান-প্রদান করেছেন রমলার সঙ্গে।

রমলার স্বর বোদ্ধার স্বর। সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠে নারীর সপক্ষে সওয়াল না করলেও খগেনবাবুর ধারণা যে একপেশে, সেটা তাঁর শমিত কথায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছে। খগেনের চিঠির তৈরি রমলা লেখেন—

> 'নভেল পড়বার সময় কি মনে হয় বিশ্লেষণ করে দেখিনি...কিন্তু আপনার চিঠি পাবার পর চিন্তা করে দেখলাম, আমরা নভেল পড়ি নিজেদের জন্য...নভেলই আমাদের জীবনের খোরাক। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, তবে আমার পরিচিতার মধ্যে অনেকেরই জীবনের সন্ধিস্থলে নভেলের নায়িকা উপস্থিত হয়ে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন জানি। ...তবে কেউ পড়েন ভাল বই, কেউ বা শিক্ষা সুবিধার অভাবে বটতলা। সুজন বলেছিল— ইচ্ছাপূরণ ব্যাপারটাই যে খারাপ তা নয়, সদিচ্ছাপূরণে দোষ কোথায়?

বলা বাহুল্য, ভাল বই-পড়া মেয়েদেরই একজন রমলা। সাবিত্রীর বন্ধু হলেও তাঁর রুচি ভিন্ন। তার রসাস্বাদনের অধিকার ভিন্ন। গান শুনলে তাঁর মধ্যে সুর ছাড়া অন্য এক অবাস্তব আনন্দ মায়া ছড়ায়। খগেনের কথার মধ্যে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি রমলাকে বিস্মিত করে। কিন্তু তাঁর মতো তিনি বুদ্ধি দ্বারা গ্রস্ত নন, পৃথক একটি অনুভূতিলোকের বাসিন্দা। আর তাই খগেনের চিঠিতে তাঁর চিন্তার প্রবাহকে অনুধাবন করতে চেয়ে এবং নিজের বোধকে খগেনের বোধের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েও কোথায় যেন একটা বাধা টের পান। তবু খগেনের স্বাস্থ্য নিয়ে, ভালো থাকা নিয়ে তিনি আন্তরিকভাবে উদ্বেগ জানান এবং সৎপরামর্শও দেন। চিঠির ভাষায় থেকে যায় নৈকট্যের উচ্চারণ। খগেন তাঁর জবাবে অকপটে বলেন, ''আমি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি না। তাঁদের কাছে আমি বেশি প্রত্যাশা করি, পাই না তাই ক্ষোভ হয়, ক্ষোভে রাগ, রাগে ঘৃণা। তাছাড়া স্ত্রীজাতি বলে কিছু নেই, স্ত্রী-বিশেষ থাকতে পারে।"

সাধারণ স্ত্রীজাতি চিহ্নে রমলাকে অন্তত খগেন খাটো করে দেখতে পারেন না। বরং মনে হয় খগেনের ভিতরে জমাট বরফটা একটু করে গলতে শুরু করেছে। তাই খগেন লিখতে পারেন—''আপনার চিঠি আমার ভাল লাগে।" রমলা ছোট চিঠি লেখেন বলে একটু অনুযোগের সুরও আসে। আর টাইফয়েডে আক্রান্ত বিজনকে রমলা নিয়মিত

দেখতে যান শুনে তাঁকে সংক্রমণ প্রতিরোধক ইনজেকশন নেবার অনুরোধও জানিয়ে ফেলেন খগেন– তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ অন্তরঙ্গ স্বরে। ''মানুষের মন চায় মানুষের মন''–এ পরম সত্যকে বুদ্ধিজীবী ধূর্জটিপ্রসাদও শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞা করতে পারেন নি।

'অন্তঃশীলা'য় ঘটনা সামান্য। চরিত্রের সংখ্যাও হাতে গোনা। চেতনাপ্রবাহরীতি বারবার আশ্রয় করে একটির পর একটি চিঠিকে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত চিঠি রমলার–কিছুটা ক্লান্তির ভারে অবসন্ন ভিতরে ভিতরে সকলেই তো মুক্তির পথ খুঁজে চলেছেন। খগেনের চিঠি সূত্র ধরে রমলাও জানান, গুরু ভিন্ন বোধহয় পথের দিশা মেলে না। উপন্যাসের শেষ চিঠিটা খগেনবাবুর। সুজনকে লেখা। সুজন সে চিঠি পড়তে দেয় রমলাকে। খগেনবাবুর গহন চিন্তাস্রোতের বিবরণ নিয়েই সেই চিঠি। নেতি নেতি করে পথ চলতে চলতে, নির্মোকের পর নির্মোক খসাতে খসাতে অবশেষে খগেন যেন বুদ্ধিমার্গের সীমাবদ্ধতাকে সনাক্ত করেন। কোথাও একটা আবেগময় সম্পর্কের শিকড় থাকা চাই, এই বোধ থেকে উঠে আসে তার স্বীকারোক্তি ভরা গভীর আকুতি–

> 'মন আমার এ কচি লাউডগার মতো ছোট ছোট তন্তু দিয়ে উপরে উঠতে চায়। লতাতন্তু কাটলে লতাই যায় মরে। আমার লতা যাচ্ছিল মরে। আপনার যত্নে আমার কচিপাতা বেরিয়েছিল, আমি হয়েছিলাম সজীব। কিন্তু আপনারা নেই, কাকে আশ্রয় করে বাঁচব?'

তত্ত্বের জটিল ব্যাখ্যাকে দূরে সরিয়ে রেখে এমন অনাড়ম্বর বাচনে, এমন সরল উপমায় নিজেকে অনাবৃত করার আর্তি দেখে মনে হয়, রুক্ষ নিঃসঙ্গতার চেয়ে সত্তার সজীবতাই 'অন্তঃশীলা'র কেন্দ্রীয় পুরুষটির কাম্য। তাই যে মৈত্রী এতদিন তাঁর কাছে কথার কথা ছিল, আজ তার অর্থ তিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন। নিরালম্ব হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। খগেনবাবুও পারেন নি।

অবশ্য নিজের মনপ্রকৃতিকে বর্জন করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি, অবলম্বনের সন্ধানে হাত বাড়িয়েও সুজনের সঙ্গে তার্কিকতায় না জড়িয়ে পারেন নি। তাই চিঠির ভাষা হয়ে ওঠে যেন তত্ত্বগত এক প্রতিবেদন–

> 'আপনার ব্যাখ্যা ঠিক নয়, আপনি বলেছিলেন, মৈত্রী মানে ঘটকালী করা catalysis হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কার্যে নিজেকে নিঃশেষিত করতে পারি না। আমি কেবল সম্বন্ধের যোগসমষ্টি নই, কাট্যলিসিসের পরিবর্তন মাত্র অসম্পূর্ণ গুণাত্মক। আমার মিলনে মিলনকর্তা আছে। যেটা আমি নিজে। নিজেকে মিলনের জন্য উপযুক্ত করা চাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে আপনি তৃপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ হতে পারেন কি? মিলন করতে গেলেই দেখবেন নিজেই মিলিত

হচ্ছেন, কিন্তু সেটা নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও।'

'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের সমাপ্তি খগেনের এই চিঠির দীর্ঘ প্রসারিত অবয়বে। চিঠির বক্তব্যে তাঁর স্ব-বিরোধিতার ইঙ্গিত মেলে। সাবিত্রী তাঁর অতীত জীবনের সঙ্গী। আর রমলা তাঁর বর্তমানের এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আসন্ন ভবিষ্যতের অংশীদারও হতে পারেন। কিন্তু তার জন্য মানসিক আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হওয়া চাই। অথচ নিজের চিন্তন পরিসরে কখনো কি খগেনবাবু অপরকে স্থান ছেড়ে দিতে পেরেছেন? তিনি মনে করেন মিলনের জন্য, সাধনার প্রয়োদন। সম্পূর্ণতার সন্ধানের নামই মৈত্রী সাধনা। কবির ভাষায় creative unity। এই দার্শনিক ভাবনা থেকে তিনি নিজেই প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন দিয়ে গড়ে তোলেন চিঠির বয়ান–

> 'স্বাধীনতার অর্থ কি? অর্থ ঠিক কি জানি না। কেননা স্বাধীন হইনি। তবে স্বাধীনতার প্রয়োজন কি বলতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তি ও ভাবগুলি নানা কারণে কর্মে পরিণত হতে পারে না, অথচ পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। তর্কবুদ্ধির শান্তি সঙ্গতি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, কর্মে পরিণত হবার সুযোগ চাই, নচেৎ অশান্তি। এই হল স্বাধীনতার প্রয়োজন।'

মানুষের স্বাধীন সত্তার ভাবনা ভাবেন খগেনবাবু। অথচ তাকে বাস্তবায়িত করার তাগিদ কি সত্যিই তাঁর ছিল? তাহলে সাবিত্রী এবং রমলাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে কেন পুরুষতন্ত্রের নির্ধারিত ধ্যান-ধারণার বলয় থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন না? প্রকৃতির মধ্যে তিনি অনন্ত ও অনাদি সম্বন্ধের অভিব্যক্তি দেখেন। কিন্তু বাস্তব মানুষ সম্বন্ধে কোনো স্থিরতা বা বিস্তৃতির বোধ তাঁর নেই। তিরিশের দশকের বৌদ্ধিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সংকট থেকে উদ্ভূত এক ধরনের খন্ডিত চেতনার মানুষ খগেন। তাঁর চিঠিগুলি তাঁর ভাবনার সফল প্রতিনিধি।

'অন্তঃশীলা' ধূর্জটিপ্রসাদের আ-জৈবনিক উপন্যাস কিনা, এ প্রশ্ন পাঠকের মনে স্বাভাবিক জাগে। বিশেষত খগেনবাবুর মধ্যে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে কি না, সে কৌতূহল অমূলক নয়। খগেনবাবুর চিঠির চিন্তাচেতনার প্রবাহই এ জাতীয় কৌতূহলের কারণ। প্রসঙ্গত দুটি বক্তব্য আমাদের কাছে স্বরণীয়।

এক, লেখকের অনুজ ভাই একটি চিঠিতে লিখেছেন–''নায়ক খগেনকে অনেকে ধূর্জটিপ্রসাদের কিছুটা prototype বলে মনে করেন। খগেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ। লেখক এবং আমরা অনেকে তাই। কাজেই ঐ রকম ধারণা অমূলক নয়।...তবে বইয়ের মধ্যে যে সব দৃশ্য বা ঘটনার উল্লেখ বা বর্ণনা আছে, সেগুলিতে নিজের দেখা বা বর্হিজীবনের কোনো অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যা তিনি উপকরণ হিসাবে হয়তো ব্যবহার করেছেন। বাকিটা অর্ন্তদৃষ্টি ও কল্পনার ব্যাপার।''[৮]

দুই, 'অন্তশীলা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার স্বয়ং লেখক জানিয়েছেন– 'অন্তঃশীলা' আমি ভাবের বশে লিখিনি। এর মধ্যে না আছে আত্মকথা না আছে ভাগবত প্রেরণা। অথচ খুঁটিনাটি ঘটনার পিছনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। সে-সব অভিজ্ঞতা চিন্তার ভিতর দিয়েই চালু হয়ে এসেছে এবং মন যখন প্রধানত লেখকের তখন লেখকের মনোভঙ্গি ও ভাষা কিছু পরিমাণে তার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে মিল খাবে। আমার মন খগেনবাবুকে ধার দিয়েছি মাত্র।"[৯]

অর্থাৎ 'অন্তঃশীলা' সেই অর্থেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, যে অর্থে যে-কোনো রচনাই কোনো-না-কোনোভাবে লেখকের ব্যক্তগত অভিজ্ঞতার সারনির্মাণ। খগেনবাবুর মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা অভিজ্ঞান রেখেছেন, কিন্তু নিজেকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে আরোপ করেন নি। নিজের মনন দিয়ে অপরের চিন্তাপ্রবাহকে ধরবার চেষ্টায় উপন্যাসের পত্রাবলী হয়েছে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান।

তথ্যসূচি :

১. প্রমথ চৌধুরী–'মুখপত্র', 'সবুজপত্র', ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২১, বিজিত দত্ত সম্পাদিত 'সেরা সবুজপত্র' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ ১।

২. প্রমথ চৌধুরী– চিঠিতে লেখা বক্তব্য, অন্নদাশঙ্কর রায়– 'সবুজপত্রের যুগ' রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৯৯। প-. ৮৭

৩. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়– অন্তঃশীলা ভূমিকা, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড, দে'জ ১৯৭০।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠি। তপোধীর ভট্টাচার্য–অন্তঃশীলা আখ্যানের বিনির্মিত পাঠ, উত্তরধ্বনি, ২৫ বর্ষ ২০০৩, পৃ. ৮০

৫. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়–'অন্তঃশীলা' ভূমিকা, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় সং, দে'জ ১৯৭০ পৃ. ২৪০

৬. তদেব। পৃ ২৪১

৭. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়– কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, দেবারুণ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদের দাদামশাই, প্রসঙ্গ ধূর্জটিপ্রসাদ, জলার্ক সংকলন, ১৯৯৯। পৃ. ১৫৪।

৮. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়– মানুষ ধূর্জটিপ্রসাদ ঃ ঘরে বাইরে প্রসঙ্গ–ধূর্জটিপ্রসাদ, জলার্ক প্রকাশন, ১৯৯৯। পৃ. ২০০

৯. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়–গ্রন্থপরিচয়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। দে'জ ১৯৭০। পৃ. ২৪১।

বিভূতিভূষণ ঃ কথাসাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষ

মাধব সরকার*

সৃষ্টি যেমন আগে স্রষ্ঠার পরে সবার, তেমনি সাহিত্য আগে বাস্তবতার পরে কল্পনার। বিভূতিষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ সাহিত্য- সৃজনে বাস্তবতার মাঝে কল্পনার মিশ্রণে যে সাহিত্যধারা প্রবাহিত করলেন তা এক কথায় অভিনব। যুদ্ধ, রাজনীতি, বিপ্লব অপেক্ষা সাধারণ মানুষের কথা বলতেই তিনি বেশি আনন্দ পেতেন। তাই তো মহাযুদ্ধোত্তর কালে বসে তিনি পথের পাঁচালী কিম্বা আরণ্যক–এর মত উপন্যাস লিখতে পেরেছেন। গ্রাম-বাংলার বৃক্ষ-পল্লবের শ্যামলতা আর নদীধারার পেলবতার মাধে তিনি নিজেকে খুজলেন। তাঁর নীল আকাশের স্বপ্নমেদুর হাতছানি পাঠকের মুগ্ধ করল। তিনি সংকল্প করলেন- ''বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নর-নারী, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক....বাঁশবনের-আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঘেরা সজনেফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে–তাদের কথাই বলতে হবে। তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।'' একান্ত গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসই সংসারের প্রতি, দুঃখ-লাঞ্ছিত জীবনের প্রতি বিভূতিভূষণকে ফিরিয়েছে। এখানে প্রকৃতি আছে, সাধারণ মানুষের সরল করুন জীবনচিত্র আছে;। এই প্রকৃতি কখনো সুদূরের প্রতীক, অনন্তের প্রতীক; আবার কখনো অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা। প্রকৃতির এমন প্রতীকী রূপের ব্যবহার পাঠককুলকে মুগ্ধ করে। বিভূতিভূষণ এ ভাবেই বোধহয় মানুষের শাশ্বত জীবনবোধকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন।

বিভূতিভূষণের কাহিনিতে গ্রামীন সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো খাটো সুখ-দুঃখের ছবি ফুটে উঠেছে। পল্লীবাংলার এই বৈচিত্র্যহীন জীবন কাহিনি বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়, তথাপি বিভূতিভূষণের সাহিত্য নবমাত্রা পেয়েছে-প্রকৃতি ও মানুষের হাত ধরে। পমথনাথ বিশীর কথায়- ''প্রকৃতিকে জীবনের উপাদান রূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ।...পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন,...রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন,... রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমানে গ্রহণ করিয়াছেন।'' বিভূতিভূষণ প্রকৃতির হাত ধরেছেন জীবনকে আরও গভীর, আরও সত্যরূপে অনুভব করার জন্য। তাঁর ব্যক্তি জীবন ইতিহাসও তার সাক্ষ দেয়– ''নির্জন আকাশ ধূ ধূ মাঠ আর নিঃসঙ্গ ইছামতীর নিভৃত সাহচর্যে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরশুনা কলেজ।

প্রথম পরিচয়। পৃথিবীতে তিনি চিনতেন প্রকৃতির রহস্য আলোয়। তাই প্রকৃতির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত সহজ আর সজীব হতে পেরেছিল।" তবে দারিদ্রের সঙ্গে ঘর করেছেন বলেই বোধহয় নাখেতে পাওয়া মানুষের চিত্র এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কলমে। 'যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রসসঞ্চার করছে না'- তাকে তিনি বর্জন করেছেন।

তবে আমার মতে, ঈশ্বর বিশ্বাসী এই মানুষটির প্রকৃতিপ্রেমের মূলে আছে মানুষের প্রতি ভালবাসা। তাই তো ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা- 'যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস, এই ফুল-ফল, এই সুখ-দুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়া জগতের মধ্যদিয়ে বারবার যেন আসা-যাওয়ার পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়।' এইভাবে স্মৃতির রেখার সরমি বেয়ে তিনি পৌছে গেছেন -প্রকৃতির স্বর্গলোকে, শৈশবের আনন্দলোকে – যার প্রকাশ পথের পাঁচালী। এই উপন্যাসের সমগ্রটাই অপুর মুগ্ধ মনের যাত্রাপথের কাহিনি। আশৈশব প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বেড়েওঠা অপু কল্পনাও করতে পারেনা যে, এই নিসর্গ-প্রকৃতিকে, শৈশবকে, দুর্গাকে, নিশ্চিন্দিপুরকে একদিন ছেড়ে যেতে হবে। 'আরণ্যক'-এর যুবক সত্যচরণ ত্রিশহাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত দেবার দায়িত্ব নিয়ে লবটুলিয়া বৈহারে উপস্থিত হয়। এখানে অনন্ত নীল আকাশতলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য; আর ঘুমের ঘোরে কেবল অন্ধকারে শেয়ালের প্রহর গোনার শব্দ। প্রকৃতির এই নিভৃত কুঞ্জবনে টাকা নিয়ে প্রজা বসাতেই সত্যচরনের আগমন। তার হাতেই নির্জন বন্য প্রান্তর ধ্বংস হবে। বিভূতিভূষণ বলেন—''বন কোথাও কেটে ফেলেছে, একথা আমার ভাললাগে না। অর্থের জন্য প্রকৃতির হাতে সাজান এমন সৌন্দর্যভুমি বিনষ্টকরা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু না।" তাই তো অতন্দ্র প্রহরায় বন্য প্রাণীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এখানে টাঁড়বারোকে আনলেন। অপরদিকে অরণ্যধ্বংস রোধে আনা হোল যুগলপ্রসাদ কে, বলা যেতে পারে সত্যচরনের অনুশোচনার আগাম সান্ত্বনা। তবে ভুললে চলবে না, আরণ্যক যত না নৈসর্গিক বিস্ময়ের গল্প, তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবতার গল্প। এখানে যে এক জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে—ভাত যাদের কাছে বিলাস; মকাই দানা সিদ্ধ, বুনো শাক-পাতা, ফল-মূল যাদের খাদ্য, শীতের রাতে টালকরে রাখা ভূসির মধ্যে বাচ্চাগুলিকে আকণ্ঠ গুজে রেখে যাদের শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে হয়—এরা নিত্য দুর্ভিক্ষের মানুষ।

উত্তম পুরুষের রচিত 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের নায়ক জিতু, জীবনে যা দেখেছে; তাকে নিজের উপলব্ধি দিয়ে প্রকাশ করেছে। সে এখন মনে করে, ধর্ম একটি ক্ষমতাতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ক্ষমতাসন্ত্র বজায় রাখতেই ভক্তপ্রাণ সাধারণ মানুষকে রাশি কুসংস্কারের অন্ধকার কুঠুরিতে বির্সজন দেওয়া হয়। মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বৃত্তিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। জিতু দেখেছে, দেবতার পুজো কিভাবে মহান্তদের ফুলিয়ে

ফাঁপিয়েত তোলে, আর সরল বিশ্বাসী খেটে খাওয়া দরিদ্র মানষের প্রতনিধি নিমচাঁদেরা সামান্য সম্বল নিয়ে পুজোদিতে এসে আর ফিলে যেতে পারে না, কলেরায় মারা যায়। জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী, তাই তিনি ঠাকুর ঘরে বসে জপ-আহ্নিক করেন। অন্যদিকে মা মরেন বেলা বারোটা পর্যন্ত গোয়াল-আস্তাকুর ঘেঁটে। পুজোর বাসন মাজতে মাজতে মা ও বোনের করুণ অবস্থা দেখে জিতু মনে মনে বলতে বাধ্য হয়েছে–'আমার মনে হল ঠাকুরও শুধু বড় মানুষের জন্য।' জ্যাঠাইমাদের গৃহদেতা যেন তাদের বড় করে রেখেছিল, আর মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের কৃতদাসী। সত্যিকার ধর্ম, দেবতার সত্যরূপ এখানে – অনাচার ও মিথ্যের কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে। তবে এই জিতুর এক অলৌকিক ক্ষমতা আছে, যা ঘটবে তা সে আগে থেকে দেখতে পায়। কখনো মৃত মানুষদের উপস্থিতি তাকে চমকে দেয়, কখনো সে আগামি বিপদকে চাক্ষুস দেখতে পায়। এই শক্তিতেই জিতু দেখে পানীর শিয়রে বিছানায় লালপাড় শাড়ি পরে আধঘোমটা দিয়ে কে যেন বসে আছে। ঘরে আর সবাই থাকলেও কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু দেখা নয়, জিতুকে বলেছে, 'নির্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না।' পরে কাকিমার মুখে সব শুনে জিতু প্রথম বুঝতে পারে যে–''আমি সেদিন সত্যি সত্যি কাউকে দেখেছিলাম? তবে? এটা তাহলে আমার রোগ নয়।"

শৈশবে চা বাগানেই খ্রিষ্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে যিশুকে ভালোবাসতে শিখেছে। যিশুই ছিল তার কাছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। ফলে জিতুর মনে উদার ধর্মনীতির প্রবেশ ঘটেছিল, এবং সে মনে মনে প্রকৃত ধর্মের সন্ধানে, ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে বিচলিত হয়ে ওঠে। এইভাবে সে একদিন দ্বারবাসিনী বৈষ্ণব আখড়ায় পৌছে যায়। পরিচয় হয় মালতীর সঙ্গে, যার বাবা ছিলেন একজন 'মুক্ত পুরুষ'। মালতীও সারাজীবন নিঃস্বার্থ ভাবে সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। এই মালতীর মধ্যে জিতু ঈশ্বরের এক রূপ দেখতে পেয়ে ভালোবেসে ফেলে। সে বোঝে–''সেখানে ভাব নেই, ভালোবাসা নেই, হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই- সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই।" থাকবেই না। যে দাদা সারা জীবন সকলের জন্য নিজেকে উজার করে দিল, সেই নিতু মারাগেলে জিতু দেখে দাদার খাটের চারিপাশে অর্ধচন্দ্রাকারে সবাই দাঁড়িয়ে আছে–''শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরার সেই হীরু রায়, স্যালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। তার পরই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁদিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট কাকিমার মেয়ে পানী।" লেখক দেখালেন-ভালোবাসা দিয়ে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়, অলৌকিকও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ জগৎ সংসারে আচার-আচারণ,

ধর্ম-বিশ্বাস, বাছ-বিচার, ধনী-গরিব, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান–কিছুই পৃথক নয়, সকলই ভালোবাসার কাছে লীন।

অনেকটা জীবন পরের কাহিনি নিয়ে বিভূতিভূষণের অধিবিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস 'দেবযান। ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ বিভূতিভূষণ এখানে ছবির মতো তুলে ধরেছেন, পাঠককুল তা মানসপটে দর্শন করে বিস্মিত হয়। সাহিত্যিক অচিন্তকুমার সেনগুপ্তকে একটি পত্রে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন-''প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহু স্তর বিদ্যমান। বিশ্বে বহু লোক, বহু স্তর, বহু গ্রহ, মৃত্যুর পর যেখানে জীবের গতি হয়।" এ উপন্যাস পড়লে মানুষের মৃত্যু ভয় অনেক-টাই দূর যায়। কিন্তু মায়ের চোখে জলের মূল্য কম নয়। এই চোখের জলেই তো স্বর্গ-মর্ত্য নিমেষে এক হয়ে যায়। এবং ইচ্ছে করে–'আবার যদি জন্ম হয় তবে যেন ঐরকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে, অভাব-অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রাম্যনদী গাছ-পালা নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়'। দেবযানের স্বর্গ সৃষ্টিতে বিভোর হয়ে যে জগৎ বিভূতিভূষণ সৃষ্টি করে গেছেন, তা আসলে প্রেমের জগৎ। এই প্রেম হৃদয়ে সঞ্জাত না হলে ঈশ্বরের স্বরূপকেও উপলব্ধি করা যায় না। তবে বিভূতিভূষণ সাধক নন, তিনি শিল্পী। তাই সর্গলোকের তুলনায় সুখ-দুঃখে ভরা মর্ত্যলোকই তার কাছে বেশি মর্যাদার, বেশি প্রত্যাশার। উপন্যাসে নিম্নবিত্ত অর্থাৎ এক পুন্যাত্মার সঙ্গে পুষ্প ও যতীনের দেখা হলে তারা একসময় ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চলে অবতরণ করেন। সেখানে ভাদ্রমাসে গৃহস্থের উঠানে পচা কাদা দেখা যাচ্ছে রাখালেরা গরু চরাচ্ছে, তিন জন মহিলা ভুট্টাক্ষেতের ধারে ঝগরা করছে। এক জায়গায় দুটি ছোট ছেলে মেয়ে ভুট্টা চুরি করে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে খুব মার খাচ্ছে। দরিদ্রের এই দৃশ্য দেখে কষ্ট পেয়ে ক্ষেত্রস্বামীর মনে সদয় চিন্তা বিক্ষেপ করলেন এবং বললেন–'আহা, এদের তো বড় কষ্ট! কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি! যত দেখছি ততই এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার কি ইচ্চে জানো–'এদের মধ্যে মানুষ হয়ে থাকি। এদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করি।' মারী করেলির '' বইটি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। এখানে না খেতে পাওয়া মানুষের প্রতি লেখকের গভীর মমতা প্রকাশিত।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে কয়েকটি জিনিস ফিরে ফিরে এসেছে। যার মধ্যে একটি হোল–কৌলীন্য প্রথার বিভৎসতা এবং তার করুণ পরিনতি। প্রথম উপন্যাসের ইন্দির ঠাকরুণ থেকে শুরু করে ইচ্ছমতীর তিলুর বড় পিসি, নিস্তারিনী কেউই বাঁচে নি এর হাত থেকে। একজন বাহাত্তর-এর বুড়োর গলায় পড়লে, অপরজনকে টাকার লোভে বাব বিক্রি করেছে। অর্থাৎ এ প্রথা তে মেয়েদেরকে মানুষ বলে গণ্য করা হোত না। তাদের যেন ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-বিলাস কোনো কিছুই থাকতে নেই। তাই এর প্রতিরোধ বা বিরোধিতা কোথাও দেখা যায়নি।

মানুষকে ভালবেসে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলেই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা হবে বলে বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করতেন।

ভবানী বাড়ুয্যে, বাচ্চা ছেলেকে বিষয়াসক্ত থেকে দূর রাখতেচান। সকাল-সন্ধ্যা তারই প্রচেষ্টা করে চলেছেন। একদিন তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন - কাকে কাকে ভালোবাসিস? সে জানায়-বাবাকে, মাকে। ভগবানকে ভালবাসিস নে কেন? সে জানায় চিনিনে। এই শিশুটির স্পষ্টকথনের মধ্যেও ভবানী খুঁজে পায়–'ঠিক বলেছিস। না চিনে না বুঝে কাউকে ভালবাসা যায় না। পার্থিব জগতের কিছুই থাকবে না, কেউ থাকবে না, কেবল থাকবেন তিনি। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়, সমস্ত গতির মধ্যে স্থিতিশীল। তিনি খুঁজে চলেন, কোথায় তিনি আছেন। এক সময় - 'মনে হচ্ছিল এই আকাশ বাতাস নদী জলের পেছনে তিনি আছেন। এই খোকার মধ্যেও। ওকে আনন্দ দিয়ে আমি ভাবি তাঁকেই খুশী করেছি।' ভবানী গুরুর আশ্রয় ছেড়েছেন, সন্যাসীর পরিবর্তে গৃহস্ত হয়েছেন, তিন বোনকে বিবাহ করে ঘোর সংসারী হয়েছেন। মাঠয নদী বনঝোপ ঋতুচক্র, পাখী, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রির প্রহরগুলির আনন্দবার্তা তাঁর মনে এক নতুন উপনিষদ রচনা করেছে।-এখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা। আজ এই খোকার মধ্যে ঈশ্বরকে তিনি দেখতে পান।

অরণ্যপ্রেমী এই সাহিত্যিকের মধ্যে আজন্ম এক শিশুমন লুকিয়ে আছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে - ''শৈশব যার পকেটে নেই তার পক্ষে প্রতিভার নদিতে সাঁতরাতে যাওয়া অর্থহীন।" পথের পাঁচালী যদি জীবনে জেগে ওঠার গল্প হয়, তাহলে এমন কিছু পাঠক আছে যারা নিজেদের বাল্যকালকে অপুর হাতে তুলে দেবেন। কারণ এটি প্রেমের গল্প নয়, রূপময় প্রকৃতি বন্দনা নয়, নিছক দারিদ্রের কাহিনি নয়–এসবের ভিতর দিয়ে মানুষের বেড়ে ওঠার গল্প বলা যেতে পারে। বিভূতিভূণের জগৎ-প্রকৃতিজগৎ নয়, নিতান্তই মানুষের জগৎ –মানুষের মননের, চিন্তনের, অনুভবের উদ্বোধনে প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। প্রকৃতি ও মানুষকে একে অপরের পরিপূরক করে অঙ্কন করেছেন লেখক। প্রকৃতির আধারে মানুষের এমন আর একটি গল্প বিভূতিভূষণ লিখতে পারেননি। প্রকৃতির কোলে খেলে বেড়ানো, বেড়ে ওঠা ছেলেটির মনটাও ছিল নরম, বিশ্বাসী ও স্নেহপ্রবণ। তাই অমলাকে সে ঠোঁট ফউলিয়ে বলতে পারে-'কাল আসনি কেন?' এছাড়া বেশকিছু গল্প আছে যেখানে মর্তপ্রীতির অনন্য পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-যাচাই, দ্রবময়ীর কাশীবাস, বুধির বাড়িফেরা, প্রত্যাবর্তন, পিদিমের নিচে, যেখানে মাটির ডাকে ফিরে আসার ছবি আছে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের ঈশ্বরবিশ্বাস, প্রকৃতিপ্রেম-সম্মিলিত হয়েছে মানবপ্রীতিতে। তাইতো তাঁর রচনায় প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে— প্রয়োজন হয় না। তিনি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটিয়ে সুখি হতে বলেন। তাঁর মতে, দুঃশহ বাস্তব কিন্তু কখনোই শেষ কথা নয়, কষ্টিপাথরে যাচাই করলে ভয়ংকরতার মাঝে অমৃতসুধাও মিলতে পারে।

তিনি সাহিত্য কর্মে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুভূতি প্রবণতা ও হৃদয়াবেগকে স্থান দিয়েছিলেন। তাই তো উপন্যাস শেষ হলে তিনি কষ্ট পান। শেষবারের মত প্রুফ দেখা শেষহলে বলেন-'আজ সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। অপু, কাজল, দুর্গা, নীলা-এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল।'

পৃথিবী আজ যে পথে ধাবমান, তার করুন পরিনতি আমরা অচিরেই ভুগতে চলেছি। তাই মানুষের মনে শান্তি ও পরিবেশের সুস্থতা বজায় রাখতে ঈশ্বকবিশ্বাস ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতেই হবে। তাইতো বিদায়কালে সত্যচরণ মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশ্যে দূর থেকে নমস্কার করে বলে – 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়।' এযেন আধুনিক মানুষের হয়ে বিভূতিভূষণ প্রকৃতি-দেবতার কাছে ক্ষমা চাইছেন। বন কেটে বসতি বসায় প্রকৃতি ক্রমশ মানুষে কাছথেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রকৃতি-মানুষের এই অমোঘ ক্রম-বিচ্ছিন্নতা ঔপন্যাসিককে ব্যথিত করে। তাইতো আরণ্যকে-র বিপরীত ছবিও দেখতে পাই তাঁর সৃষ্টিতে (জাল)। যেখানে-নায়ক জীবিকার তাগিদে ঘুরতে ঘউরতে হাজারিবাগ এলে ভরহেচ নগরের অধিপতি রামলালের দেখা পেয়েছেন, যে প্রকৃতিকে ভালবেসে সভ্যজগৎ ছেড়ে সপরিবারে এখানে বাস করে। এই রামলাল প্রকৃতির মতো উদার, এনন্ত তার ভালবাসা, অপার তার প্রশ্রয়। সে যেন দিতেই জানে, প্রত্যাশা কাকে বলে জানেনা। এখানে প্রকৃতির অন্য রূপ-রামলাল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তবে রামলালের মৃত্যুর পর সবাই ভরহেচ ত্যাগ করেছে, অরণ্য আবার গ্রাস করেছে বসতবাড়িকে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির ধ্বংসে যেমন কষ্ট পেয়েছেন, তেমনি উৎফুল্ল হয়েছেন প্রকৃতির আদিম প্রবাহে। তাঁর বিশ্বাস মানব শিশুর সুসমঞ্জাস বিকাশ প্রকৃতির বিহনে কখনই সম্ভব নয়। তাইতো তাঁর কাহিনিতে রাজনৈতিক দলাদলি বা হিংস্রকার কোনো জায়গা নেই, আছে জীবন-সংগ্রামের কথা, প্রকৃত মানুষের কথা। এমন কি কিছু ক্ষেত্রে মানুষকে ঈশ্বরের আসনেও বসিয়েছেন।

গ্রন্থঋণ:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - দেজ পাবলিশিং-ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি - ২০১২।
২। ভট্টাচার্য, সুতপা ঃ কথাসাহিত্যের একলা পথিক বিভূতিভূষণ-পুস্তক বিপণি।
৩। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ঃ- বিভূতিভূষণঃ মন ও শিল্প - দেজ, জানুয়ারি -২০০৪।
৪। শেখর, সৌমিত্র সম্পাদিত ঃ -বিভূতিভূষণ ঃ কথা ও সাহিত্য–উত্তরণ, প্রথম প্রকাশ - ২০০৯।
৫। গুপ্ত ক্ষেত্র ঃ- বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৩য় খন্ড)।

৬। সেন, রুশতী ঃ বিভূতিভূষণঃ দ্বন্দ্বের বিন্যাস-প্যাপিরাস-তৃতীয় সংস্কারণ-নভেম্বর ২০১৩।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ঃ- (জন্মশতবার্ষিকী সং -১ম-১০ম খন্ড) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

৮। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমারঃ কালের প্রতিমা–দেজ, পাবলিশিং, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১০।

৯। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমারঃ- উপন্যাসে জীবন ও শিল্প-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় প্রক্াশ ২০০৮ বইমেলা।

১০। সেন, অরুন সম্পাদিত ঃ- বিভূতিভূষণ ঃ- আধুনিক জিজ্ঞাসা, সাহিত্য অকাদেমি-তৃতীয়, মুদ্রণ-২০০৯।

১১। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথঃ- দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য - দেজ, পাবলিশিং, তৃতীয়, মুদ্রণ ২০১০।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা / পালিত, মৌসুমী সম্পাদিত ঃ- আমাদের বিভূতিভূষণ–মিত্র ও ঘোষ, জানুয়ারি-১৯৯৭।

স্বর্গীয় হসনম্ ঃ রাজনৈতিক বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত বিশ শতকের সংস্কৃত প্রহসন

অর্ণব পাত্র*

প্রাচীন সাহিত্য সমালোচকগণ সাহিত্যের সামগ্রিক বিষয়কে দুটি প্রধান শ্রেনিতে বিভক্ত করেছেন—দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্যকাব্য দৃষ্টিগ্রাহ্য আর শ্রব্যকাব্য শ্রুতিগ্রাহ্য। মঞ্চে অভিনয় দর্শনের মাধ্যমে দৃশ্যকাব্যের রস আস্বাদিত হয়। তাই দৃশ্যকাব্য অভিনয়প্রধান। সাধারণ ভাবে নাটকই দৃশ্যকাব্য পদবাচ্য। আলংকারিক পরিভাষায় একে রূপক নামে অভিহিত করা হয়। তবে একে নাট্য এবং রূপ নামেও ভূষিত করা হয়। দশরূপ-কার ধনঞ্জয় নাট্য বলতে বুঝিয়েছেন-অভিনয়ের দ্বারা নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর অবস্থার অনুকরণ-অবস্থানুকৃতিনাট্যম।

কালিদাসকে সংস্কৃত কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যমনে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে দৃশ্যকাব্যগুলিকে মোটামুটি ৩টি যুগে ভাগ করা যায়—কালিদাস পূর্বযুগ, কালিদাস যুগ এবং কালিদাসোত্তর যুগ। কালিদাস পূর্বযুগে রচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম অশ্বঘোষ বিরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ এবং ভাসরচিত ১৩টি রূপক। কবিকুলগুরু কালিদাস রচিত নাটকের সংখ্যা ৩টি—মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্শীয় ও অভিজ্ঞান শকুন্তল। আর কালিদাসোত্তর যুগে বিরচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক, বররুচির উভয়াভিসারিকা, শূদ্রকের পদ্মপ্রাভৃতক, ঈশ্বরদত্তের ধূর্তবিটসংবাদ, শ্যামিলকের পাদতাড়িতক, শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দার্শিকা; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস; ভট্টনারাণের বেনীসংহার; ভবভূতির মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত; মুরারির অনর্ঘরাঘব; রাজশেখরের বালরামায়ণ, বালভারত, কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা; ক্ষেমীশ্বরের চন্ডকৌশিক; দামোদর মিশ্রের মহানাটক বা হনুমন্নাটক; কৃষ্ণমিশ্রর প্রবোধচন্দ্রোদয় ও তার অনুকরনে রচিত আরও কয়েকটি রূপক নাটক, যেমন যশঃপালের মোহরাজ পরাজয়, বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকের আনন্দরায় মখি রচিত বিদ্যাপরিণয় প্রভৃতি। সংস্কৃত নাটকের ক্ষত্রিষ্ণু বা অবক্ষয়ের যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাট্যকীর্তি হল বিলহণ রচিত কর্ণমুদ্ধরি। এছাড়া বৎসরাজের ত্রিপুরদাহ, সুভট রচিত দূতাঙ্গদ, কুলশেখর বর্মার সুভদ্রা ধনঞ্জয়, রামদেব ব্যাস রচিত শুভদ্রা পরিণয়, রামকৃষ্ণ কবি রচিত গোপালকেলি চন্দ্রিকা, রামেন্দ্রসূরির নলবিলাস এবং নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের নলচরিত্র প্রভৃতি।

*সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, আশুতোষ কলেজ।

প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মতো সংস্কৃত সাহিত্যেও আধুনিকতার প্রবাহমান গতিশীল ধারা লক্ষিত হয়। ঊনবিংশ, বিংশ তথা একবিংশ শতকেও সংস্কৃতে নাট্য বা রূপক সাহিত্য রচনার ধারা অব্যাহত। শুধু বিংশ শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে ৫০০টির ও বেশি সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে। আধুনিক কালে রচিত এই সব রূপকের বিষয়বস্তু হয়েছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সাম্প্রদায়িকতা, পরিবেশ দূষণ, সন্ত্রাসবাদ, মূল্যবোধের সংকট, আর্থ–সামাজিক সমস্যা, ধর্মীয় ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা, জাত পাত ভেদাভেদের সমস্যা প্রভৃতি। সমসাময়িক সমস্যা বা বাস্তব জীবন ও জগতের চিত্র এগুলিতে ধরা পড়ে। এগুলির মধ্যে অনেক গুলি আবার গতানুগতিকতা বর্জিত। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতের প্রতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ অনেক সংস্কৃত প্রেমী রচনা করে চলেছেন সংস্কৃত রূপক সাহিত্য।

আধুমিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য বিংশ শতকের নাট্যকার রূপে এক অতি পরিচিত নাম সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যয়। তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালে বর্তমান বাংলা দেশের যশোর জেলায়। তাঁর পিতার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এবং মাতা ছিলেন প্রমদা সুন্দরী দেবী। তিনি ছিলেন নিরহংকারী, ছাত্র দরদী শিক্ষক, সুদক্ষ নট, নাট্য নির্দেশক তথা একজন মৌলিক নাট্যকার। তাঁর সারস্বত জীবনের শুভ সূচনা ঘটে বিলম্বে, কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে তাঁকে একাধিকবার করতে হয়। তিনি সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে এক নতুন ঘরানার প্রবর্তন করেন। তিনি সংস্কৃত নাট্য জগৎকে চারটি নাটক উপহার দিয়েছেন–ধরিত্রি-পতি-নির্বাচনম্, অথকিম্, ননাবিতাড়নম্ এবং স্বর্গীয়হসনম্। তাঁর রচিত এই চারটি নাটকেই নাট্যরীতি তথা জীবনদর্শনের দিক থেকে গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত নাট্যচর্চা এবং অধ্যপনায় রত থেকে ১৯৯৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

স্বর্গীয় হসনম্ নাটকটির প্রারম্ভে 'নিবেদনম' অংশ থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গীয় প্রহসন' রচনাটির দ্বারা অনুপ্রানিত এবং প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধেশ্বর এটি রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই রূপকটি রাজনৈতিক বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে রচিত। এটি দশ প্রকার রূপকের অন্তর্গত প্রহসন শ্রেণীর রূপক। এটি সত্তরের দশকের জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রেক্ষিতে ররচিত। এই রূপকে মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। তাঁদের লোলুপতা, অন্যায়, দুর্নীতি পরায়নতা, কূটকৌশল, চক্রান্ত এই নাটকে ধরা পড়েছে। স্বর্গেক পেক্ষাপটে নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই ধরণের দূর্নীতি, চক্রান্ত, শুধু একদিনের বা এক দেশের চিত্র নয়, এই অবস্থা যুগে যুগে দেশে দেশে সর্বকালের অপরিবর্তনীয় শাস্বত চিত্র। এদের চরিত্রের সময় ভেদে, কোন পরিবর্তন হয়না। এই রূপকের চরিত্রগুলির নামকরণও তাৎপর্যরপূর্ণ–বহস্পতি, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র,

সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর, প্রভৃতি। নেতাদের চরিত্রের সুন্দর প্রকাশ আমরা দেখি এখানে। ক্ষমতালোভী, দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর, লোভী, কুচক্রী শাসকের পরিচয় এখানে পাই। বৃহস্পতির উক্তিটি থেকে জানা যায়– যে তাঁরা যতই মুখে আগে দেশের কথা, দলের কথা, তারপর নিজের কথা বলুন না কেন, আসলে সর্বত্রই আমি, আমি আর আমি। অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থরক্ষার চিন্তাই মনে পোষণ করেও মুখে দেশের কথা, দলের কথা প্রচার করে থাকেন। এই রূপকটি আধুনিক নাট্যরীতির অনুসরণে রচিত হয়েছে। এখানে বির্দীপাত্মক উক্তি প্রর্তকত্তী মধ্য দিয়ে হাসির ছলে কোথাও বিশেষ কোন সমস্যার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে আবার কোথাও আসার মূল্যবোধ ব্যক্ত হয়েছে।

চিরাচরিত ভারতীয় নাট্যরীতি অনুযায়ী এখানে বিশেষ কোন নাটকীয় কাহিনীর অবতারনা করা হয়নি। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সাহায্যে নাট্যকার এখানে সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে নিলর্জ্জ রাজনীতি, ভোটে জয়ী হবার জন্য ন্যায় নীতি, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অর্থ, সুরা, নারী প্রভৃতি উৎকোচ হিসেবে প্রদান করে নিজের দলবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছেন। সমাজের বাস্তব নগ্ন চিত্র তাঁর লেখনীতে ধরা পড়েছে। নাট্যকার এখানে দেখিয়েছেন সকলের লক্ষ্য নিজের দল, নিজের গোষ্ঠী যেন কোন বিভাগের দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, যেখান থেকে প্রচুর অর্থাগমের সুযোগ থাকবে, এমনকি কোনরকম রাজনীতির সাথে পূর্বসম্পর্কহীন চিত্রাভিনেত্রীও মন্ত্রী বা সাংসদ হচ্ছেন, কিভাবে মন্ত্রী সভায় অনাস্থ প্রস্তাব পেশ হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে এখানে। পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত পরিচয় এখানে মুখ্য হিসাবে না দেখিয়ে বা তাদের ব্যক্তিসত্তাকে গৌণ করে রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার প্রতি আস্থাকেই এখানে মুখ্য করে দেখানো হয়েছে।

এই নাট্যকার বহুবিধ সামাজিক সমস্যার দিক যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি পাশাপাশি সমাধানের দিকটিও নির্দেশ করেছেন। তিনি শাসক, নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছেন সেবাপরায়ণ হতে হবে, সেবার মানসিকতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আসতে হবে, তাঁদের মর্যাদা দিতে হবে। শঠতা, দুর্নীতি অন্যায়কে বর্জন করতে হবে। প্রয়োজনে বজ্রের থেকেও কঠিন হতে হবে, কঠিন অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাহলেই সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

'স্বর্গীয়হসনম্' প্রহসনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রোক্ত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আঙ্গিকগতভাবে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছাপ বা প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের শুরুতে নিজের অথবা অপরের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য অভিনেতাগণ দেবতা, দ্বিজ অথবা রাজাদের উদ্দেশ্যে যে আশীর্বাদ মূলক মঙ্গলশ্লোক পাঠ করেন, তাকে নান্দী বলা হয়। এই নাটকে কোন নান্দী শ্লোক নেই। এটি গতানুগতিকতাবর্জিত।

রূপকের চরিত্রগুলির সংলাপের মাধ্যমে বোঝা যায় আধুনিক ধুরন্ধর, চক্রান্তকারী, দাম্ভিক, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক শ্রেনির প্রতিনিধির পাশাপাশি ধুন্ধ ও পুঙ্গ প্রভৃতি কৃষক ও শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধিও আমরা দেখি। ভরতবাক্য সংস্কৃত রূপকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনয়ের বিষয়বস্তু বহির্ভূত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। রূপকের শেষে এই ভরতবাক্য উচ্চারিত হয়। এটি মঙ্গলসূচক। এর মাধ্যমে সকলের মঙ্গলকামনা করা হয় এবং এর মাধ্যমেই রূপকের সমাপ্তি ঘটে। এখানেও দেখি বৈতালিকের মুখে নাট্যকার জানিয়েছেন ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ ঘুচে যাক, জনকল্যাণকামী নেতার জয় হোক।

পরিশেষে বলা যায় নতুন আঙ্গিক, নতুন সংস্কৃত ভাষায় 'স্বর্গীয়হসনম্' রূপকটি রচিত হয়েছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অত্যাশ্চয় মেলবন্ধন এই রূপকে বিশেষভাবে আমাদের নজর কাড়ে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য - ঋতা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ২০১২
২। দশরূপক (ধনঞ্জয়), সম্পাদক ড. সীতানাথ আচার্য ও ড. দেবকুমার দাস, কলকাতা
৩। নাট্যশাস্ত্র (ভরতমুনি) ১, সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৯৭।
৪। সাহিত্য দর্পণ (বিশ্বনাথ), সম্পাদক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৮৬ (বঙ্গাব্দ)।
৫। স্বর্গীয় হসনম্ - বুড়োদা-ভণি্তম কলিকাতা, ১৯৭৭।
৬। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অথ কিম্ - ঋতা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০০৬।
৭। সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগ কলা - ড. কৃষ্ণা মিত্র, কলিকাতা ২০০৩।
৮। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস - ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ২০০০।
৯। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস - ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা ১৪০০ (বঙ্গাব্দ)।

নজরুল ইসলামের ছোটগল্পে প্রেমভাবনা

ব্যাসদেব ঘোষ*

মহাপ্রকৃতি সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনে প্রাণীকুলের যৌবন বসন্তে প্রেরণ করেন এক অনবদ্য আকর্ষণ। তির্যক প্রাণী জগতে যা শুধুই জৈবিক আকর্ষণ, মানবকুল তারই মধ্যে সঞ্চার করেছে হৃদয় শোভা। দেহকে আশ্রয় করে দেহকে অতিক্রম করে এক মানস লোকে যার অবস্থান। কালে কালে বহু বিবর্তনের পথে এই হৃদয় ভাবনা 'প্রেম' নামে নিজের পরিচয় নির্দিষ্ট করেছে। নরনারীর এই হৃদয় আবেদন বিভিন্ন ভাবে মানুষের কল্পলোকে বৈচিত্র্য সঞ্চার করে আসছে। যেমন স্থপতি তাঁর স্থাপত্যে, চিত্রকর তাঁর চিত্রকলায় তেমনি সাহিত্যিকও তাঁর সাহিত্যের নানান কৌশলে নিজের অনুভবকে প্রকাশ করেন। তবে প্রেমের এই অবস্থান হৃদয় লোকে হলেও শরীর-ই হয় তার আবরণ। শারীরিক নানা অঙ্গভঙ্গি বা ক্রিয়া কলাপেই তার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ একই সঙ্গে শরীর ও মন, প্রেমের গতিপথে আলোচ্য বিষয়। এবং এই দেহজ বা প্রেমজ আকর্ষণকে কেন্দ্র করেই শিল্প কুশলীরা তাঁদের ভাবনাকে ব্যক্ত করেন। কেউ মনের আকর্ষণকে প্রাধান্য দিয়ে দৈহিক গুরুত্বকে খর্ব করেছেন, আবার কেউ শরীরকেই মনের চালক শক্তি হিসাবে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শিল্পী নজরুল ইসলামও মানব মানবীর এই সম্পর্কটিকে নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন। আলোচ্যব্রবন্ধে নজরুল ইসলামের সাহিত্য আঙ্গিক ছোটগল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এবং তার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রেম সম্বন্ধে কোন ভাবনা পোষণ করেছেন তা দেখে নেওয়া যায়-

নজরুল তাঁর বিশ বছরের সাহিত্য জীবনে মোট ১৮টি গল্প লিখেছেন। গল্পগুলো তিনটি গল্পগ্রন্থে যথাক্রমে 'ব্যথার দান' (১৯২২), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৫), এবং 'শিউলিমালা'য় (১৯৩১) স্থান পেয়েছে।[১] গল্পের গঠন পারিপাট্যে সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে অভিনবত্বের পরিচয় মেলে। তবে বেশির ভাগ গল্পেই এসেছে নর নারীর সম্পর্ক। তিনি সামাজিক নানান টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে জয় যুক্ত করেছেন পাত্র পাত্রী বা নায়ক নায়িকার প্রেমকে। কিংবা বলা যায় সমস্ত গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবনা হৃদয় আবেদন। কিন্তু তাঁর গল্পের গতিপথ সোজা সরল নয়। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ঘটনায় যুক্ত হয়েছে নানান মোড়। তবে মূল কথাবস্তু প্রেম হলেও তিনি শরীরকে অনেকাংশেই উপেক্ষা করে, কাম গন্ধহীন মানসিক প্রেমকেই প্রকৃত প্রেম হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অবশ্য এর জন্য নানান পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে চরিত্রদের

*গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

চালিত করে তাদের মর্মকথা বের করে এনেছেন। তাঁর গল্পের পরিণাম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ট্র্যাজিক, অর্থাৎ মিলন হীন। কিন্তু তা হলেও প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধিতে কোনো ছেদ পড়েনি। বরং নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদের মধ্যদিয়ে তিনি এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন – ভালোবাসা মানে নায়িকার উপর অধিকার প্রয়োগ নয়, বরং তার মনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি।

তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পে দারা ও বেদৌরার হৃদয় আবেদন উঠে এসেছে। অনাথা বেদৌরাকে শেষ সময়ে দারার হাতে দিয়ে যায় তার মা। ভবঘুরে দারা বাঁধা পড়ে হৃদয় শৃঙ্খলে। শুরু হয়ে যায় দুই মনের আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্রিয়া। দুজনেই হৃদয় পাশে আটকা পড়তে শুরু করে- 'তারপরে মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্ম্মতলে একটু একটু ক'রে ভালোবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা।... মুখোমুখী বসে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না, মনে পড়ে কি সে সব বেদৌরা? তখন আপনি মনে হ'ত এই পাওয়ার ব্যথাই হ'চ্ছে সব চেয়ে অরুন্তুদ। তা না হলে সাঁঝের মৌন আকাশ তলে দুজনে যখন গোলেস্তানের আঙুর বাগিচায় গিয়ে হাসতে হাসতে ব'সতাম তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমেষে শুকিয়ে গিয়ে দুইটী প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভরে উঠত?'[২] এখানে দারার কথায় দুই কিশোর কিশোরীর হৃদয়ের প্রথম জাগরণ মুহূর্ত ধরা পড়ে। যখন শুধু কাছে আসার বা ভালো লাগার শিহরণটি পরস্পরের কাছে আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র। তাই হঠাৎ করে দুজনেই চমকিত হয়েছে। মনের গভীরে হয়ত অজানা আবেগটি প্রশ্ন শুরু করেছে। আর তখনই পরিবারহীন স্থানে লজ্জা পেয়ে দুজনেই হয়েছে বাকরুদ্ধ।

তবে প্রেমের এই পদপাত মুহূর্তটিকে সৃষ্টি করে তাকে পরিণতি না দিয়েই নজরুল তার শক্তি পরীক্ষার ময়দান তৈরি করেছেন। বেদৌরাকে দারার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন- 'এমন সময় তোমার মামা এসে তোমায় জোর করে আমার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল; আমার একটা কথাও বিশ্বাস করলে না। শুধু একটা উপেক্ষার হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, সে থাকতে আমার মত একটা ঘর-বাড়ী ছাড়া বয়াটে ছোকরার সঙ্গে বেদৌরার মিলন হতেই পারে না...আমার কান্না দেখে সে ব'ললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের দিওয়ান পড়ে প'ড়ে আমিও পাগল হয়ে গিয়েছি। তোমার মিনতি দেখে সে ব'ললে যে আমি তোমাকে যাদু ক'রেছি।'[৩]

যে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তাতে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে জল সেচন না করে বরং বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন একের পর এক। প্রথমেই তার মামার দ্বারা পরিবেশের বদল ঘটিয়েছেন। তার পর সেখানে স্থাপন করেছেন সয়ফুল মুলুক এর মত খলকে। যে কৌশলে বেদৌরার যৌবন উপভোগ করতে চায়। আর সঙ্গে সংযোজিত করেছেন বেদৌরার বয়স জনিত প্রবৃত্তি। দৈহিক চাহিদা। বলাবাহুল্য এ উদ্দেশ্যটিকেও

সফল করেছেন তিনি। বেদৌরাও সয়ফুলের প্রলোভনে ভুলেছে- 'তাই তো যে দিন পুষ্পিত যৌবনের ভারে আমি ঢ'লে ঢ'লে পড়ছিলাম, আর একজন এসে আমায় যাচঞা করলে, তখন আমার এই বাহিরের প্রবৃত্তিটা দমন করবার ক্ষমতাই যে রইল না! তখন যে আমি অন্ধ।'[৪]

অর্থাৎ প্রবৃত্তির বাসনায় ভেসে গেছে বেদৌরা। কোন পিছুটান তাতে বেড়া দিতে পারেনি। কিন্তু তার পরিসর অতি অল্প। খুব কম সময়ের মধ্যেই তার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে দংশন জ্বালা। আত্মগ্লানির দহনে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে সে। তার মুখে তাই হাহাকার শোনা গেছে- 'ওগো দেবতা, সেদিন তুমি কথায় ছিলে? কেউ এলো না শাসন ক'রতে তখন। হায়, সেই দিনই আমার মৃত্যু হ'ল! সেই দিনই আমি ভিখারিণী হয়ে পথে বসলাম।'[৫] কিন্তু এ হাহাকার বা আত্মগ্লানি চিরকালের নয়। খুব তাড়াতাড়ি প্রবৃত্তির মেঘ কেটে গেছে। তখন মনের আকাশে শুদ্ধ প্রেমের নিদর্শন হিসাবে একমাত্র দারার স্মৃতিই প্রকট হয়েছে। না, এর পরে আর কোনো খেলা যোগ হয়নি। বেদৌরা নিজের প্রকৃত প্রেম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েছে। শুরু করেছে অপেক্ষা দারার জন্য।

কিন্তু আজ যে অগ্নিদগ্ধ প্রেমের স্পর্শ বেদৌরাকে জীবনের কয়েকটি প্রতিঘাতে ছুঁয়ে গেছে দারার কাছেও তার কোনও পরীক্ষা হবে না? এ প্রশ্ন যেন নজরুল নিজেই করে, তাঁর গল্পে উত্তর দিতে চেয়েছেন। দেখতে চেয়েছেন পরপুরুষ সংসর্গের পর দারা বেদৌরাকে স্বচ্ছ মনে মেনে নিতে পারছে কিনা। না, এর কোনো সহজ সমাধান তিনি দেননি। দারাও অবিশ্বাসের জ্বলনে জ্বলছে। আর বারে বারে নিজেকে যুক্তির আবরণে নিবারণ করতে চেয়েছে। কিন্তু নিজের মনকে শান্ত করতে পারেনি- 'কিন্তু এত দিনেও নিজের স্বরূপ জানতে পারলুম না। আগে মনে ক'রতুম আমি বাত বড়- কত উচ্চ ! আজ দেখছি, সাধারণ মানুষের চেয়ে আমি এক রত্তিও বড় নই! আমারও মন তাদের মত অমনি সঙ্কীর্ণতা আর নীচতায় ভরা, নইলে আমি বেদৌরার এ দোষ সরল মনে ক্ষমা ক'রতে পারলুম না কেন? হোক না কেন যতই বড় সে দোষ! বাহিরটা তার নষ্ট হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভিতরটা যে তেমনি পবিত্র আর শুভ্র রয়েছে। অনেকে যে ভিতরটা অপবিত্র করে বাহিরটা পবিত্র রাখবার চেষ্টা ক'রে, সেইটাই হচ্ছে বড় দোষ। কিন্তু এই যে বেদৌরার সহজ সরলতায় তার ভিতরটা পবিত্র রয়েছে জেনেও তাকে প্রাণ খুলে ক্ষমা করতে পারলুম না, দোষ তো আমারই; কেননা আমি এখনও অনেক ছোট। জোর করে বড় হবার জন্যে একবার ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা তো হ'তে পারে নয় সে যে হৃদয় হ'তে নয়।'[৬]

একই সঙ্গে ভালো মন্দের লড়াই যেমন শোনা যায় তেমনি নিজের মানসিক অবস্থান চ্যুতির ক্ষেত্রটিরও আভাস পাওয়া যায়। নিজের মনের প্রকৃত সন্ধান পেতে দারা স্বেচ্ছাবরণ করেছে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে। আর বেদৌরাকে বলে গেছে- 'যদি কোন দিন হৃদয়

হতে ক্ষমা ক'রবার ক্ষমতা হয়, তবেই আবার দেখা হবে, নইলে এই আমাদের চির বিদায়।'[৭]

শোনা গেছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দারার নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে উন্মাদনায় মেতে ওঠার কথা। মনের কোনো বিপরীত আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্জয় আগুনে। নিজ শীররে বরণ করেছে শত শত আঘাত। এবং এক সময় হারিয়ে ফেলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দুই ইন্দ্রিয়- দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি। এরপর রয়ে গেছে শুধুই উপলব্ধির ক্ষমতা। আর তখনই জেনে গেছে মনের প্রকৃত অবস্থান। বেদৌরার সঙ্গে সয়ফুল মুলুককেও ক্ষমা করেছে। বেদৌরাকে জানিয়ে দিয়েছে- 'কামনায় হয় তো তোমার বাহিরটা নষ্ট ক'রেছে, কিন্তু ভেতরটা তো নষ্ট ক'রতে পারেনি। তা ছাড়া, ও না হ'লে তুমি আমাকে এত বেশী ক'রে চিনতে না, এত বড় করে পেতে না। বাইরের বাতাস প্রেমের শিখা নিবাতে পারে না। আরও উজ্জ্বল ক'রে দেয়। আর আমার অন্ধত্ব বধিরতা? ওর জন্যে কেঁদো না বেদৌরা, এ গুলো না থাকলে তো আমি তোমায় আর পেতাম না।'[৮] নিজেকে আজ পুরোপুরি চিনতে পেরেছে দারা। তাই আর কোনো ভাবনা নেই। নিজের এই সর্বজয়ী ভাবনায় আজ সে অভিভূত।

তাঁর অন্য গল্প 'জিনের বাদশা'। প্রেম যে শুক্তির বুকে মুক্তা সঞ্চার, এ গল্পের কেন্দ্র রয়েছে সেই ভাবনা। যা অকথন ব্যাধি হয়েও মনকে অমৃত পরশ দেয়। মনের সব গ্লানি, ক্লেদ দূর করে এক শুদ্ধ শান্তির লোকে পৌঁছে দেয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চুন্নু ব্যাপারীর তৃতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান আল্লা-রাখা ও নারদআলির মেয়ে চানভানু বা চাঁদ বানু। যদিও গল্পের পরিণতি কোনো মিলনাত্মক তথ্য সরাবরাহ করে না। কিন্তু মনের আকর্ষণ ক্রিয়া সহজেই পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে। নায়ক আল্লা-রাখা আদতে গ্রাম্য অশিষ্ট বালক। মানুষের ওপর নানাভাবে পীড়ন করাই তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য। লেখকের দেওয়া তথ্যে- 'আল্লা-রাখা পুঁথি প'ড়ে যতদূর আধুনিক হবার-তা হয়ে উঠেছিল। সে ঠিক চাষার ছেলের মত থাকত না, পরিষ্কার ধূতি জামা জুতো প'রে লম্বা চুলে তেরি কেটে, পান সিগারেট খেতে খেতে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় টইল দিত এবং কার কি অনিষ্ঠ করবে, তারি মতলব আঁটত। কিন্তু বয়স তার যৌবনের 'ফ্রন্টিয়ার' ক্রস করিলেও মেয়েদের ওপর কোনো অত্যাচার কোনোদিন করেনি। তার টার্গেট ছিল বেশির ভাগ বুড়োবুড়ির দল; বাড়ির মাঠের ফল-ফসল; গাছের আগা, ঘরের মটকা এবং রাত্রে বাঁশঝাড়, তেতুল গাছ, তাল গাছ ইত্যাদি।'[৯] এই ছিল তার সারা দিনের কাজ। তবে বাড়ির কাজে যেমন তার অবহেলা তেমনি বিপরীতে কাজ পণ্ড করার প্রবৃত্তি ছিল খুব। তাকে মাঠে পাঠালে তদারকি করতে গিয়ে কখনো পাকা ধানে আগুন ধরায়, কখনো নিজের ক্ষেতের ধান অন্য ক্ষেতে ভরতি করে। তাই সহজেই কাজের দায়ভার থেকে মুক্তি পায়। ওক সময় তার মা বিলাসিতার টাকা বন্ধ করলে বাবার কাছে হাত পাতে। কিন্তু পাওনা হিসাবে

পায় মার। আর সে রাতেই নিজের বাড়ীতে আগুন লাগলে ঘরের আগুনে সিগারেট ধরাতে দেখে বাপ ছুন্নু ব্যাপারী আবার প্রহার করতে শুরু করলে তার মুখ থেকে যে জবাব আসে তাতে পরবর্তীকালে তার গায়ে হাত দেওয়ার ব্যাপারটিও চলে যায়- 'তার বাবা তখন আল্লা-রাখাকে ধরে দুর্ম্মুশ-পেটা করে পিটোতে লাগল, সে তখন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে খেতে বলতে লাগল, যে সকালে মার খেয়ে বড়ডো পিঠ ব্যথা করাতেই ত সে পিঠে সেঁক দেবার জন্য ঘরে আগুন লাগিয়ে। আজ আবার যদি পিঠ বেশী ব্যথা করে, পাড়ার কারুর ঘরে আগুন লাগিয়েও ব্যথার সেঁক দিতে হবে।'[১০] এই ছেলেই যে পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারেরও ত্রাস হয়ে উঠেছিল সে-ই একদিন গ্রামের মেয়ে চানভানুর হাসিঠাট্টার সামনে নিজেকে বিপন্ন বোধ করে। আল্লা-রাখার চুলের বিচিত্র স্টাইল এর দিকে কটাক্ষ করে বলে ওঠে–''কেশরঞ্জন বাবু আইছেন গো, খাড়ুলিডা লইয়া আইও।"[১১] বলেই সুর করে বলে ওঠে–

''এস কুড়ুম বইয়ো খাটে,
পা ধোও গ্যা নদীর ঘাটে,

পিঠ ভাঙবাম চেলা কাঠে!"[১২] বলেই হাসির ঝলকে নিজের ঘরে ঢোকে। আর আল্লা-রাখা বিপন্ন হয়ে ওঠে। জীবনের প্রথম পরাজয় মনে দাগ কাটে। প্রতিবেশী সকলেই ধীরে ধীরে 'কেশরঞ্জন বাবু' বলে ডাকতে শুরু করে। কিন্তু আল্লা-রাখা গ্রামের সকলের উপর তার নিজস্ব রীতিতে অর্থাৎ দামালপনায় শোধ নিলেও চানভানুর বাড়িকে রেহাই দেয়। আসলে মনে ঘটে গেছে বৈপ্লবিক ঘটনা। হঠাৎ চানভানুর দুঃখে আনন্দ না পেয়ে ব্যথা পেতে শুরু করেছে–'সেদিন দুপুরে যখন চানভানু আরিয়ল খাঁতে স্নান করতে যাচ্ছিল, তখন তার ম্লাস মুখ দেখে আল্লা-রাখা যেমন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠল, তেমনি তার বুকে কাঁটার মতো কি একটা ব্যথা যেন খ'চ করে উঠল।'[১৩] এরপর আল্লা-রাখা মুক্তি পায়নি। নানা উপায়ে চানভানুকে আকাঙ্খা করেছে। বিপরীতে চানভানুও আল্লা-রাখার নানান আচরণে বিহ্বল হতে শুরু করে। তার ভাবনায়ও পরিবর্তন আসে- 'অনেকটা দূরে অশ্বত্থ গাছটা। তবুও সে স্পষ্ট দেখতে পেল, অশ্বত্থ গাছটার ওধারের ডাল থেকে কখন সে এ ধারের ডালে এসে ওরই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কি বালাই! চানভানুর মনে হতে লাগল, ও বুঝি আর কিছুতেই জল ছেড়ে উঠতে পারবেনা। ওকে তো আরও কতবার দেখেছে, ওরই সামনে সাঁতরেওছে এই নদীতে; কিন্তু এ লজ্জা-এ সঙ্কোচ ত ছিল না ওর।'[১৪]

এর পড়ে হঠাৎ-ই চানভানুর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় পাশের গ্রামের ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে। নিরূপায় হয়ে পড়ে আল্লা-রাখা। নানান ফন্দি আঁটতে শুরু করে কীভাবে চানভানুকে নিজের করা যেতে পারে। তবে সেখানে সরাসরি কোনো জোর খাটায়নি। বরং কৌশল অবলম্বন করেছে। প্রথমেই নদীর জলে ভয় দেখিয়ে অচেতন চানভানুকে

বাঁচিয়ে আল্লা-রাখা যেমন তার পরিবারের তেমনি তার মনেও এক বিশেষ জেয়গা করে নেয়। তারপরে রাত্রি অন্ধকারে তালগাছ থেকে জিনের বাদশা হয়ে ভয় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার প্রেস থেকে জিনের বাদশার নামে ছাপা বাণী প্রেরণ করে তার পরিবারকে আল্লারাখার সঙ্গে বিবাহের নির্দেশ দেয়। কিন্তু এ সব কিছুই পণ্ড করে দেয় ছেরাজের মতলবী মন। অনুমান করে হয়ত কোনো কুমতলবীর এমন কাজ। তাই জেদের সঙ্গে বিয়ে সম্পাদন করে চানভানুর। এর পড়ে আর অন্য কোনো বিশেষ ঘটনার কথা নেই। যা আছে তা আল্লা-রাখার পরিবর্তনের কথা। গ্রামের অশিষ্ট যুবকের হঠাৎ ভোল বদলে যায়। শান্ত শিষ্ট কর্মকুশলী মানুষ হয়ে ওঠে। আর কোরো ক্ষতি চিন্তা নয় বা চানভানুকে না পেয়ে অন্য কোনও উপায় অনুসন্ধান নয়, বরং সেই সব আধুনিক রুচির বদল ঘটিয়ে চলে আসা গ্রামীণ মানুষের জীবনকে বেছে নেয়- 'চানভানুর যে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন সকালে আল্লা-রাখার বাপ মা ভাই সকলে আল্লা-রাখাকে দেখে চমকে উঠল। তার সে বাবরি চুল নেই, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পরণে একখানা গামছা হাতে পাঁচনি, কাঁধে লাঙল।'[১৫]

প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রেম ভাবনা বা তার বিবিধ বহিঃপ্রকাশ কত ভাবে যে হতে পারে তেমনি এক দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে তাঁর 'রাক্ষুসী' নামক গল্পে। প্রেমের গতিপথের সীমা রেখা অর্থাৎ কোন পথে তা চলে কিংবা সে পথের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেক সময়ই আমাদের যৌক্তিক মন প্রশ্ন করে। এবং উত্তর হিসাবে অবশ্যই তাতে পাগলামির সিলমোহর বসিয়ে দেয়। কিংবা মনের ব্যাধি হিসাবেই তাঁর পরিচয় নির্দিষ্ট করে। কিন্তু প্রেম-পাশে বদ্ধ মন তার কাজের সমালোচনায় নিজেকেই সমর্থন করে। সেখানে দোষ গুণের উর্দ্ধে তার অবস্থান। 'রাক্ষুসী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি সংসারী নারী। স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে তার সংসার। সংসারের আয় উপায় বা কল্যাণ কামনাই তার একমাত্র ভাবনার বিষয়, সেখানে অন্য কোনো ভাবনা প্রবেশ করে না- 'নাইবা হলুম জমিদার। আমরা ত কারুর কাছে ভিক্ষে করতুম না, চুরি দারিও করতুম না। নিজের মেহনতের পয়সা নেড়ে চেড়ে খেতুম। নিজে খেতুম, আর পালে, পার্ব্বণে যেমন অবস্থা দুদশটা অতিথি ফকিরকেও খাওয়াতুম। আহা ওতেই ত আমার বুক ভরে ছিল দিদি! লোকে বলত আমি নাকি বড্ড 'কিরপণ', কারণ আমি একটী পয়সা বাজে খরচ করতুম না। তা বললে আর কি করব, তাতে আমার বয়ে যেত না।'[১৬]

এমন সংসার নিয়েই বেঁচে ছিল সে। সংসারকে বেঁধে রেখে মঙ্গল চিন্তা-ই ছিল তার ভালোবাসা। কিন্তু হঠাৎ করে সে সবই ভেঙে যায় স্বামীর পরনারী আসক্তিতে। স্বামীর ভোলা মন বা অল্প বুদ্ধির জন্য বার বার কাজের বেলায় তিরস্কার করলেও সেখানে স্বামীর প্রতি কোনো মানসিক বিবাদ ছিল না। সব সময়ই ভিতরে এক ভালোবাসা বজায় ছিল। একারণেই স্বামীর পরনারী আসক্তির কথা শোনা মাত্র ভেবেছে- 'অমন শিবের

মত সোয়ামী আমার শেষে এমন কাজ করে ফেললে, যা বুন, তুই কেন- আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মত অমন সোজা লোক পেয়ে কে কি খাইয়ে দিয়ে তাকে যে অমন করে দিয়েছিল, ত আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই।'[১৭] তার উক্তিতে স্পষ্ট সেখানে স্বামী নয় বরং সে-ই সজাগ না থাকার কারণে অন্যে তার স্বামীকে বশ করেছে। কারণ তার স্বামী বরাবরই সরল সাধাসিধা মানুষ। আর তার সঙ্গে রয়েছে তাদের সংসারে টাকার প্রাচুর্যের রটনা– 'আমাদের ঐ টাকার লোভেই ঐ রাঁড় হয়ে ষাঁড় হওয়া ছুঁড়িটা ঐ শিবের মত সোজা ভোলানাথ সোয়ামীকে আমার পেয়ে বসল।'[১৮]

তাই এখন চিন্তা, স্বামীকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা। প্রথমেই বরাবরের মত শাসনের হাত ধরেছিল। স্বামীকে ঝাঁটাপেটা শুরু করে। কিন্তু বিপরীতে স্বামীর প্রত্যাঘাত তাকে নিজের অবস্থান থেকে চ্যুত করে। এক লহমায় ভেঙে যায় পূর্বের বিশ্বাস- 'আমি সে দিন তাকে রাতে খুব ঝাঁটাপেটা করলুম। ও বুন! যে অমন মাটীর মানুষ সাত চড়ে যার রা বেরোত না সেও কিনা সেদিন আমার এই ঝুঁটি ধরে একটা চেলাকাঠে উঃ সে কি মার মারলে! কাঠটার চেয়েও বেশী ফেটে ফেটে আমার পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল! কিন্তু সত্যি বলতে কি, তখনকার এত যে বাইরের বেথা, তাত আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেন না আমার বুকটা তখন আরও বেশী ফেটে গিয়েছিল। আমি যে দিন স্পষ্ট বুঝলুম আমার নিজের সোয়ামী আজ পর হ'ল, আমি দেখতে পেলুম আমার কপাল পুড়েছে।'[১৯] এরপরে তার স্বামীকে অনুরোধ উপরোধ করতে শুরু করে। নিজের সংসারের কথা শোনায়। কিন্তু তাতেও ফল হয় না। তখন তার মনে একটাই সমাধান সূত্র হাজির হয়, তা হল স্বামীকে নরকের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে, নিজে পাপের পথে পা দিয়েও। কারণ তারই দায়িত্ব স্বামীর ভালোমন্দ দেখা। তাকে রক্ষা করা। ধর্মত সেই তার স্ত্রী। ভগবানের কাছেও তাকে জবাব দিহি করতে হবে। তাই উপায় হিসাবে একটিই পথ সামনে আসে- স্বামী হত্যা। যা একই সঙ্গে সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে- 'ভাবতে লাগলুম কি করা যায়? একটা দেবতার মত লোক সিধা নরকে যাচ্ছে এক এক পা করে আর বেশী দুর নাই, অথচ ফিরাবার কোন উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয়? তাছাড়া আমি আর তার 'ইস্ত্রি' আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে; আমার সোয়ামী যদি বেপথে যায়, ত আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্ম্মত আমি তো দায়ী। ধর আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি তাহলে তার ত আর কোন পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার। তা হোক সোয়ামীর পাপ তার 'ইস্ত্রি' নেবে না ত কি-নেবে এসে শেওড়া গাছের ভূত?'[২০]

একজন সাধ্বী রমণীর প্রেম ধরা পড়ে। ন্যায়ত স্বামীর ভালো মন্দ চিন্তা করা তার অধিকার এবং তার জন্যে নিজে পাপ করলেও তার কোনো অনুশোচনা নেই। বরং সে

তার স্বামীকে রক্ষা করেছে, এটিই তার কাছে প্রধান বিচার্য বিষয়। এবং তার বিশ্বাস, এক দিন একথা প্রকাশ পাবে সে কিছু ভুল করেনি। পরবর্তীকালে জেল মুক্তির প্রমাণ দিয়ে মাখন দি'কে সেকথাই বোঝাতে চায়- 'তারপর দিদি, কোন জজ নাকি সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে দিল্লীর বাদশাহী তকতে বসলেন, আর সব কয়েদীরা খালাস পেল। আমিও তাদের সাথে ছাড়া পেলুম!

দেখলি দিদি ভগবান আছেন! তিনি জানেন আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজেকে সোয়ামী দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ওপথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক আমি আর আমার ভগবান এই দুই জনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সতিকার বিচার।'[২১] হয়ত বাহ্যিক দিক দিয়ে তার কাজ সমালোচনার দাবি করে এবং তাতে তাকে দোষযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার অন্তর আবেদনে সে একজন সাধ্বী। এতেই তার সাংসারিক প্রেম জয়যুক্ত হয়েছে।

'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পটি 'রাক্ষুসী' গল্পের মতই এক চরিত্রের কথনে রচিত। সেখানে যেমন একজন প্রতিব্রতা স্ত্রীর দৃষ্টিতেই সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা হয়েছে, এক্ষেত্রে একজন পুরুষ এসেছে। তার নিজের মনের কথা চিঠিতে প্রেয়সীর কাছে প্রেরণ করতে চেয়েছে। রাজবন্দী সে। বন্দী হয়ে শেষ চিঠি লিখছে পূর্বের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে, মনের সমস্ত ভাবনার পরিচয় দিতে। তবে এক্ষেত্রে চিঠির কোনো প্রত্যুত্তর বা প্রত্যাশা নেই। শুধুই নিজের জীবনের উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। একজন নারী, প্রেমিক পুরুষের জীবনের বা মনের কতটা অংশ অধিকার করেছিল তারই পূর্ণ স্বীকারোক্তি। এ ভালোবাসা শর্ত হীন। শুধু নিজের কথা, নিজের মনের ভাব। সেখানে কোনো দোষরোপ নেই। বরং নিজেকেই মেলে ধরা। নিজের মনের অবস্থান বিচার করা। নায়ক ভালোবেসেছেন এক রমণীকে। কিন্তু সে জানে না তার প্রেয়সীর মনের কথা। তাতে সে কুণ্ঠিত নন। কারণ তার কাছে ভালোবাসা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়। জোর করে মনের মধ্যে রোপণ করা চলে না, তা আসে কোন অজানা নিয়মে- 'আমি একটুক্ষণের জন্যেও ভেবে দেখিনি, তুমি এ পরাজিত বিদ্রোহীর নৈবেদ্য মালা হেসে গ্রহণ করবে, না পায়ে ঠেলে চলে যাবে। তুমি যদি আমায় ভাল না বাসতে পার তার জন্যে ত তোমায় দোষ দিতে পারিনে। আমি জানি, খুব জানি প্রিয়, যে কোন মানুষেরই মন তার অধীন নয়। সে যাকে ভালবাসতে চায়, যাকে ভালবাসা কর্ত্তব্য মনে করে, মন তাকে কিছুতেই ভালোবাসবে না। মন তার মনের মানুষের জন্যে নিরন্তর কেঁদে মরছে, সে অন্যকে ভালবাসতে পারে না।'[২২] তাই নায়ক নিজের মনের শান্তিতেই ভরপুর। প্রেয়সীর মনের কথা তার অজানা থাকলেও ব্যথিত নন- 'যার উপর অভিমান করি, সে আমার এ অভিমান দেখে হাসবে, না দু'পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবে, সে-দিকে ভ্রুক্ষেপও করি না। চেয়েও দেখি না, আমার এত ভালোবাসার সম্মান সে রাখবে কি না, শুধু নিজের ভালবাসার গরবে আর অন্ধতায় মনে

করি, সেও আমায় ভালোবাসে।'[২৩] অর্থাৎ ভালোবাসার মূল মন্ত্র তার উপলব্ধিতে। তাই তার কাছে প্রিয়তমার ব্যবহার বা মন অতটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা নিজের উপলব্ধি।

জানা যায় গল্পের নায়কের জীবনে বহু নারী এসেছে ভালবাসার দাবি নিয়ে। কিন্তু তিনি পালিয়ে এসেছেন সেখান থেকে। কারণ তাঁর মনে হয় সেখানে প্রকৃত ভালোবাসা থাকবে না। আসলে তার মনে পূর্বে থেকেই অন্য কেউ বিরাজ করছে। তাই অন্য কোনো নারীর কাছে এগিয়ে যাওয়া হয়নি। এমনকি আর কাউকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবেও বেছে নেননি। বিয়ের ব্যাপারে তার ভাবনা- 'আমার মনে হয় বেচারাদের শতকরা নব্বই জনই যেন জানে না আর জানতে চায় না যে, যে মানুষটীকে নিয়ে এতদিন ঘরকন্না ক'রছে, সেই মানুষটীর মনটীই তার নয়। দুই জনাই দুই জনের মন কোন দিন বোঝেনি, বুঝবার দরকারও হয়নি। এত কাছকাছি থেকেও তাই - মনের দেশে দুই জনের সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই ফাঁকি আমার চোখে যে দিন ধরা পড়েছে, সেই দিন থেকে আমি আর কাউকে সাথী করে ঘর বাঁধতে সাহজ পাচ্ছিনে।'[২৪] তাই তার মনে অন্য কেউ স্থান পায়নি কোনো দিন। নিজের মনের ভাবনাতেই তিনি মশগুল। আজ নিজেকে প্রকাশ করে তার শান্তি। তবে তার একটি সুপ্ত ইচ্ছা চির অপূর্ণ রয়ে গেল- 'আজ আমি বড় সুখে মরতে পারতাম, যদি আমার এই চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ির ক্ষণেও জানতে পারতাম তোমার সত্যিকার মনের কথা।'[২৫] এই চির অপূর্ণতা নিয়েই তার ভালোবাসার বন্ধন অটুট থেকেছে। সত্যিকার ভালোবাসার গায়ত্রী মন্ত্র বোধ হয় তার ব্যক্তিগত এই আবেগ। সেখানে কোনো জোর না থাকলেও ভালোবাসার পবিত্রতা রয়েছে।

তাঁর 'শিউলি-মালা' গল্পটিতেও রয়েছে প্রেমের স্পর্শ। অন্যান্য গল্পগুলির মত এটিও পরিণতি পায়নি। কিন্তু নায়ক নায়িকার মধ্যে ভালো লাগার শিহরণ ছুঁয়ে গেছে। গল্পের নায়ক একজন মুসলিম যুবক। পেশায় ব্যারিস্টার। নেশায় সুকণ্ঠ গায়ক ও সঙ্গে দাবা খেলায় ওস্তাদ। কলকাতায় তার বাড়ি। ব্যারিস্টারি পাশ করেই শিলং বেড়াতে এসেছে। আর সেখানেই খোঁজ পেয়েছে ভালো দাবারু একজনের, যিনি একজন রিটায়ার্ড অধ্যাপক। এই মিস্টার মুখার্জি নামের অধ্যাপকের বাড়িতে দাবার আসরে এসেই দেখা হয়েছে তাঁর একমাত্র তরুণী কন্যা শিউলির সঙ্গে। আর তখনি ঘটে গেছে ভালোবাসার প্রথম স্তর পূর্বরাগ। এরপরে ঘটনাক্রমে গানের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় ঘটিয়েছে মনের। কোন অলক্ষ্যে ছুঁয়ে গেছে দুই মনকে। কিন্তু সামাজিক নিয়মে হিন্দু মুসলমানের প্রেম স্বীকৃতি পায়না। তাই প্রথম চরণেই শোনা গেছে বিচ্ছেদের সুর- 'ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া- যত ভালোবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলিই ধূলায় ঝরে পড়বে।

এ যেন পরীর দেশের স্বপ্নমায়া চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে।

এ যেন মায়া মৃগ- ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে।'[২৬] অর্থাৎ বিদায় ধ্বনি

তাদের প্রতি পদক্ষেপে। শিউলিও তাদের ভালবাসার ক্ষণিকতার জন্য প্রিয়পুরুষকে শিউলিফুল উপহার দেয় নিজের স্পর্শের সঙ্গে। বিদায় বেলায়ও তারা দুজনে তাদের ইঙ্গিতপূর্ণ স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বিরহ কথা ব্যক্ত করে-

'চৌধুরী সাহেব উঠে যেতে আমি বললাম- ''আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন এমনি আশ্বিন মাস - এমনি সন্ধ্যা আসবে- তখন কি করব বলতে পার?

শিউলি তাঁর দুচোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যে উজাড় করে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল- ''শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও!''

আমি নীরবে সায় দিলাম - তাই হবে ! জিজ্ঞাসা করলাম- ''তুমি কি করবে?'' সে হেসে বললে, আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে!''[২৭] বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাদের প্রেম ক্ষণিকের হয়েও ভালোবাসার স্পর্শে তাদের কাছে চিরকালীন হয়ে উঠেছে। তাই ক্ষণিকের ব্যথাতে দুজনেই ভারাক্রান্ত।

আসলে নজরুল প্রত্যেক চরিত্রকে তাঁর সাহিত্যের বীক্ষণাগারে এনে পরীক্ষা করেছেন। এবং তাদেরকে সহজে মুক্তি দেননি বরং ভালোবাসার শর্তে তাদের মন পরীক্ষা করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত মনকেই প্রধান স্থানে বসিয়েছেন। প্রত্যেক গল্পেই নায়ক নায়িকার মনে প্রেমের সঞ্চার করে তাতে নানান অভিঘাত যুক্ত করে তা কতটা ভারবহ, তাই দেখতে চেয়েছেন। 'ব্যথার দান' গল্পে যেমন দারা ও বেদৌরা দূরে সরে গিয়েও ভালোবাসার আগুনে খাঁটি হয়েছে, তেমনি 'জিনের বাদশায' আল্লা-রাখা চঞ্চল অপরিণত মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে শান্ত সুবোধ মানুষ হয়েছে। আর 'রাক্ষুসী' গল্পেও স্ত্রী, স্বামীর পাপ আটকাতে নিজে পাপের পঙ্কিলে নেমেছে। 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পেও ভালোবাসার মূলকথাই উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে 'শিউলি ফুল' গল্প ব্যাথা ভরা আকর্ষণেই সমাপ্ত। নজরুলের সব গল্প এই ভালোবাসার কথা নিয়েই সমাপ্ত। তিনি যেন কান ধরে শাসন করেছেন শরীরী আবেদনকে। তাঁর গল্পে শরীরী কথা অনুপস্থিত। যদিও আজকের একবিংশ শতকের প্রধান কথা, শরীরের হাত ধরেই মনের গহনে যাত্রা। এবং মনের আগে, কেউ কেউ শীররকেই ভালোবাসার প্রথম সিঁড়ি বলতে চেয়েছেন। তাই আজকের যুগে তাঁর গল্প তীব্র সমালোচনার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ভালোবাসার মূল শর্তে হয়ত তিনি উপেক্ষা যোগ করেছেন কিংবা শরীরী আবেদন যোগ করতে ভয় করেছেন। তবে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে হয়ত সে যুগের ভালোবাসার সংজ্ঞায় এ প্রশ্নচিহ্ন বসানো যায় না। তাই শরীরী আবেদন উপেক্ষা করে মনের দাবীকেই ভালোবাসার মূল মন্ত্র হিসাবে মেনে নিতে হয়।

তথ্য সূত্র:

১। বরুণকুমার চক্রবর্তী, সাহিত্য অন্বেষা, প্রসঙ্গঃ নজরুলের ছোটগল্প, প্রথম প্রকাশ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৮৪।

২। নজরুল ইসলাম, নজরুল গল্প সমগ্র, ব্যথার দান, চতুর্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, নভেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১০।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা -১৪-১৫।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা -১৭।
৭। তদেব।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ২২।
৯। নজরুল ইসলাম, নজরুল গল্প সমগ্র, জিনের বাদশা, চতুর্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, নভেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৬৪।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৫।
১১। তদেব।
১২। তদেব।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৬-৬৭।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৭।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৭।
১৬। নজরুল ইসালাম, নজরুল গল্প সমগ্র, রাক্ষুসী, চতুর্থ মুদ্রর্ণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, নভেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১২২।
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৩।
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৪।
১৯। তদেব।
২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৫।
২১। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৬।
২২। নজরুল ইসলাম, নজরুল গল্প সমগ্র, রাজবন্দীর চিঠি, চতুর্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, নভেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৭৩।
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭১।
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৫।
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭।
২৬। নজরুল ইসলাম, নজরুল গল্প সমগ্র, শিউইল মালা, চতুর্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, নভেম্বর, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৯৮-৯৯
২৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০০।

বাংলা ছোটগল্পে নিম্নবর্গ : প্রসঙ্গ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দেবশ্রী সাহা*

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ সৃষ্টির প্রাক্‌লগ্নের কাল প্রবাহের মধ্যে নিহিত আছে নিম্নবর্গীয় মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস। মানুষের এই বহমান জীবনের প্রতিটি স্তরেই লক্ষ করা যায় শ্রেণিবিভক্তসমাজের চেহারা। সমাজের উপরিবর্তীদের কাজই হল নিম্নবর্তীদের শোষণ ও শাসন করা। বর্ণগত, গুণগত পেশা অনুযায়ী এই ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই ভেদাভেদের অন্তে টিকে থাকে সমাজের একেবারে নিম্নশ্রেণি মানুষ— এরাই নিম্নবর্গ নামে পরিচিত। আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নিম্নবর্গ। এমনকি শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, সমাজনীতি কিংবা সমাজের যে কোনো স্তরের অবনীয়মান, মর্যাদাহীন মানুষই নিম্নবর্গ।

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগ থেকেই এই নিম্নবর্গ শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' তার একমাত্র প্রামাণিক নিদর্শন। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে সামাজিক জীবনচিত্র চর্যাপদকর্তাদের বিভিন্ন সংখ্যক পদের মধ্যে পরিলক্ষিত। এই পদগুলির মধ্যে আছে ডোম, শবর, কাপালিক, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ তথা নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনের পরিচয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় গোপ জীবনের সমাজ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মধ্যযুগের চর্চিত মঙ্গলকাব্যে দেবতা ও মানুষের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি আছে নিম্নবর্ণের মানুষের চিত্র। এছাড়াও সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য, লোককথা, গীতিকা, বৈষ্ণব সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য— সর্বত্রই নিম্নবর্গীয় বহুচরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সংস্কার মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে সমাজে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। সেই সাথে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষির জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রভাবে নিম্নবর্গীয় মানুষ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এর প্রতিফলন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে এর বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য।

বাংলা কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে নিম্নবর্গের জীবনের রূপরেখা নানাভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'পুনশ্চ' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় নিম্নবর্গের মানুষ নতুন ধর্ম পথের দিশারী হয়েছে।

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে গোরা চরঘোষপুর ভ্রমণের অনুষঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন'। 'অরক্ষণীয়া' 'পল্লীসমাজ', 'পথেরদাবী' উপন্যাসের সমাজ অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের কথা লেখক বলেছেন। এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'আরণ্যক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'কবি', 'গণদেবতা' উপন্যাসে বিভিন্ন নিম্নবর্গীয় জীবনের চিত্র বর্ণিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে জেলে জীবনের পূর্ণাঙ্গচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাঁড়ে রোঁ' প্রহসনে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' ও 'অচলায়তন' নাটকে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে অত্যাচারিত, অবহেলিত ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ব্রাত্য তথা নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি প্রকাশিত।

বাংলা ছোটোগল্পের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক গল্পকারের গল্পেই নিম্নবর্গ কমবেশি স্থান পেয়েছে। বাংলা ছোটোগল্পের সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত লেখকই তাদের কোনো না কোনো ছোটোগল্পের বিষয়ে নিম্নবর্গীয় জীবনের চলচ্চিত্র চিত্রিত হয়েছে। যেমন- প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'হীরালাল' গল্পে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদনী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমোদ', বনফুলের 'বুধনী', মহাশ্বেতা দেবীর 'ধীবর', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে' প্রভৃতি লেখকের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের রূপ বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমার আলোচ্য বিষয় 'বাংলা ছোটোগল্পে নিম্নবর্গ : প্রসঙ্গ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) পূর্ববঙ্গের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বনাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দিনাজপুর জেলার স্কুলে পড়ার সময় রাজনৈতিক আবর্তে তিনি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেহেতু বরিশালের গ্রামে বড় হয়েছিলেন সেহেতু গ্রামের মাঠে খাটা কৃষক শ্রমিক শ্রেণিকে কাছ থেকেই দেখেছেন—

বাংলা সাহিত্যের জগতে ছোটোগল্পকার রূপে তার আবির্ভাব ঘটে বিশ শতকের তিরিশের দশকে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'পাশাপাশি' এবং প্রথম গল্প সংকলন 'বীতংস'। এছাড়াও তার অন্যান্য ছোটোগল্পগুলি হল 'হাড়', 'নক্রচরিত', 'দুঃশাসন', 'টোপ', 'ফলশ্রুতি', 'একটি শত্রুর কাহিনী', 'জান্তব', 'বণ-জ্যোৎস্না', 'সৈনিক' প্রভৃতি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন। তিনি সময়কে পাশে নিয়ে মানুষ ও জীবনের বাঁচার কথা বলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভ এইসব যুদ্ধ সময়কালীন প্রেক্ষাপট যেমন তার গল্পে স্থান পেয়েছে তেমনি সমাজের অবহেলিত, অন্ত্যজ, পিছিয়ে পড়া মানুষের কথাও তিনি ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন।

নিম্নবর্গদের নিয়ে লেখা তাঁর একটি গল্প হল 'বীতংস'। গল্পের বিষয় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ, সাঁওতালদের দরিদ্র-লাঞ্ছিত, অসহায় বঞ্চিত জীবনের কাহিনি। সাঁওতাল পরগণার সরল, দরিদ্র ও সাদাসিধা মানুষ হল সর্দার ঝড়ু সাঁওতাল। নাচে গানে শিকারে একপ্রকার আনন্দেই জীবন কাটে তাদের— 'মাঝখানের একটুখানি ফাঁকা জায়গায় বসেছে নাচের আসর। কষ্টিপাথরের তৈরী কালো চেহারা দুজন পুরুষ দুলে দুলে মাদলে ঘা দিচ্ছে, আর সেই মাদলের তালে ঝুঁকে ঝুঁকে কয়েকটি মেয়ে নৃত্য করছে'।[১]

দালাল সুন্দরলাল সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করে সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনে এসে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য হল আসামের চা বাগানে এই সাঁওতালদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা। সাধুর ছদ্মবেশে সরল সাঁওতালদের সে বশ করে। তাই ঝড়ু সর্দারের মেয়ে বুধনীকে দেখে সে বলে— 'তুই কেন এখানে পড়ে আছিস বুধনী? তোর যে ভারী জোর বরাত। নাঙ্গা বাবার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে শহরে গিয়ে যে তোর কপাল ফিরে যাবে এ তো আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি'।[২]

এছাড়াও সে সাঁওতালদের দেবতা শিং ফেঙার ভর হয়েছে বলে দক্ষ অভিনয় কার তাদের স্পষ্টভাবে জানায়- তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে, 'হায়জা'র মড়ক,— একটি প্রাণীও বাঁচবে না, মরে সব শেষ হয়ে যাবে'।[৩]

আবার এর প্রতিকার রূপে সুন্দরলাল অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বলে— 'নাঙা বাবার শিষ্য এই সাধু সুন্দরলালকে আঁকড়ে ধর। ও তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে তোরা উত্তরে চলে যা। সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এর চেয়ে অনেক সুখে থাকবি'।[৪]

সুন্দর লালের এই কুচক্রের কথা না বুঝেই তারা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে, দুমকার প্রকৃতির সংসর্গ ত্যাগ করে আসামের চা বাগানে কুলির কাজ করার জন্য হাঁটতে শুরু করে। প্রকৃতির কোলে বড় হওয়া মানুষগুলিকে ঠকিয়ে শ্রমিককে পরিণত করার যে করুণ কাহিনি, সেটাই গল্পকার এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'টোপ' গল্পের মাধ্যমে রাজবাহাদুর এন.আর.চৌধুরীর সামন্ততান্ত্রিক অমানবিক আচরণের চরম রূপেই গল্পের সামগ্রিক ব্যঞ্জনা নিহিত হয়েছে। রাজবাহাদুর শিকার করতে ভালোবাসেন, তাই নানা উপায় অবলম্বন করেন শিকারের সময়। একটা বিরাট পাহাড়ের চারশো ফুট নীচে জঙ্গলপূর্ণ গভীর খাদ, সেই খাদেই তিনি টোপ দিয়ে বাঘ শিকার করেন। পদ্যপায়ী অহংকারী, শিকার বিলাসী রাজবাহাদুর গল্পের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে শেষে যে বাঘ শিকার করে দেখালেন তাতেই তাঁর বড় কৃতিত্ব। তাঁর হিন্দুস্থানী কীপারের মাতৃহীন শিশু ছেলে মেয়ে অনেকগুলি। তারা রাজবাহাদুরের হান্টিং বাঙ্গলোয় বাবার সাথেই থাকে— 'রাজবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোখে দেখেন ওদের। দোতলার জানালা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুড়ে দেন, নিচে ওরা যেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে'।[৫]

আবার তাদের প্রতি স্নেহ হরির লুটের মতো অনেক পয়সা অকাতরে ছড়িয়ে ছেলেমেয়েদের প্রীতি লক্ষ করেন. শিকারের দিন কীপারকে শহরে পাঠিয়ে দিয়েবাঘ শিকারের 'টোপ' বানানো হয় এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটিকে নিয়ে। 'টোপ' গল্পে এক আরণ্যক ইতিহাসের, একটি বিচিত্র শিকার কাহিনির মাধ্যমে গল্পকার ব্রাত্য মানুষের প্রতি সামন্ততান্ত্রিকদের অমানবিক অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন।

দুর্ভিক্ষ মহামারির মতো আর্থ-সামাজিক অবস্থার সময়কালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন ছোটগল্প লিখেছেন তখন সেই অবস্থার প্রতিফলন তার গল্পে পরিলক্ষিত হয়। সেই সমাজে গ্রামের অন্ত্যজ মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এবং জীবিকার যে পরিচয় পাই তাতে দেখি সাধারণ মানুষ নগ্ন। এই রকমই একটি চিত্র দেখি তার 'দুঃশাসন' গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের কারণে আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনের কালে অন্ত্যজ মানুষের পিরধানের যে ন্যূনতম বস্ত্রটুকুও পেত না তারই প্রকাশ দেখি দেবীদাস ও তার ভাইপো গৌর দাস এর যাত্রা পথে। তারা থানার দারোগা শখের যাত্রাপালা থেকে ফেরার পথে মুচি পাড়ার লক্ষণ মুচির সাথে দেখা করতে যায়। তখন দেখে ঘাটের দিক থেকে একটি যোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছে মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন, কোনখানে একফালি কাপড় নেই কাপড় পরবার উপায়ও নেই'।[৬]

এই চিত্রের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে অন্ত্যজ মানুষের যে দুরবস্থার চিত্র গল্পকার তুলে ধরেছেন তা বিশেষত এ যুগ কালের সত্যচিত্র।

নিম্ন বা ব্রাত্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় বসে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দিনাতিপাত করে অসহায় অন্ত্যজ মানুষগুলি। সাধও ও সাধ্যের টানাপোড়েনে তাদের জীবন লাঞ্ছিত হয়, তাই তাদের বেছে নিতে হয় চুরি ডাকাতি, স্বৈরিণী, পতিতাবৃত্তির মতো পেশা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নক্রচরিত' গল্পের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের সংসারকে বাঁচাতে ভুঁইমালী, যোগী, মদনের মতো সাধারণ লোকেরা ডাকাতি রাস্তা বেছে নেয়। ডাকাতি করে সোনা রূপো লুট করে মাত্র দুশো টাকা পায় তারা নিশি কর্মকারের কাছে সোনা বেচে, এই নিশি কর্মকার হল একজন মহাজন ব্যবসায়ী। সে জাকাতের লুট করা গয়না থেকে ও নিজে আখের গুছিয়ে নেয়, তাই তাকে বলতে শুনি— ''কম করে হাজার টাকার জিনিস, তাহাদের নজরটা যে উঁচু সে কথা মানতেই হবে'।[৭] দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনে জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম সুখ ভোগের জন্য মদন, যোগীদের এক কাজ করে সংসার অর্থলাঞ্ছিত ও অন্নলাঞ্ছিত অন্ত্যজ মানুষ জীবন ধারণের জন্য সর্বদা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে। ও ব্যাপারে দেহ না, অর্জিত অর্থের দিকেই তাদের নজর থাকে। পতিতাবৃত্তি, স্বৈরিণীবৃত্তি ব্রাত্যমানুষের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এইরকম একটি গল্প হল 'ফলশ্রুতি'। এই গল্পে এক তরুণী ও এক প্রৌঢ়া দুজনেই এক পেশার সাথে যুক্ত। অনু

এবং তার স্বামী ট্রেন গোলোযোগের কারণে রাজগীর এসে পৌঁছলে স্টেশনে এক প্রৌঢ়া ও এক তরুণী (নিরু) তাদেরকে রাত্রিতে আশ্রয় দেয় রাত্রিবেলায় তাদের কুণ্ড স্থানে নিয়ে যায় এবং কুন্ড স্থানের পূণ্যের কথা বলে। অনু নিরুকে ভাগ্যবান বললে নিরু বলে 'মনের ব্যধির কি অরা অন্ত আছে। আমরা তো আপনাদের মতো ভালো লোক নই'।[৮] এখানে নিরুর আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য তাদেরকে এই পেশায় আসতে হয়। কিন্তু তাদেরও যে একটা সুন্দর মন আছে, তার পরিচয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিরু চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

তাঁর 'সৈনিক' গল্পে বর্ণিত হয়েছে সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিদ্রোহ প্রতিবাদের চেতনা। 'বীতংস' গল্পটি যেখানে শেষ, বলা যেতে পারে সৈনিক গল্পটি যেখান থেকে শুরু। সাঁওতাল পরগণা ছেড়ে একদল সাঁওতাল, কুমারদহের জমিদার, চন্দ্র চৌধুরীর জমিদারের মধ্যে পাল গাঁয়ে বসবাস করতে শুরু করে, শ্বাপদ শঙ্কুল পরিবেশে জীবনকে বাজি ধরে তারা সেখানে সোনার ফসল ফলায়, সুখেই তাদের জীবন চলে কিন্তু তাদের সেই সুখী জীবনে বিপদ রূপে নেমে আসে চন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ইন্দ্র চৌধুরী। ইতিহাসে এম.এ করে জমিদারী করতে আসা ইন্দ্র চৌধুরী, পাল গায়ের টিলাতে ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন লাভের আশায় সাঁওতালদের উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নায়েব নৃসিংহকে নির্দেশ দেয়— 'সাঁওতালগুলোকে তাড়িয়ে দিন'।[৯]

এই নির্দেশ শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নিশ্চিন্ত সুখী জীবন ছেড়ে তারা অন্য কোথাও যেতে রাজী নয়, তাই তারা ইন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে—

''পালাগ্রামের টিলার ওপর সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন যুগের সৈনিক দল। হাতে তাদের উদ্যত তীর আর ধনুক'।[১০] জমির দখল ও অধিকার রক্ষরা সংগ্রামে তারা লড়াই শুরু করে এবং জমিদারকে পরাজিত করে নিজেদের অস্তিত্বকে অটুট রাখে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গীয়দের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিকগুলি উঠে এসেছে। অন্ত্যজরা উচ্চবর্গীয় এবং ধনবান মানুষের দ্বারা শোষিত অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হতে হতে এক সময় মৃত্যুর মতো চূড়ান্ত পরিণতিও ঘটতে দেখা যায়। 'নক্রচরিত' গল্পে মতিপাল ও তার স্ত্রীর। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে এবং প্রতিশোধ নিতে দেখা গেছে কয়েক জনকে। তারা যে আর পড়ে পড়ে অত্যাচার সহ্য করবে না তারই ইঙ্গিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার 'সৈনিক' গল্পে দিয়ে গেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১, অষ্টাদশ মুদ্রণ- পৌষ ১৪২১, প্রকাশক শ্রী সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পৃ. ২১।

২. ঐ, পৃ. ২২।
৩. ঐ, পৃ. ২৮।
৪. ঐ, পৃ. ২৮।
৫. ঐ, পৃ. ৭০।
৬. ঐ, পৃ. ৫৮।
৭. ঐ, পৃ. ৪২।
৮. ঐ, পৃ. ৭৯।
৯. ঐ, পৃ. ২০৩।
১০. ঐ, পৃ. ২০৮।

গ্রন্থপঞ্জী

১. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ-অগ্রহায়ণ ১৩৬১, অষ্টাদশ মুদ্রণ-পৌষ ১৪২১, প্রকাশক-শ্রী সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

২. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ (সম্পা.), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯।

৩. মজুমদার উজ্জ্বল কুমার, 'গল্পচর্চা', সহযোগীতা বিশ্বজিৎ কর্মকার, প্রথম প্রকাশ-প্রজাতন্ত্র দিবস ২০০৮, প্রকাশক-দেবাশিস ভট্টাচার্য বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ-৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯।

৪. দত্ত বীরেন্দ্র, 'বাংলা ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।

সময়চক্রে-সংশয়ে-সংকটে দাম্পত্য জীবন : বিংশ শতকের আলোকে

সায়ন মুখার্জ্জী*

কথাসাহিত্যের জন্ম খুব বেশি দিনের নয়। ফলে সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাত কথাসাহিত্যের বৈচিত্র্যকে যেভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে মনে হয় বাংলা সাহিত্যেও অন্যকোন সংরূপ এইভাবে এতো বেশি প্রভাবিত হয় নি। যদিও অবৈধ প্রেম ও দাম্পত্য সমস্যা মধ্যযুগের সাহিত্য-পাঠেও লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা কাব্যে আমরা দাম্পত্যের ছবি পেয়েছি। তা সে উঁচু উঁচু পর্বতে গুঞ্জমালাগলায় শবর-শবরীর উচ্ছ্বাসই হোক কিংবা মঙ্গলকাব্যে হর গৌরীর কলহমুখর সংসার। সেখানে দারিদ্র্য-অনটন, অভাব-অভিযোগ অভিমানে গৌরীর পিতৃগৃহে গমন এমনকি শিবের নিম্নশ্রেণির রমণীর প্রতি আসক্তি নিয়ে কটাক্ষও কিছু কম ছিল না। সপত্নী নিয়ে সংসার করেচেন দেবতা এবং মানুষ সকলেই। ব্যাধ ও বণিকের দাম্পত্য সম্পর্কেও বিপরীত দুটি চেহারা ধরা আছে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। অভিমান থেকে অভিযোগের তর্জনী সেখানে অপরপক্ষকে বিদ্ধ করলেও সংসার ভাঙার কোন ছবি সেখানে নেই। আঠারো শতকে দরবারি নাগরিকতার অভিজাত্যেও দুই পত্নীকে নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সুখী সংসারের ছবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে যেমন দেখেছি, তেমনই নারীগণের পত্নী নিন্দাও উন্মুক্ত করেছে বিবাহিত দম্পতির সম্পর্কের ভিতরকার নানা শূন্যতা।

কিন্তু এই ছবিটা বদলাতে শুরু করলো উনিশ শতকে এবং চিত্রের আরো বিবর্তন ঘটলো বিংশ শতকে, হয়তো অনেকটাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রসার প্রচলনে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে যথার্থ দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তার উপর ছিল নানা সামাজিক সংস্কারের চাপ, যেমন সে যুগের সামজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ স্বামী-স্ত্রী দিনের বেলায় পারস্পরিক সাক্ষাৎ অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে গণ্য হত। মধ্যযুগের সাহিত্যে যা ছিল কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ব্যাখ্যায় আবদ্ধ, আধুনিক সাহিত্যে সে ব্যাখ্যা অনেক প্রসারিত ও বহুধাবিভক্ত। যুগসমস্যা যুগযন্ত্রণা যেভাবে ভাবিয়ে তুলেছে লেখকদের, যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন কালের বহুবনের মানুষকে সেভাবেই চিত্রিত করেছেন উপন্যাসে ছোটগল্পে। একালের মানুষের জীবন অনেক জটিল, এক সূক্ষ্ম সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্ব। এক জটিল গ্রন্থি থেকে মুক্তির পথ

*এম.ফিল. গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

খুঁজছে সকলে। বারবার বিভ্রান্ত হচ্ছে। সম্পর্কের নানা পথ তৈরি হচ্ছে। বৈধ-অবৈধের ভেদাভেদ মুছে যাচ্ছে। অনুভূতি, মূল্যবোধ হয়ে যাচ্ছে ভোঁতা। জন্ম নিচ্চে হাজারো সমস্যা ও সংকট। নানান আঙ্গিকে জীবনকে দেখার আগ্রহ বাড়ছে, এই আগ্রহেই খুলে যাচ্ছে নতুন নতুন পথ। একঘেঁয়ে জীবনের ক্লান্তি ও গ্লানিকে ভুলতেই জীবনের নতুন আহ্বান। আধুনিক যুগে বিলাসিতা আর ভোগ এ যেন তার জীবনের মূল মন্ত্র। অবাধ যৌনতা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা জীবনের কোমল অনুভূতিগুলিকে হত্যা করছে। অপমৃত্যু ঘটছে মূল্যবোধের। প্রথম দেখার চকিত চাহনি, পুরুষ বা নারীকে জানার অদম্য কৌতূহল, কুণ্ঠা, সংশয়, ভয় আজ অর্থহীন। সময় বদলে গেছে দ্রুত, সম্পর্ক, প্রেম, অনুভূতি, মূল্যবোধ এসবের অর্থ বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সময় বড়ো কঠিন।

বঙ্কিম পর্ব থেকেই এর শুরু, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল-এ এই সমস্যা আছে। গুরুত্ব পেয়েছে নারীর সৌন্দর্য রূপ, পুরুষ পথ হারিয়েছে রূপের কাছেই। বিবাহিত নায়ক অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। বঙ্কিম অবৈধ সম্পর্কের ছেদ ঘটিয়েছে নারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কের চিত্র আঁকতে গিয়েও দাম্পত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সুস্থ সুকুমার বৃত্তিরই জয় ঘোষণা করেছেন। এই কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের কারিগর পুরুষ। তাঁর সাহিত্যে নিজস্ব, অসহায় নারীরাই থাকে অতুলনীয় সৌন্দর্য, তারই রূপরাশির জালে আবদ্ধ হয় জমিদার। রবীন্দ্র-সাহিত্যে চিত্র চরিত্রেরা সকলেই পরিবার জীবনের অন্তর্ভুক্ত। পরিবার জীবনের ঘনবদ্ধতার কোনো এক সূক্ষ্মছিদ্র পথে ঘটে যায় বিপ্লব। তার সম্পর্ক নির্মাণ মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্মতার উপর। শরীরকে অতিক্রম করে মনের অস্তিত্ব। প্রাচীন সাহিত্য থেকে দেহের যে উন্মুক্ত বন্দনা শুরু হয়েছিল সে বন্দনার হল অবসান। নারীমন চাইছে স্বীকৃতি, সম্মান, মর্যাদা। যে মনেও জ্বলেছে প্রতিনিয়ত নানান বিক্রিয়া। নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব এসবের হাত ধরেই নীরবে এসেছিল প্রেম। একালে যা শরীরী ভাষায় ব্যক্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে তা অনেক বেশি মনের ভাষায় ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে কিন্তু মৃত্যুতেই দাম্পত্য সংকটের অবসান হয়নি। অসম বিবাহের জটিলতা তাঁকেও ভাবিয়েছিল 'চোখের বালি' লেখার সময় থেকেই। 'নষ্টনীড়' তারই এক পরিণতি। পরবর্তীকালে 'ঘরে-বাইরে', বিশেষত 'যোগাযোগ' উপন্যাস দাম্পত্য সম্পর্কের গভীর নিহিত কিছু সংকট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, বঙ্কিমের 'ত্রিভুজ' ছক-কে ভেঙে ফেলে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন 'চতুর্ভূজ'। চতুষ্কোণ এই কাহিনীতে অর্থাৎ মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী এবং বিহারীকে নিয়ে তৈরি কাহিনীতে পারস্পরিক সংঘাতের ক্ষেত্রে আরো বিস্তৃত ও জটিল হল। যেদিন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে বিবাহ করতে অসম্মত হল সেদিনই কাহিনী গ্রন্থিতে জটিলতার সূত্রপাত, বিনোদিনীর বৈধব্যও এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিহারীর জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে আশার প্রতি মহেন্দ্রের মুগন্ধতা এবং

পরে তাকেই বিবাহ আরো একটি সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বিনোদিনীর আগমনের আগেই মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্যে বেসুর বেজেছে। নারীর লালিত শোভন লীলায় ক্লান্ত মহেন্দ্রর দাম্পত্যের প্রতীক বোধহয় ঐ খাঁচায় মরে পড়ে থাকা কোকিলটা, দোলাচলচিত্ত মহেন্দ্র ''খেলার পুতুল'' আশাকে ছেড়ে বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, আর ক্রমশ বিনোদিনী 'খেলার পুতুল' হয়ে উঠেছে। বিনোদিনীর ঈর্ষায় মহেন্দ্র-আশার সম্পর্ক ভস্মীভূত হয়েছে। ঘটনা আরো আকস্মিকতার মুখোমুখি হয়েছে বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর প্রেমানুভূতিতে—বঙ্কিমের ত্রিভূজ ছকের বোধহয় এখানেই সমাপ্তি। বঞ্চনা আর আত্মদাহের মধ্যে থেকে বিনোদিনীর দ্বিতীয় সত্তার জাগরণ ঘটেছে, বিহারীকে শ্রদ্ধা করেও বিহারীকে প্রত্যাখ্যান করে বিনোদিনী তার স্বাতন্ত্র্য চিনিয়েছে। 'তুমি আমাকে ভালো বাসিয়াছ'— মহেন্দ্রের এই অভিযোগকে সরাসরি 'মিথ্যা' বলে অস্বীকার করতে পারে নি। অস্থির চিত্ত মহেন্দ্র নিজেরই কামপ্রবৃত্তির চৌহদ্দিতে ঘুরপাক খেয়েছে, পাঠকের সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

'নষ্টনীড়', 'ঘরে-বাইরে'তে একদিকে স্বামীর অনাগ্রহ, ব্যস্ততা ও নিঃসঙ্গতা ক্রমশ চারু-বিমলাকে মনের কাছাকাছি এনেছে। অমল চলে যাবার পর চারুর বাঁধ ভাঙা কান্নার প্রকাশে স্পষ্ট হয়েছে চারুর মনের আকাশ। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটিতেও বিমলার জীবনে দুটি সংকট— একটি তার অন্দর থেকে বাইরে মুখোমুখি হবার সংশয়, অন্যটি পুরুষ সম্পর্কে মনের মধ্যে গড়ে ওঠা ইমেজ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ, ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, সর্বোপরি গভীর মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে পাঠকের সহানুভূতি, বেদনার জায়গাটি অধিকার করে রয়েছে নারী।

শরৎসাহিত্যেও এ প্রসঙ্গে বারবার এসেছে 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা'-য় লক্ষ্য করা যায় মনস্তত্ত্বের থেকে গুরুত্ব পেয়েছে দ্বিধা-সমাজ ও প্রলোভন। অচলা তার শিক্ষা ও ষোড়শী চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রলোভন দিয়েও যা ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। অচলার স্রষ্টা কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। মনে মনে সুরেশের মিথ্যা স্তাবকতায় বিচলিত অচলা, মহিমের প্রতিও সুবিচার করতে পারেন নি। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতায় অচলার মনোজগত ততো নিবিধ হয়ে ওঠেনি। শরৎসাহিত্যে মনস্তত্ত্বের গভীর টানাপোড়েন সৃষ্টি হওয়ার আগে কতগুলি বোধ, বুদ্ধি লেখককে তাড়িত করে, যার থেকে তিনি চরিত্রকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। ফলে চরিত্র গুরুত্ব হারায়। নতুন চিন্তা-চেতনা, সময়ের দ্রুত পদবিক্ষেপ, আর এক বিরাট পালাবদলে সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সৃজন। বৃহৎ পরিবার হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। একাকিত্বতা, নিঃসঙ্গতার চোরা স্রোতে ঢুকে পড়ছে অসংখ্য গোপন স্রোত। আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মসর্বস্বতার জটিল জালে মানুষ বদ্ধ। সম্পর্ক আজ প্রয়োজনের, ভোগসর্বস্বতার, আত্মপ্রবঞ্চনার।

অবৈধ প্রেম ও দাম্পত্য সমস্যা যাঁর রচনায় তীব্রভাবে ফুটে ওঠে তিনি—মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্যা ও সংকট যেখান থেকে সৃষ্টি হয় তার নেপথ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব। কখনো শরীরী চালনায়, কখনো দুর্বলতা, কখনো বা প্রবল অতৃপ্তি এ সংকট নির্মাণ করেছে। এক দুর্ভেদ্য রহস্যজাল মানিকের সাহিত্য সৃষ্টিতে ছেয়ে রয়েছে। তার চরিত্ররা আদর্শচ্যুতির যন্ত্রণায় বিদ্ধ, কাতর। পরিণতিতে পলায়ন। নিজের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে আত্মঘাতী চরম খেলায় বিপন্ন বোধ করে। বিবাহিত হয়েও জীবনের অতৃপ্তিতে পা বাড়ায় অনিশ্চিত জীবনের উদ্দেশ্যে। সে জীবন দিতে পারে না সুস্থতা, নিরাপদ আশ্রয়। অতৃপ্তি, যৌনতা মানিকের উপন্যাসে সমস্যা ও সংকট নির্মাণ করেছে। মানুষের যা জৈব চাহিদা, প্রবৃত্তির প্রবল তাড়না মানিকের চরিত্রদের প্রভাবিত করেছে। সুস্থ জীবনের ছন্দ মানিকের উপন্যাসে অনুপস্থিত। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় শশী-কুসুমের সম্পর্কে প্রথম থেকেই রহস্য ছিল। ডাক্তারি পাশ করা শশী কুসুমের শরীর ও মনের জ্বালাকে মেটাতে পারেনি। ছোটবাবু শশীকে গ্রামের নিরক্ষর, অসংস্কৃত কুসুমের ভালো লেগে যায়। এ ভালোলাগা মোটাদাগের ভালোলাগা। শশীর গোলাপের চারা রোপণের মধ্যে যে ভালোবাসার নান্দনিক সৌন্দর্য আছে তা কুসুমের গ্রাম্য, অশিক্ষিত আচ্ছন্ন চোখে ধরা পড়েনি। শশী প্রশ্ন করেছে— 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' শশীর প্রতি দুর্বোধ্য আকর্ষণ কুসুমকে তার সিদ্ধান্ত থেকে একসময় সরে যেতে বাধ্য করে। শশীও অনুভব করে কুসুমের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। তালবনের উঁচু টিলায় আজও দাঁড়ায়ে শশী অতীতকে দেখার জন্য, কারণ তার সামনে শুধুই যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

উপন্যাসটিতে অন্য একটি সম্পর্কের কথাও আছে— শশীর বোন বিন্দুর সঙ্গে তাঁর স্বামী নন্দলালের। নন্দলাল বিবাহিত, শশীর বাবা গোপালের চক্রান্তে বিন্দুকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। বিন্দু ও নন্দলালের দাম্পত্য বিচিত্র। বিন্দুকে নন্দলাল স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। বরং বিন্দুর মধ্য দিয়ে তার মনের বিকৃতিকে মেটাতে চেয়েছে। দাম্পত্যের এ হেন রূপের পরিবর্ত অন্য একটি রূপের কথাও এ উপন্যাসে চিত্রিত। মতি-কুমুদের দাম্পত্য। আপাত বোহেমিয়ান কুমুদ স্থিত হতে পেরেছে মতির কাছে এসে। তাদের দাম্পত্যের সংকট আছে।

বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্যে বারবার আসে একটি সুরের অনুরণন— দাম্পত্য অনিশ্চিয়তা। 'বাসরঘর', 'স্ত্রী', 'দাম্পত্য আলাপ', 'সত্যি সত্যি', 'রোমান্স' ইত্যাদি রচনায় আবেগ হারিয়ে যাচ্ছে দাম্পত্য থেকে। আবার পরমুহূর্তেই রচিত হচ্ছে সংকট। সে সংকট এত ভয়াবহ, পরস্পরের প্রতি জেগে উঠেছে তীব্র বিতৃষ্ণা, দাম্পত্য ভেঙে যাওয়ার কঠিন মুহূর্তে পরস্পরের পুনরায় ভালোবাসার স্রোতে ভেসে যাওয়া, প্রতিদিনের ব্যবহারে ক্লিন্ন দাম্পত্যকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বুদ্ধদেব বসুর রচনায় আছে।

দাম্পত্যের অনিশ্চয়তার ছবি জগদীশ গুপ্ত ও সুবোধ ঘোষের রচনাকে দিয়েছে বৈচিত্র্য। বিকৃতি, যৌনতা আছে সত্য, তারও মাঝে আছে আলো। 'লঘুগুরু' উপন্যাসটিও

উত্তম অতীতকে ভুলে নতুন এক জীবনে প্রবেশ করে টুকীর মা হয়ে। জীবনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে টুকীর মধ্য দিয়ে সার্থক করে তুলতে চায়। সংকট এসে দাঁড়ায় টুকীর বিবাহকে কেন্দ্র করে। জগদীশ গুপ্তের দাম্পত্য কদর্যতা আছে, সুস্থতার অভাব রয়েছে, আর রয়েছে বিপুল শূন্যতা। সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থা গ্রাস করেছে চরিত্রের মনোলোককে। সময় ও বাস্তবতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছেন লেখকেরা। জগদীশ গুপ্তের রচনায় তারই অনুররণ।

সুবোধ ঘোষের রচনায় টুকরো টুকরো দাম্পত্যের চিত্র। অনিশ্চিয়তা আছে, সঙ্গে রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব। এক ধরনের সূক্ষ্ম ব্যর্থতা বোধের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সুজাতা, জিয়াভরলি উপন্যাসে দাম্পত্যের অন্য এক চিত্র। দাম্পত্যকে টিকিয়ে রাখা বা অন্য সম্পর্ক বুননের থেকেও প্রাধান্য পায় অভাববোধ। এই অভাব অর্থের নয়, অতৃপ্তির নয়, নির্বাচনের। জগদীশ গুপ্তের রচনায় পঙ্কিল আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে সুবোধ ঘোষের রচনায দাম্পত্য মুখোমুখি হয়েছে অন্য এক জগতের।

দাম্পত্য সংকটকে লঘু করে পৃথক রসের সন্ধান করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচনায় সংকট পাঠককে প্রশ্নাকুল করে তোলে না। অন্য এক স্নিগ্ধতার দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। 'হারজিৎ, 'বিয়ের ফুল', 'সহযাত্রিনী', 'সহধর্মিনী', 'ভালোবাসা' ইত্যাদি রচনার পরিবেশটাই পৃথক। অনাবিল আনন্দবোধের মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। হাস্য পরিহাস সমগ্র গল্পে শরীরকে ঘিরে রাখে। যৌনতা নেই, অতৃপ্তি নেই, পরিহাস মুখর দাম্পত্য আছে। অবৈধ কোন সম্পর্কের দিকে যাত্রা নেই। বিভূতিভূষণের গল্পপাঠে পাঠক অনাবিল আনন্দ পায়। আর সে সুরে রেশ থেকে যায় পাঠকের অন্তরে।

লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'চেনামহলে', 'দেনমন' দাম্পত্যের এক নতুন ব্যাখ্যায় পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। 'চেনা মহলে' একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে অতুল স্বামী পরিত্যক্তা বন্ধুর দিদিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কোথায়, কোনখানে কেউ জানে না। রমা চরিত্রহীন, মাতাল স্বামীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর ছাড়ে। স্বামীর বন্ধু অরুণের যাওয়া-আসা করবীর মনে বেঁচে থাকার তাগিদ তৈরি করে। দেওর, শাশুড়ীর চোখে তা এড়ায় না। করবী ঝুঁকি নেয়, অরুণ প্রতিশ্রুতি দেয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প বয়নের মধ্যে দক্ষতা থাকায় তাঁর প্রেক্ষাপটটি বড়, অন্যান্য লেখকদের তুলনায় সমস্যার প্রকৃতি ভিন্নগোত্রের। অনেকবেশি ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ, সমাজবাস্তবতার জটিল গ্রন্থি থেকে অনেক দূরে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য, কঙ্কাবতী দত্ত প্রমুখ নারীবাদী লেখিকার গল্পে দাম্পত্য এক নতুন মাত্রা আনে। নারীর উত্তরণের কথা বললেও বিশৃঙ্খলাকে তারা লেখনীর বিষয় করে তোলে নি। নারীর পরিচয় অভিমুখে যাত্রা তাঁকে সচেতন করে তোলে। প্রত্যাশা প্রাপ্তির দ্বন্দ্বে দাম্পত্য ভাঙছে ঠিকই তবে সবক্ষেত্রে ভাঙন সত্য নয়। তাঁর জন্য অনুশোচনা

আছে। সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'শঙ্খিনী'-তে তরী শঙ্খকে বিবাহ করেছে ঠিকই কিন্তু পুরনো সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কষ্টও তাকে ভাবায়। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, নীরব অভিমান কিভাবে একটা সম্পর্ককে কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, তা নিয়ে তরীর আক্ষেপ তীব্র। বিশ্বায়নের যুগের প্রবল অনিশ্চয়তা সমাজমনকে গ্রাস করেছে, মানবমনে প্রতিনিয়ত যে ভাঙাচোরা চলছে তারই অনবদ্য চিত্রন, 'শঙ্খিনী'তে।

দুরন্ত এক সময়কে অতিক্রম করছে আজকের কথাসাহিত্য। অনুভূতিপ্রবণ, দায়বদ্ধ লেখকেরা সমসময়কে তুলে ধরেছেন চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে ঘিরে। তাদের হাতে দাম্পত্যের সংজ্ঞা প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। তবে একথা সত্য দাম্পত্যের চেহারার বদল ঘটছে। যা ছিল একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ আজ তা সমগ্র সমাজের বুকেই থাবা বসাচ্ছে। নিতান্ত তুচ্ছ কারণে ভেঙে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের দাম্পত্য। এক বা একাধিক অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে মানুষ। এও সেই আত্মসর্বস্বতার বহিঃপ্রকাশ। নিজেকে বঞ্চিত না করার আস্ফালন। এর পরিণাম কি আধুনিক লেখকও জানেন না। এর উত্তর দেবে — এই সময়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'
২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়- 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে'
৩. পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়- 'অন্তরঙ্গয়ন, কথা সাহিত্য'
৪. শুভশ্রী (পত্রিকা)- 'নষ্ট দাম্পত্য: বাংলা কথাসাহিত্য'
৫. 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (২য় খণ্ড)'- ড. সত্যবতী গিরি, ড. সমরেশ মজুমদার

উজানে মৃত্যু : দ্বন্দ্বময় জীবন

আশিস রায়*

প্রতিটি ক্ষেত্রে যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়েছেন। নিজের ভাবনার জগতের সঙ্গে চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ মিলে যায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসহায় বোধ ঘিরে ধরেছে। সুস্থ, সুন্দর, গঠনশীল ভাবনার সঙ্গে মিল পাননি বলে তাঁর লেখায় বার বার উঠে এসেছে সমাজের নগ্নরূপ। মানুষের ছলচাতুরী, চারপাশের হানাহানীর রক্তাক্ত ছবি এবং তৎপরবর্তী সাধারণ, অতিসাধারণ মানুষের মনে জন্ম নেওয়া হতাশা বোধ, যন্ত্রনা প্রভৃতির চিত্র। নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক 'উজানে মৃত্যু' নাটক রচনার পিছনে দায়ী ছিল বিশ শতকের দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে গ্রাম্য মানুষের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব। বিশ শতকে কী এমন ঘটে গিয়েছিল যে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন ব্যাধী বাসা বেঁধেছিল, যার জন্য তাদের জীবন এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে নিজেদের দেহকে শব বলে মনে হচ্ছিল। কারণ জানতে গেলে নজর দিতে হয় ইতিহাসের পাতায়।

'১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস'[১] ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্থান নামক দুটি দেশে পরিণত হল। ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান। অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলিমরা হিন্দুদের থেকে সামান্য সংখ্যায় এগিয়ে ছিল। অবিভক্ত বাংলাও বিভাজন হয় মুসলিম গরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ এবং হিন্দু গরিষ্ঠ নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ। দেশ বিভাগের পরে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে অনিবার্য করে তোলার জন্য ১৯৪০ এর দশক থেকে হিন্দু নির্মূলীকরণমাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ এর শেষ ভাগে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী[২] ও ত্রিপুরা জেলার বাঙালি হিন্দুরা নির্মমভাবে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, ধর্মান্তকরণের শিকার হয় মুসলিমদের দ্বারা যা 'নোয়াখালি গণহত্যা' নামে পরিচিত। '১৯৪৮ সালে বিখ্যাত ধামরাই রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৯ সালে সমগ্র ঢাকা অঞ্চলে বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপুজোর বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো হয়। সে জন্য দুর্গাপূজার আয়তন ও সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পায়। বিজয়া দশমীর দিনে শত শত হিন্দুর বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ করে মুসলিমরা। ফলে কমপক্ষে ৭৫০টি হিন্দু পরিবারকে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়।'[২] ১৯৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর খুলনা জেলার বাগের হাটো, মোল্লাহাট পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত জয়দেব বর্মনের বাড়ি কম্যুনিস্ট সদস্য আছে সন্দেহে অভিযান চালিয়ে কিছু না পেলে জয়দেবের স্ত্রীকে পুলিশ ধর্ষণ করার চেষ্টা করে।

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়।

জয়দেবের আত্মীয়রা সহ্য করতে না পেরে একজন পুলিশকে হত্যা করে ফেলে। বাকি পুলিশরা পালিয়ে যায়। পরদিন পুলিশের বাহিনি এবং স্থানীয় মুসলিমরা সেই গ্রামের ৩৫০টি বাড়ি ধ্বংস করে। হিন্দুদের গবাদি পশুও নৌকা ছিনিয়ে নেয়। মাত্র একমাসের গণহত্যায় ৩০ হাজার হিন্দু প্রাণের ভয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

রাজশাহী জেলার নওয়াবগঞ্জ সাবডিভিশনের একটি পুলিশ স্টেশনের নাম ছিল নাচোল। দেশভাগের পূর্বে এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার অন্তর্গত। নাচোল পুলিশ স্টেশনের কাছে বাস ছিল সাঁওতাল ও বাঙালি হিন্দু যাদের মধ্যে প্রধান ছিল ক্ষত্রিয়, ভুঁইদাস ও কৈবর্ত সম্প্রদায়। দেশভাগের সময় সদ্যজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তেভাগা আন্দোলন দমন করার জন্য নৃশংসতার পথ বেছে নেয়। ১৯৪৯ খ্রিঃ আন্দোলনের মাধ্যমে তেভাগা প্রতিষ্ঠিত হয়। জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নাচোল পুলিশ স্টেশনের নিয়ন্ত্রনাধীন চন্ডীপুর গ্রামের সাঁওতাল অধিবাসীরা পুলিশ স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। কারণ পুলিশ বাহিনী বিনা কারণে এক সাঁওতাল আদিবাসীকে আটক করে। কিন্তু পুলিশ ওই জনসমাবেশের ওপর গুলি চালালে সাঁওতাল আদিবাসীরা সহিংস হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘটনাস্থলেই পাঁচ পুলিশ মারা যায়। সে ঘটনার ফলে ৭ জানুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ২,০০০ সদস্যের একটি সেনা কন্টিনজেন্ট প্রেরণ করে। তার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ ও আনসার বাহিনী যুক্ত হয়। সেই সশস্ত্র বাহিনী ১২টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করে।'[৩] পুলিশের এই বর্বর অত্যাচারের ফলে সেখানকার প্রায়৭০-১০০ জন কৃষক মারা যায়। এটাই নাচোলের গণহত্যা নামে পরিচিত। '১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মুখ্য সচিব পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুখ্য সবিচ আজিজ আহমেদের সঙ্গে একটি বৈঠক করতে ঢাকা আসেন। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় যখন আলোচনা চলছিল তখন সচিবালয়ে রক্তমাখা কাপড় পরিহিত এক মহিলাকে হাজির করা হয়। গুজব রটানো হয় সেই মহিলাকে কলকাতায় ধর্ষণ করা হয়েছে। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ কর্মবিরতির ডাক দিয়ে একটি মিছিল বের করে, যেখানে থেকে হিন্দু বিদ্বেষী স্লোগান দেওয়া হয়। তারা মিছিল নিয়ে নবাবপুরের দিকে যায়। আরও অনেকে ওই মিছিলে যোগ দেয়। দুপুর ১২টার দিকে পার্কে আসা মিছিল থেকে বক্তারা হিন্দু বিদ্বেষী হিংস্র বক্তব্য প্রদান করে।'[৪] সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। দাঙ্গায় বহু হিন্দু মুসলমানের প্রাণ যায়। নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় প্রায় ২০০ জন সাধারণ হিন্দু মুসলমানকে এবং এদের দেহও পুড়িয়ে দাহ করে ফেলা হয়। একই রকমভাবে ১৯৫০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বরিশালে নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ ও নির্যাতন করা হয়। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চার ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালিতে গণহত্যা হয়। একইরকম ভাবে সিলেট এলাকাতেও বহু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পারিপার্শ্বিক নানা ঘাত প্রতিঘাতে আঘাত খেতে খেতে মানুষ হতাশাগ্রস্থ, নিঃসহায়, জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত, শ্রান্ত। 'উজানে মৃত্যু' (১৯৬৩) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিখ্যাত একটি একাঙ্ক নাটক। গ্রামীণ সমাজের পটভূমিতে একটি অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক। নাটকটিতে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে নৌকাবাহক, সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি ও কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি। নাটকটিতে নৌকাবাহক হতাশাগ্রস্থ, পরাজিত, মৃত্যু প্রত্যাশী মানবতার প্রতীক। সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি শুভ্র, সুন্দর, মননশীল চিন্তা চেতনা ও ব্যক্তি চেতনার প্রতিক। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকা বাহক ও সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তির থেকে আলাদা সেজন্য সে উজানের যাত্রাকে ভয় পায়। সাদা পোশাক ব্যক্তি নৌকা বাহকের যাত্রাকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে।

নৌকা বাহন উদাসীন ও আনমনা। তার ভাবনা চিন্তার মধ্যে তেমন মিল খুজে পাওয়া যায় না।

নৌকাবাহক।। (দৃষ্টি উড়ন্ত পাখির দিকে) বালি হাঁস! (ঘোষণাটির পর কিছুক্ষণ সেদিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে) ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বালি হাঁসই হবে। সূর্যের দিকে উড়ে যাচ্ছে : একমুঠো সোনালি বালু যেন!

(আরেকটি মানুষ বাঁ দিক থেকে মঞ্চে প্রবেশ করে। পরনে সাদা কোর্তা, সাদা লুঙ্গি। হাতে ছোট পোঁটলা। তাড়াহুড়া করে নাই। কয়েক মুহূর্ত সে নৌকা বাহককে চেয়ে চেয়ে দেখবে।)

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। (তার উপস্থিতি জানাবে স্থির করে) ভাবলাম এবার কিছু খাওয়া যাক। তাই নৌকা বেঁধে উঠে এলাম।[৫]

ভাবনার আকাশে বাস করা নৌকাবাহক অলীক কল্পনার জগতে প্রবেশ করে যায়। সেজন্য আকাশে উড়তে দেখা বঁলিহাস দেখে কোন এক অজানা জগতে প্রবেশ করে। পাখি টাকে সূর্যের দিকে উড়তে যেতে দেখে তার মনে হচ্ছে এক মুঠো সোনালি বালু যেন আকাশ পথে চলে যাচ্ছে। তবে সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি কল্পনার জগতে বাসা বাঁধেন না। তিনি নৌকাটাকে বেঁধে রেখে উপরে উঠে এসেছেন খাওয়ার জন্য। নৌকাবাহক নিজেকে বঁলিহাস থেকে বেরোতে পারেনি সেজন্য সাদা পোশাক ব্যক্তি তাকে বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসার জন্য বলতে থাকে আজ সূর্য যেমন উঠেছে বড় গরম পড়বে। তাই সে বোঝাতে থাকে দুজনের বিশ্রাম নেওয়া উচিত। নৌকায় গিয়ে ঘুমানো দরকার, সারারাত নৌকার হাল চালানোর পর নৌকাবাহক যে ক্লান্ত সে সেটা অনুভব করতে পারে না। নৌকাবাহক পার্থিব জগতের চিন্তা চেতনা জ্বালা যন্ত্রনা সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে অন্য জগতে প্রবেশ করতে চায়।

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। তুমি সত্যিই পাগল যা করছ তার কোনোই মানে হয় না।

নৌকাবাহক।। (গ্রামটির নাম স্মরণ করবার চেষ্টা করে)
কী নাম? গ্রামটি সত্যিই চিনি, কিন্তু তার নাম মনে পড়ছে না।
সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। না, তোমার এ-পাগলামির কোনোই মানে হয় না। বদ্ধ পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।
নৌকাবাহক।। গ্রামটি চিনি কারণ দুবছর আগে সেখানে একটি লোক ভীষণভাবে মরেছিল।'[৬]

নৌকাবাহকের কাছে বেঁচে থাকার স্বপ্নটা ধূসর। তাই সে সব কিছুর পরেও গ্রামের স্মৃতিকে মনে করেছে কোন একজন মানুষের মৃত্যুর কি নৃশংসতা হিসাবে। তার মনে আসে বাঁশে বিদ্ধ হয়ে লোকটি আহত হয়েছিল। ব্যথা লাগবে বলে কাউকে বাঁশটি বার করতে দেয়নি। তার মরতে তিন দিন তিন রাত লেগেছিল। সাদাপোশাক ব্যক্তির কথায় নৌকাবাহকের এসবই কল্পনা। সে গ্রামটিকে চেনে, এমন ভাবছে কেননা, সে বিশ্বাস করতে চায়, যে পথ দিয়ে সে যাচ্ছে সেই পথ তার একটি সুপরিচিত চিহ্ন। নৌকাবাহক কারো কথায় কান দেয় না। সে বলতে থাকে তিন দিন তিন রাত আত্মীয় স্বজনরা তার পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। একটা সময় পরে বাঁশবিদ্ধ লোকটিও কাঁদতে শুরু করে। সে নাকি ভেবেছিল সে নয় অন্যকেউ নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে। তার জন্য অন্যদের সঙ্গে সেও কাঁদছে। নৌকাবাহক আরো ভাবে শৈশবে সে আর কষ্ট ভোগ করেনি। তার নিদারুণ কষ্ট এবং তার ভীষণ মৃত্যু অবশেষে অন্যের কষ্টে ও মৃত্যুতে পরিণত হয়েছিল। সাদাপোশাক ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে কেনো সে কথা বানাচ্ছে। নৌকাবাহক তার মনকে বোঝাতে চায় সে নয় অন্য কেউ নৌকা টানছে। সে জানে সে কোথায় যাচ্ছে। নৌকাবাহক বলে ওঠে কোথাও না কোথাও তো যেতেই হবে। এমন এক সময় আসে যখন না গিয়ে তার উপায় থাকে না। সাদাপোশাক ব্যক্তি বোঝাতে থাকে নৌকাবাহকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তিনি বোঝাতে থাকে যারা যায় তারা অকারণে যায় না। নিজের জন্য না হলেও অন্তত পক্ষে অন্য কারো জন্যে যায়। উদ্দেশ্য একটা থাকেই। সে শূন্যে নৌকা টানছে, কোথায় যাচ্ছে তাও জানে না। এগুলি নৌকাবাহকের বদ্ধ পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

সমাজের জাতাকলে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে থাকা নৌকাবাহক আজ ক্লান্ত হলেও একটা সময় সে খুশিতে ছিল তার কাছে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার পরিস্থিতি ছিল। সেই স্ফূর্তির নিঃশ্বাস যে বেশিদিন নিতে পারেনি। তার সংসার যাত্রা সুখের হয়নি সে সবই উঠে এসেছে তাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে।

নৌকাবাহক।। আমার দুই ছেলে বসন্তে মরেছে। সে তিন বছর হল। তখন সবে মাত্র নতুন বছর এসেছে। মাঠে মাঠে ঘূর্ণি হাওয়া।
সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। তারপর গত বছর তোমার তৃতীয় ছেলেটিও মরল। আদরের ছেলে।

সেও মরল। তারপর তোমার বউ। সেও আর নাই।
ধীর স্থির দয়ালু বউ, সেও মরল। কিন্তু তুমি
ছাড়া কেউ কি বউ হারায় নাই?

নৌকাবাহক।। (হঠাৎ সন্ধিগ্ধভাবে) আমার বউ-ছেলেদের কথা বলছ কেন?

সাদাপোশাক পরিহিত ব্যক্তি।। সারারাত অর্থহীন ভাবে খালি নৌকা টেনেছ, তুমি জান
না কেন? শোন তোমার বুকে অনেক দুঃখ, কিন্তু তাই
বলে এমন পাগলামি করবে নাকি?[৭]

নিজের তিন পুত্র, সংসার জমিজমা সবকিছু হারিয়ে সে নিজে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব থেকে মুক্তি পেতে নৌকাবাহক উজানের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। নৌকাবাহকের এই উজান যাত্রায় সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি তাকে সাহায্য করে। কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ভয় পায়, সে উজান যাত্রা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। বিশ শতকের সমসমায়িক নানা পরিস্থিতি মানুষকে অনেক বেশি হতাশাগ্রস্থ করে তুলেছিল। তাই জীবনের একটা সময় এই নিঃসঙ্গতা দেহকে ভারী করে তোলে। তখন সে অনাবিল শান্তির জগতে যেতে চায়। তাই সে অনন্তের উজান যাত্রায় চলতে থাকে। সে যেন তার গন্তব্যের ঠিকানা খুঁজে পায়। তাই সে বলে ওঠে-

নৌকাবাহক।। ঐ যে, সে-গ্রাম! অতি উজ্জ্বল, তবু তারার মতো তাপশূন্য। দেখলেই
বুক জুড়িয়ে যায়।[৮]

কালোপোশাক ব্যক্তিও রেগে যায়, বলে জেগে উঠুন। স্বপ্ন দেখবেন না। তবুও নৌকাবাহক নিজের মনের জগতে বিচরণ করে। তার মনে প্রাণে আশ্চর্য ভয়ের উদয় হয়েছে। সে মনে করছে বিয়ের প্রথম দিনে তার বউয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। সে ভাবছে সে শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে। সে জানে না নৌকাটা কেন এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেমন এক প্রান্তর থেকে অন্যপ্রান্তরে যায় তখন তারও কোন অর্থ থাকে না। সাদা পোশাক ব্যক্তি নৌকাবাহককে নৌকা রেখে দিয়ে গন্তব্যে যাওয়ার কথা বললে যে জানায়-

নৌকাবাহক।। (তাকে থামিয়ে) না না, এখানে নৌকা ছেড়ে যাব না। এতখানি পথ সঙ্গে করে এনেছি। এখন সেটা ত্যাগ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া গন্তব্যস্থল দেখতে পেয়েছি বলে এবার ফাঁকি দেব, সেটা ভালো কথা নয়।[৯]

এটা নৌকাবাহকের শেষ সংলাপ। হাঁপানীর আওয়াজ তুলতে তুলতে সে তার নৌকা নিয়ে এগিয়ে চলে। খারাপ অবস্থায় থামে এবং তাঁর হাপানীর আওয়াজও অমানুষিক শোনা যায়।

'নাট্যকার কালো পোশাক-পরিহিত ব্যক্তির মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগ যন্ত্রণা, ক্লান্তি, নৈরাজ্য এ বিষয়টিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।'[১০] নাটকটিতে মৃত্যু এসেছে বার বার। 'নৌকা

বাহকের তিন ছেলে, বৌ, বাশের আগায় বিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া লোকের মৃত্যু। একদিকে মৃত্যু অন্যদিকে জীবন। এই দুইয়ের মাঝখানে স্বপ্ন দেখা। অন্তলোকে নিমগ্ন থাকা শ্রমজীবী মানুষের অভিযাত্রার নাটক উজানে মৃত্যু।[১১] তবুও 'উজানে মৃত্যুর সংলাপ কার্যকরহীন, বিষম কালচেতনার মধ্য দিয়ে বহমান চরিত্র সমূহের চেতনাপ্রবাহের ভাষ্য; তাদেরই কথামালার সমষ্টি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো অর্থপূর্ণ বক্তব্যের সন্ধান দেয় না।'[১২] 'উজানে মৃত্যু নাটকটি সমকালীন সমসাময়িক পরিস্থিতিতে মানুষের দোলাচলতাকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। অসিতাভ দাশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত তারিখ অভিধান ১৭৫৬-১৯৪৭, পত্রলেখা, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৪৮

২। সমকাল পত্রিকা, দাঙ্গা, মঙ্গলবার ৩১ জুলাই ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ৪

৩। তদেব, পৃ. ৫

৪। তদেব, পৃ. ৫

৫। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নাটক সমগ্র, জুলাই ২০১৪, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ৩৯

৬। তদেব, পৃ. ৪০

৭। তদেব, পৃ. ৪২

৮। তদেব, পৃ. ৪৯

৯। তদেব, পৃ. ৫১

১০। হোসনে আরা জলী, নাট্য বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ, ২০১২, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৬৫

১১। মমতাজ উদদীন আহমদ, আমার নাট্যভাবনা, ২০০০ বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ৪৫৬

১২। জীনাত ইমতিয়াজ আলী : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ : জীবন দর্শন ও সাহিত্য কর্ম, ১৯৯২, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৮১

বাংলার মুখ: পথের পাঁচালীর গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর

মনোজ মণ্ডল*

সারসংক্ষেপ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপনাসে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একটি চিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে। এই গ্রাম বিভূতিভূষণের চোখে দেখা গ্রাম। লোকায়ত জীবনের নানা অনুষঙ্গ লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। নিশ্চিন্দিপুর শুধু বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ করা নিছক একটি গ্রাম জীবনের আলেখ্য-চিত্র মাত্র নয়, নিশ্চিন্দিপুর চিরায়ত বাংলার মুখ হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের দেখা দলাদলি-ঈর্ষা-প্রেমভালোবাসার গ্রাম নয়, বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুর পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কোলাজে চির ঐতিহ্যময় বাংলার গ্রাম হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে কোন লেখক কোন একটি গ্রামকে পরিবেশ-প্রকৃতি-মানুষের সহাবস্থানে চিরন্তন বাংলার মুখ হিসেবে তুলে ধরতে পারেননি, যা বিভূতিভূষণ নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে করতে পেরেছেন।

সূচক-শব্দ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী, নিশ্চিন্দিপুর, হরিহর, সর্বজয়া, অপু।

মূল আলোচনা

'পথের পাঁচালী' তে গ্রামজীবনের ভাষ্যই উঠে এসেছে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে। গ্রাম জীবনের লোকায়ত দিকগুলি এর আগে এতো স্বচ্ছ ও স্পষ্ট রূপে দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন 'পথের পাঁচালী' যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। বিভূতিভূষণ যে গ্রাম জীবনেরই রূপকার এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র ১৩৪২ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যার 'পরিচয়' পত্রিকায় 'দৃষ্টি প্রদীপ'-এর আলোচনা সূত্রে লেখেন–

''পথের পাঁচালী'তে পেলাম বাংলার পল্লীর অন্তর্লীনরূপ অপুর দৃষ্টি দিয়ে। তার আরণ্যকতা, গ্রাম্য জীবনযাত্রা অদ্ভুত সুসঙ্গতি পেল পারিপার্শ্বিক সহানুভূতিতে। প্রথম বোঝা গেল, মেঠো সুর ধরবার এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাকে সুধী সমাজের কাছে উপাদেয় করে তোলা যায়।''[১]

'পথের পাঁচালী'র আগেই গ্রামজীবন নিয়ে প্রথম সূচনা রেভা. লালবিহারী দে'র 'গোবিন্দ সামন্ত' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই গ্রন্থে বর্ধমানের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম্য জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করি। 'গোবিন্দ সমান্ত'ই প্রথম গ্রামজীবনের আলেখ্য। যদিও সে আখ্যানে গ্রামজীবনের বিচিত্র বিষয় উঠে এসেছে–কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র মতো 'রস মধুর স্বচ্ছ

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ।

গ্রাম্যরস নেই।'[২] বিভূতিভূষণই প্রথম 'তাঁর অনুভূতি মাহাত্ম্যে এবং মর্মস্পর্শী অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে তাকে রূপায়িত করেছেন।'[৩] গ্রাম্য পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোলাজ বিভূতিভূষণের পূর্বে কেউ এমন প্রত্যেক্ষ ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে পারেননি। 'পথের পাঁচালী'তে জীবন আছে কিন্তু জীবনের জটিলতা বা দ্বন্দ্ব নেই। বিভূতিভূষণের পূর্বেই শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' লেখেন। সেখানে পল্লী সমাজের সমস্যার কথা আছে, প্রেম ভালোবাসার কথাও আছে, দলাদলিও আছে মানুষে মানুষে। 'পল্লীসমাজে' সমাজ আছে, সামাজিক সমস্যাও আছে। সেখানে পল্লীর মানুষ আছে অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনের বাস্তবতার বাস্তবায়নই প্রাধান্য পেয়েছে। পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেমন যোগ নেই, সেই সঙ্গে পল্লী-সাংস্কৃতিক জীবন ও তার ব্যবহারিক জীবনেরও যোগ নেই। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের মূল্যায়ন–

''যে বাংলার শতকরা ৯০ ভাগ জীবন পল্লী-কেন্দ্রিত, সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব সাহিত্য শহর কেন্দ্রিক। এ প্রয়াসও নিশ্চয়ই শতকরা ততো ভাগই ছিল মূল্যহীন। কিন্তু মূল্যহীন হয় তাদের আরও উদ্ভট ভাবনা ও অবাস্তব চরিত্র পরিকল্পনায়। বাংলা কথা-সাহিত্যের মোড়ও বাস্তবের দিকে ঘুরতে না ঘুরতেই অবাস্তবের চোরা বালিতে আটকে গেল। তার কারণ এই যে, ইংরেজ আমলের বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মূলেই ছিল না মাটি।''[৪]

গ্রামের মানুষ হয়েও গ্রামীণ অভিজ্ঞতাপুষ্ট লেখকের সন্ধান শরৎচন্দ্রের আগে কাউকেই পাওয়া যায়নি। বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টারাও পল্লীজীবনের বাস্তব সত্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কেবল নগর জীবনেরই সমস্যা, নগরের পটভূমিতেই বিস্তৃত করেন। পল্লীজীবন যে সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে, সে দিকে কারও দৃষ্টিপাত ছিল না। সেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শহরের জীবন থেকে পল্লীজীবনের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। বাংলা সাহিত্যে গ্রামজীবন উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এ বিষয়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন–

''আমি চিরদিনের কলকাতার মানুষ। বাঙলার পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লী জীবনের সঙ্গে এমন আজন্ম পরিচয়ের দাবি করতে পারিনা। কিন্তু বেশ একটা মমতাবোধ করি তার জন্য, তাতে ভুল নেই। আর 'পথের পাঁচালী'র অপুর সঙ্গে অনুভব করি বাঙালী শিশুর অভিন্নতা।''[৫]

'পথের পাঁচালী'র পথ ধরেই গ্রাম কাকে বলে, গ্রামের জীবন কাকে বলে, গ্রামের উৎসব পাল-পার্বণ কাকে বলে, গ্রামের সঙ্গে প্রকৃতিরও যে একটা অবিচ্ছেদ্য সংযোগ সূত্র আছে, তা আদিম প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত, তা বিভূতিভূষণের চোখ দিয়েই বাঙালি প্রত্যক্ষ করলো গ্রাম ও গ্রামজীবনের লোকায়ত বিচিত্র সব বিষয়।

গ্রাম বলতেই বোঝায় তার সবুজ-প্রকৃতি ও গাছ-পালা, বৃক্ষলতা গুল্ম শ্যামলিমায় পূর্ণ ঝোপ-ঝাড়, পুকুরঘাট, আঁকা-বাঁকা পথের ধারে বিচিত্র বুনো ফুল ঘাস-লতা-পাতায়

মোড়া সবুজের এক মায়বী পরিবেশ—আর সেই পরিবেশ তো কেবল প্রকৃতির দখলে নয়, মানুষের দখলেও, মানুষছাড়া প্রকৃতির মূল্যই বা কে দেবে? পল্লীবাসীই জানে তাদের জীবনে গাছ-পালা-বৃক্ষলতার কী মাহাত্ম্য। বিভূতিভূষণই প্রথম গ্রাম জীবনের প্রকৃতিকে তুলে আনেন- 'পথের পাঁচালী'র পাতায় পাতায়। বিভূতিভূষণ গ্রামের সমস্যার কথা বলেননি, কিন্তু গ্রামীণ জীবনের কথা বলেছেন। যে গ্রামজীবন সমকালীন লেখকদের রচনায় সুলভ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত গ্রামীণ জনজীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থাকলেও, বিভূতিভূষণ একটি ব্যক্তি ও পরিবারের আলোকে গ্রামকে দেখেছেন। ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ দুর্দশাকে তিনি নিজের রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেও, গ্রামকে করেছেন তাঁর রচনার সহায়ক শিল্প সুষমায় মণ্ডিত একটি আধার। যে আধার আলোর অধিক হয়ে বিকশিত করেছে ব্যক্তিকেও। গ্রামই হয়ে উঠেছে ব্যক্তির জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন। গ্রামকে বর্জন করে বিভূতিভূষণের ঔপন্যাসিক সত্তার পূর্ণতা যেমন নেই, তেমনি গ্রাম ছাড়া জীবনই নেই। আমরা আমাদের নিবন্ধে উদঘাটিত করতে চেয়েছি ব্যক্তি নয়, গ্রামের প্রকৃত রূপচিত্রণ। আমরা তাই 'পথের পাঁচালী'র গ্রামীণ পরিবেশগত কিছু বিশেষত্ব – যেমন যে কোনো জনপদের পথ-ঘাট ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

'পথের পাঁচালীর' গ্রাম বলতে 'নিশ্চিন্দিপুর' গ্রামকেই ধরা যেতে পারে। উত্তর চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চল বনগাঁ সন্নিহিত একটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই তাঁর উপন্যাস গড়ে উঠেছে। সে গ্রামের পথ-ঘাট বাড়ি-ঘর কেমন? 'পথের পাঁচালী'র সূচনাংশেই বলা হয়েছে— ''নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠা বাড়ী।''[৬]

সেকালের গ্রামের সাধারণ পরিবারের কোঠাবাড়ি অর্থাৎ ইটের পাকা বাড়ি দু-একটি দেখা যেত। নিশ্চিন্দিপুরে এমন একটি কোঠা বাড়ির মালিক হরিহর রায়। ধানের মরাই ব্যতীত গ্রামকে গ্রাম বলে মনে হবে না। নিশ্চিন্দিপুরে ধানের মরাই যে সম্পন্ন পরিবারের আর্থিক অবস্থার প্রতীক, তা রামচাঁদ-এর কথা থেকেই জানা যায়— ''ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু- পুরুষ হেসে-খেলে কাটাবে।''[৭] এমন কোনো গ্রাম নেই যে বাঁশ-বাগান নেই— ''তখন কি ছিল ঐ রকম বাঁশ বাগান!''[৮]

গ্রামের বাড়িতে ঢেঁকিশাল থাকবে না একথা গ্রামের লোকের কল্পনার বাইরে ছিল—

''পৌষ পার্ব্বণের দিনও ঢেঁকীশালে এক মণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাকরুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ঐ রায় বাড়ীর সেজ বৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকীতে দমাদম পাড় পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা হাতে একবারে সামনে সরিয়া আসিতেছে...।''[৯]

এক সময় গ্রামে ঢেঁকি প্রতিটি গৃহেই ছিল। ''ঢেঁকি ছিল হিন্দু বাঙালির মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ঢেঁকিশালকে (যেখানে ঢেঁকি থাকে) বাঙালি গৃহিণী অতি পবিত্র মনে করতেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বিয়ে প্রভৃতি শুভ কাজে 'ঢেঁকি পুজো' (ঢেঁকি মঙ্গল) এবং ঢেঁকিতে ধান ভানা ও হলুদ কোটার চল ছিল...

'ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনুন জ্বলন্ত' (সেঁজুতি ব্রত ছড়া) এক সময় ছিল গৃহস্থের সচ্ছলতার সাক্ষ্য। এক সময় সমস্ত চালই ছিল ঢেঁকি ছাঁটা।"[১০] বিভূতিভূষণ তাঁর রচনায় ঢেঁকিকে বর্জন করে গ্রামের কথা ভাবতেই পারেননি।

গ্রামে কোঠাবাড়ি থাকলেও খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়ির অভাব ছিল না। অধিকাংশ বাড়িই ছিল শুখনো সোনালী খড় দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই দেখা যায়—''হরিহরের পুবের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে।"[১১]

গ্রামে বসবাস ছিল যেমন আনন্দের, তেমনি ভয়েরও। ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু ছাড়া ডাকাতির ভয়ও ছিল—

''নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াভাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালের এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা।"[১২]

সেকালের গ্রামবাংলায় এমন ঠ্যাঙাড়েদের অভাব ছিল না। নিশ্চিন্দিপুরের তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ঠ্যাঙাড়ের দল থাকবে না, এ কেমন করে হয়। বিভূতিভূষণ তাঁর 'পথের পাঁচালী'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঠ্যাঙাড়েদের কাজ কর্মের যে পরিচয় প্রদান করেছেন, তা থেকে উপলব্ধি করা যায় গ্রাম বাংলায় ঠ্যাঙাড়েদের উপদ্রব ন্যূন ছিল না। বরং তা ভয়ঙ্কর ছিল। এদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বহু বিত্তশালী মানুষ-জনও।

গ্রামে খাল বিল থাকাই স্বাভাবিক। সেই সব খাল বিল নদী সংলগ্ন অঞ্চলে হাট-বাজার তো বসতোই, সেই সঙ্গে নদীতে নৌকা চলাচলের বিষয়টিও গ্রামজীবনের স্বচ্ছন্দ গতির প্রতীক ছিল একদা। নদীর তীরে কাশবনও মনে করিয়ে দেয় শরৎকালের আনন্দঘন দিনের উপস্থিতি—''নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহনার জল একাকার করিয়া উঠিতেছিল।"[১৩] নোনা গাঙের জল—হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি, জ্যোৎস্না, মোহনার জল একাকার হয়ে যেন এক মায়াবী সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

গ্রামের মূল ভূ-প্রকৃতি হল তার গাছপালা। গাছ-পালা না থাকলে গ্রামকে গ্রাম বলে চিহ্নিত করাই যাবে না। মাঠে পথের পাশে, পুকুর পাড়ে, খালের ধারে, নদী-নালার তীরে চিরন্তনী বাংলার সবুজ গাছ-পালা-বৃক্ষরাজি, লতা-পাতাই ভূ-প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রতিমা। বিভূতিভূষণ এমন সব গাছের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যা আমাদের বিস্মিত করে।

একজন ব্যক্তি কতখানি গ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে তবে প্রতিটি গাছ-পালার নাম ও তার প্রকৃতিগত বিশেষত্বের বর্ণনা করতে পারেন–

''মাঠের ঝোপঝাড়গুলা, উলুখড়, বনকলসী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমী লতা, সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে–ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্য্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ার স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা...।''[১৪]

আমরা বিভূতিভূষণের লোকায়ত উদ্ভিদ জগতের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর চোখ দিয়েই গ্রামকে প্রত্যক্ষ করি, যে গ্রাম আমাদের জীবনে দিয়েছে বেঁচে থাকার রসদ । গ্রামই তো সভ্যতার সূচক। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ''দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ না দেশকে জানি.....ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।''[১৫]

বিভূতিভূষণ এমনভাবেই দেশকে গ্রামের মধ্যেই খুঁজেছেন। তাঁর সেই গ্রাম অনুসন্ধান কতো নিবিড় ও প্রত্যক্ষ তা উপলব্ধি করা যায়–সামান্য ঘাস-লতা-গুল্মও যখন বাদ যায় না - আলকুশী, নাটাফল, আড় শ্যাওড়া, কুল, জাম, নোনা, আমড়া, কলমী, রাঙ্‌চিতা, বৈচি, শেয়াকুল, কন্টিকারী, কাল কাসুন্দে, ভাট শেওড়া, গাবগাছ, অশ্বত্থ গাছ, বকুল গাছ, খেজুর গাছ, ছাতিম গাছ, জামরুল, কাঁঠাল গাছ, পানিফল, ময়না কাঁটা, শ্যাওড়া গাছ, নারকেল, সুপারি, কুকশিমা, লিচু, বনধুঁধুল, লেবু করমচা, পেয়ারা গাছ, কলাগাছ, বেদানা, তেঁতুল, ডুমুরগাছ, জগডুমুর, গুলঞ্চলতা, প্রভৃতি ভূ-প্রকৃতিতে যেন ছবির মতো আঁকা গ্রাম।

ফল-পাকুড়, শাক-সবজি যেমন, তেমনি পশু-পাখিরাও বাদ যায় না। পশু-পাখিও তো গ্রাম্য প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। গরু, ছাগল, শুয়োর, ইঁদুর, হলদে পাখি, নীলকণ্ঠ, টুনটুনি, কুকুর, শকুনি, শকুনির ডিম, প্রভৃতির মতো বিষয়ের অনুষঙ্গে গ্রাম যেন চিন্ময়ী থেকে মৃন্ময়ী রূপ ধারণ করেছে বিভূতিভূষণের নরম স্নিগ্ধ কলমের আঁচড়ে।

গ্রামের দুর্গা মণ্ডপ, পাঠশালা, কামারবাড়ি, কৃষিক্ষেত সবই বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গ্রামকে শ্রীময়ী করে তুলেছে। পাঠশালার এমন বর্ণনা 'পথের পাঁচালীর' গ্রামের চালচিত্রকে লেখক তুলে ধরেছেন চতুর্দশ পরিচ্ছেদে–

''গ্রামের প্রসন্ন গুরু মহাশয় বাড়িতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না...।

গুরু মহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুম্বর করিয়া পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাত তাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড়ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার

সামনে দু'জন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম। এবং অন্য ছেলেটি বলিতে ছিল, এই আমার গোল্লা...

কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরু মহাশয় হাঠাৎ বলিলেন– ফণে শ্লেটে ওসব কি হচ্ছেরে?...

...হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শ্লেটে?–য'তে ধরে নিয়ে আয়তো দুজনকে, কানধরে নিয়ে আয়!"[১৬]

কেমন ছিল সেই গ্রামীণ পাঠশালা?

''পাঠশালা বসিত বৈকালে। সব সুদ্ধ আট দশটি ছেলে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে; ...যে ঘরটায় পাঠশালা হয় তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে।... আট দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়–এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস? কান মলে ছিঁড়ে দেবো একেবারে।...

গুরুমশায় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপরে বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে.....।"[১৭]

গ্রামের পাঠশালার এমন নিখুঁত বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন গ্রামের শিক্ষার পরিবেশটি ধরা পড়েছে।

গল্প গুজবের জায়গা বলতে তখন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপগুলির বেশ কদর ছিল। বিভূতিভূষণের পর্যবেক্ষণে চণ্ডীমণ্ডপের কথাও ওঠে আসে— ''পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসর প্রাপ্ত গৃহস্থ বুঝি বেশি আর নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন।"[১৮]

ফুল ছাড়া কি গ্রামের ভূ-প্রকৃতিকে চেনা যায়? সে ফুলের জলসায় বোলতা মৌমাছি টুনটুনিদের আনাগোনায় চোখ এড়িয়ে যায় না। ফুলের সঙ্গে জ্যোৎস্না, ফুলের সঙ্গে প্রভাতের অভিন্ন-হৃদয় সম্পর্ক যেন গেঁথে দেওয়া হয়েছে।—

''গ্রাম নিশুত হইয়া গেলে অনেক রাত্রে... বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গ শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাঁওড়া, নটকান, গুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথায় লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীলপাপড়ি কলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডালপালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলে মেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তার রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মাথায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।"[১৯]

গ্রাম তো কেবল মানুষকে নিয়ে নয়, তার দারিদ্র্য নিয়ে নয়। গ্রামের সৌন্দর্য তো তার অপরূপ দিবা-রাত্রির পট-পরিবর্তনেও। এক একটা সময় এক একটা সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে রাখে প্রকৃতি। প্রভাতের এক রূপ, মধ্যাহ্নের এক রূপ, অপরাহ্নের একরূপ, সন্ধ্যার একরূপ, মধ্যরাত্রির একরূপ। পোড়ো ভিটের একরূপ। বিভূতিভূষণের রচনায় গাঁয়ের পোড়ো ভিটের চিত্র উঠে এসেছে—নিঃশব্দ শান্ত বিকালের কথা; সন্ধ্যায় অন্ধকারে প্রদীপ না জ্বলার কথা। কেবল ''জনহীন ভিটার উঠানে ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা'র ডাক, গভীর রাত্রে পিছনের ঘনবনে জগুডুমুর গাছে লক্ষ্মী পেঁচার রব শোনা যায়...।"[২০]

এই যে গ্রাম্য প্রকৃতির পরিচয় বিভূতিভূষণ তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে বিবৃত করেছেন নিশ্চিন্দিপুর নামে, সে গ্রাম তাঁর আদিনিবাস বসিরহাটের পানিতর গ্রামেরই বর্ণনা। বিভূতিভূষণের দিনলিপি ও স্মৃতিরেখায় বর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে কেমন যেন মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। বিভূতিভূষণ তাঁর 'আরণ্যকে' যে প্রকৃতির কথা বলেছেন, সে প্রকৃতি মেলে না অপুর গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে। দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের স্বতন্ত্র পরিবেশের মধ্যে সবুজেরও যেন একটা ভেদরেখা চোখে পড়ে। বিভূতিভূষণের নিরীক্ষণে গ্রাম প্রকৃতি ধরা পড়েছে সুন্দরভাবে। 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃত গ্রাম্য প্রকৃতি ও গ্রাম্য পরিবেশ চেতনাই তাঁর বিশল্যকরণী বলে মনে হয়েছে 'তৃণাঙ্কুর'-এর বর্ণনা থেকে –

''প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দ-ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূরপারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনো শুকনো সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী—মৃত মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।"[২১]

বলতে গেলে বিভূতিভূষণ তাঁর গ্রামজীবনকেই অকপটে তুলে এনে 'পথের পাঁচালী'র গ্রামে স্থাপন করে কেবল নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামেই সীমাবদ্ধ করে রাখেননি— বাঙালির দেখা ও জীবন অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে নিজেকেও যুক্ত করে নেন—'আপনার মুখ আপনি দেখুন' নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামীণ দর্পণে—এই অভিজ্ঞতার শরিক করে তোলেন আপামর পাঠককেও।

পাদটীকা:

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, পরিচয়, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, সূত্র : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গতঃ বিভূতিভূষণ, নাথ পাবিশিং হাউস, ১৯৮১, পৃঃ ১৮১

২. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গত : বিভূতিভূষণ, নাথ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১, পৃঃ ১৮১

৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮১

৪. গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবারাত্রির কাব্য, দ্বাবিংশ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, সূত্র : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গতঃ বিভূতিভূষণ, নাথ পাবিশিং হাউস, ১৯৮১, পৃঃ ১৭১

৫. প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৭২

৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী, মিত্র ও ঘোষ, নবম মুদ্রণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৪

৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬

৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ৬

১০. মিলন দত্ত বাঙালির খাদ্যকোষ, দেজ পাবলিশিং,২০১৫, পৃঃ ১৭৮-১৭৯

১১. প্রাগুপ্ত (৬ নং টীকা), পৃঃ ৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশের কাজ পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃঃ ৩৬৮

১৬. প্রাগুপ্ত (৬ নং টীকা), পৃঃ ৯৩-৯৫

১৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৬

১৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৭

১৯. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪১

২০. প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৩৪৯-৫০

২১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর, বিভূতি রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৫, পৃঃ ৩০৮

দেশভাগের সত্তর বছর ও দেশছাড়া বাঙালি

সুখেন্দু বিশ্বাস*

সারসংক্ষেপ : একটি জাতি হিসাবে বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড়ো আঘাত দেশভাগ। দেশভাগের আগে বাঙালীজীবন যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, দেশভাগের প্রবল ধাক্কা দুই বাংলার বাঙালী সংস্কৃতির চিরবন্ধনকে যেন আলাদা করে দিল। ফলে এদেশে যেমন মুসলিমদের অনধিকার বসবাস বলে হিন্দুরা মনে করতে লাগল, তেমনি পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তানের) মুসলিমরাও ভারত বিরোধিতা আর হিন্দু বিরোধিতাকে এক করে দেখতে লাগল। এই আবহে ওপারের হিন্দুরা চলে এল এপারে আর এপারের মুসলিমরা চলে যেতে লাগল ওপারে। কিন্তু ওপারের হিন্দুরা এপারে এল সর্বস্ত ফেলে উদ্বাস্তু হয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে আর এপারের মুসলিমরা ওপারে গেল এক নিশ্চিত আশ্রয়ের ভরসা নিয়ে। কিন্তু তারপর? দেশভাগের সত্তর বছরে এই দেশছাড়া জনগোষ্ঠীর পরবর্তী জীবনের ইতিহাস কেমন হল? এটাই এই গবেষণার মূল ক্ষেত্র।

সূচক শব্দ: দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী সংস্কৃতি, দাঙ্গা, সংখ্যালঘু, স্মৃতিচারণ।

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে এল দেশভাগজনিত ক্ষত। কিন্তু মনে রাখতে হবে মাউন্টব্যাটেনের দেশভাগের ঘোষণাটি কোনো সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়নি। ১৯৪৭ সালের মে মাসে মাউন্টব্যাটেনের চিফ অব স্টাফ লর্ড ইসমাই ভারত বিভাগের কাগজপত্র নিয়ে লন্ডনে গেলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রীসভার অনুমোদন নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু এরপরেও কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে টানাপোড়েন চলল দেশভাগের নিয়ে। ফলে মাউন্টব্যাটেন ৩ জুন দুই পক্ষের নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জহরলাল নেহরু, জিন্না, লিয়াকৎ আলি, বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালিনী। সেই বৈঠকেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল না। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের বিষয়টিকে আর ঝুলিয়ে রাখতে চাননি। ফলে প্রায় বাধ্য হয়েই স্থির করা হল, ভারত স্বাধীন হচ্ছে এবং তা হচ্ছে দেশভাগের মাধ্যমেই—এ মর্মে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হবে। এই মর্মে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে মাউন্টব্যাটেন, নেহরু এবং জিন্না ভাষণ দিলেন। এই ঘোষণায় মর্মে আঘাত পেলেন গান্ধীজি। সারাদেশ স্বাধীনতার আনন্দে ভেসে গেলেও সে আনন্দে যোগ দিতে পারল না বাংলার হিন্দুরা। তারা প্রহর গুনতে লাগল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায়।

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাণাঘাট কলেজ।

১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল, তার প্রধান ইস্যুই ছিল দেশভাগ। মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিতে এবং কংগ্রেস অবিভক্ত ভারতের দাবিতে নির্বাচনে লড়ে। কিন্তু এই নির্বাচন দেশভাগ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। দেশভাগের বিষয়টিকে যেন ত্বরান্বিত করেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী শাহিদ সুরাবর্দি। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লিগের 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করার দিনটিকে তিনি সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। আর তার উৎসাহে কলকাতায় শুয় হয় দাঙ্গা। পরে ওই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, বিহার, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন প্রদেশে। ফলে যে দেশভাগের বিষয়টি ছিল উচ্চ নেতৃবৃন্দের আলোচনার টেবিলে, তা নেমে এলো সর্বসাধারণের জাতিদাঙ্গায়। দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী একটি পরিণতিরপথে এগিয়ে চলল।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পটভূমি, দেশভাগের কারণ ও ফলশ্রুতি এবং বাঙালিজাতির দ্বিখণ্ডিত হবার মর্মযন্ত্রণা ও তাদের উদ্‌বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করেছেন অনেক আলোচক, সাহিত্যিক। এইসব আলোচনা মূলত ছিল রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক। কিন্তু দুই বাংলার বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম তাদের পূর্বপুরুষের পরিচিত পরিমণ্ডল ছেড়ে ভিন্ন এক দেশকালের মধ্যে পড়ে তারা এই নতুন জীবনে কতটা মানিয়ে নিতে পেরেছে এবং নতুন এই জীবনের সঙ্গে ফেলে আসা জীবনের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা জীবনের প্রকৃত স্বরূপটিকে কেউ ধরতে চেষ্টা করেননি। সুতরাং পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে উদ্‌বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা পেরিয়ে যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ও সুস্থভাবে বেঁচে আছে, তারা এই নতুন দেশকে কতটা আপন করে নিতে পেরেছে এবং ফেলে আসা দেশটি তাদের হৃদয়ের কতটা জুড়ে আছে তার একটা অনুসন্ধান প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলিমের ধর্মীয় আচার পৃথক, কিন্তু তাদের ভাষা, জীবিকা, তাদের সুখ-দুঃখ বঞ্চনার উপকরণ এক। ফলে স্বাধীনতা পর্বের অবিশ্বাসের বাতাবরণ পেরিয়ে বর্তমানে তারা কতটা এক হতে পেরেছে তারও একটা অনুসন্ধান প্রয়োজন। তৃতীয়ত, পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাংলার হিন্দু ও মুসলিম থাকুক না কেন ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বাঙালি হিসাবে একই সংস্কৃতির বন্ধনে তারা কতটা এক হতে পেরেছে এবং এই কাজে বর্তমান প্রজন্মেরও যে একটি ভূমিকা আছে সেই বিষয়ে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। সর্বোপরি, আপন মর্মযন্ত্রণা হিসাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস দরকার।

মূল আলোচনা

১৯৪৭ সালের ২৬ এপ্রিল সুরাবর্দি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটি গোপন বৈঠক করেন এবং প্রস্তাব দেন, বাংলাকে অবিভক্ত রেখে ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত না করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য। মাউন্টব্যাটেন রাজি হলেন এবং ২ ঘন্টার মধ্যে জিন্নার

সঙ্গে বৈঠক করে তার মতামত চাইলেন। জিন্না রাজি হলেন। কারণ জিন্না বিশ্বাস করতেন এ রাষ্ট্র পাকিস্তানের বন্ধু হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে বাঙালী হিন্দুদের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করে এর বিরোধিতায় নামলেন হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৭ সালের ২ মে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি দিয়ে বোঝান, গত ১০ বছরে বাংলায় মুসলিম লিগের সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলার হিন্দুরা কী ভয়ঙ্কর প্রশাসনিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এরপর যদি বাংলা স্বাধীন হয় বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে বাঙালী হিন্দুদের দুর্দশার আর সীমা থাকবে না।

কিন্তু তবুও ১৯৪৬ সালের ভোটে নির্বাচিত বাংলার বিধায়কদের মতামত নিতে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হল। সেখানে আলোচনার বিষয় ছিল বাংলা ভাগ হবে নাকি অখণ্ড থেকে ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে। কিন্তু বিধানসভায় আলাদা আলাদা তিনটি অধিবেশনের পরেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসা গেল না। শেষে ঠিক হল, ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুসলিম গরিষ্ঠ জেলাগুলি নিয়ে হবে পূর্ববঙ্গ, যা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে আর হিন্দু গরিষ্ঠ জেলাগুলি নিয়ে হবে পশ্চিমবঙ্গ, যা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। দেশভাগের সময় দেখা গেল খুলনা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও চলে গেল পূর্ববঙ্গে এবং মালদা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ মুসলিম গরিষ্ঠ হলেও পশ্চিমবঙ্গে থেকে গেল। আর মাত্র ৩ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেল পূর্ববঙ্গে। এভাবেই বাংলা ভাগ হল, ভাগ হল বাঙালির হৃদয়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যখন বাংলা ভাগ করতে চেয়েছিলেন, তখন সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। এটা এত বড়ো আন্দোলন ছিল যে, কার্জনের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশভাগ হল, অথচ প্রতিবাদে একটা মিছিল পর্যন্ত হল না। নিয়তির অমোঘ পরিণতির মতো দেশটা ভাগ হয়ে গেল।

বহু ভাষাভাষীর দেশ ভরতবর্ষ। অথচ এদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ধর্ম বলতে বোঝালো শুধু হিন্দু ও মুসলিম। দেশভাগের সময় সংখ্যায় কম হলেও দেশের বাকি ধর্মের মানুষকে শুধু অস্বীকারই করা হল না, তাদের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা হল। কিন্তু বাংলা ভাগ হল শুধু হিন্দু আর মুসলিমদের সংখ্যাধিক্যের বিচারে একথা পূর্বেই জানিয়েছি। দেশভাগজনিত এই মর্মান্তিক ঘটনা বাঙালী সংস্কৃতিগত ঐক্যের ওপর ভয়াবহ এক আঘাত হানল। প্রাথমিকভাবে গ্রাম জীবনে এর ছোঁয়া না লাগলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের ধর্মীয় প্ররোচনায় বাঙালির বহুকাল লালিত সংস্কৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিরাট এক অবিশ্বাসের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রইল বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। এর পূর্বাভাস দিয়েছেলেন বাংলার গভর্নরের সচিব জে.ডি টাইসন

১৯৪৭-এর ৫ জুলাই ইংল্যান্ডবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, ''মাউন্টব্যাটেন এক করিৎকর্মা ব্যক্তি, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ঝটপট ফয়সালা করার নীতি অনুসরণ করেছেন।...আমি বিশ্বাস করি এখন আমরা বেশ ভালো একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিতে পারব, তা আমরা চলে যাওয়ার পরে যে কোনও কিছুই ঘটুক না কেন। ...আমার মনে হয় আসন্ন দিনগুলোতে ভারতে একটা অতি অস্থিরতাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে...তবে বিবাদটা হবে মূলত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে, ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে নয়।''[১]

পাকিস্তান কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে নিজের দেশ বলে মনে করেনি। ঔপনিবেশিক শাসকের মতো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সে দেশকে করায়ত্ব করতে চেয়েছে, আর জনগণকে করতে চেয়েছে পদানত। পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি অন্তভূক্ত করতে চেয়েছে। এই সকল প্রচেষ্টা কখনো কোনো দেশ তার নিজের দেশের উপর করতে পারে না।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তখন লিয়াকত আলি খান। তিনি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ। ফলে তিনি ধর্মের চেয়ে অবাঙালির স্বার্থের দিকে বেশি নজর দিলেন। প্রথমেই তিনি বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য করায়ত্ব করতে চাইলেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান বাধা ছিল বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়। কারণ, প্রধানত তারাই ছিল বাংলার কুটির শিল্পের ধারক। ফলে লিয়াকত আলি প্রথমেই ধর্মের তাসটি খেললেন। এ কাজে তিনি মুসলিম লিগের স্থানীয় নেতাদের ব্যবহার করলেন। মূলত তাদের উস্কানিতেই বাংলার একশ্রেণির মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দুদের জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি পাবার লোভে উন্মত্তের মতো হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্বিচারে চলতে লাগল হিন্দু নিধন ও হিন্দু নারীর প্রতি অমানবিক অত্যাচার। এ কাজে যে পূর্ব পাকিস্তানের সকল মুসলমানদের সমর্থন ছিল তা নয়। কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে ধর্মকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই বাধা দেবার সাহস কারোর ছিল না। তার ওপর ছিল সরকারের প্রত্যক্ষ মদত।

আসলে লিয়াকত সাহেবের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য হল, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সংখ্যা কমিয়ে ফেলা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, এর পরের ধাপে বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা। এর পরবর্তী পদক্ষেপ থাকবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত। এটা তার পূর্ব প্রস্তুতি। কিন্তু বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হেনে তিনি যখন উর্দু ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করলেন, তখন চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে গেল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিমরা পাকিস্তানের মোহ থেকে মুক্ত হল। তারা বুঝতে পারল, পাকিস্তান তাদের নিজের দেশ হতে পারে না। ফলে বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে যে প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু হল তা ক্রমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হল। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল।

দেশভাগ ধর্মের ভিত্তিতে। সুতরাং এদেশের মুসলিমরা চলে যেতে লাগল পাকিস্তানে। তখন প্রচলিত 'হিন্দুস্থান' শব্দটা তাদের কাছে এক ধর্মীয় নিরাপত্তার অভাববোধ এনেছিল। তবুও দেশভাগ হবার পর এদেশে রয়ে গিয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি সংখ্যালঘু মুসলমান। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমাগত হিংসা দাঙ্গা তাদের পাকিস্তানে যাওয়াটা অবশ্যম্ভবী করে তুলল। তার ওপর হিন্দুস্থানে মুসলমান বাড়ির ছেলেরা কাজকর্ম পাবে না– এমন একটা ভাবনাও এর পেছনে কাজ করেছে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা বাড়ি-ঘর-জমি-জমা ফেলে দলে দলে ভারতে আসছে। তাদের ফেলে আসা ঘর-বাড়ি-জমি সব পড়ে রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী পদ, চাকরী শিল্প সবই ছিল হিন্দুদের দখলে। সেখানে গেলেই এসব পাওয়া যাবে, এই লোভে অনেক মুসলমান দেশত্যাগ করল। তবে এই ভাবনাটা যে অমূলক নয়, তার একটি বিবরণ পাই সেলিনা হোসেনর 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসটিতে। ''হিন্দু অধ্যাপকরা চলে যাওয়ার ফলেই বাংলা বিভাগে খালি হয়ে গেছে, সে জন্যই চট্ করে চাকরিটা হয়ে গেলো। নইলে ওকে স্কুলে মাস্টারি নিতে হতো।''[২] শুধু বাঙালী মুসলিমরাই এদেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেল, তাইই নয়, অনেকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকেও পূর্ব পাকিস্তানে গেলেন। কিন্তু সেখানে তারা হয়ে গেলেন বাঙালী মুসলিম। আজ তাদের মাতৃভাষা হয়ে গেছে বাংলা।

এ বাংলার মুসলিমরা একদিন দল বেধে চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। সেখানে তারা ঘর পেল, কাজ পেল, আর্থিক সমৃদ্ধি এলো। কিন্তু প্রাণ পড়ে রইল কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন সংসদ মইনুল হাসানের 'দেশভাগ আমরা-ওরা' নিবন্ধের একটি অংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি দেশছাড়া মুসলিমদের মনোজগৎকে বোঝার জন্য। ''সরকারি কর্মসূচীতে গেছি। শহিদস্থলে সম্মানজ্ঞাপন করতে হবে। ঢাকা থেকে ২৫/৩০ কিলোমিটার দূরে সভার সেখানেই স্মৃতিস্তম্ভ। ফুল চড়ানো শেষ। আমার পাশে একজন নিরাপত্তা রক্ষীকে এমনিই জিজ্ঞেস করলাম, ''ভাই, কেমন আছেন?'' তার হাতের একে ৪৭টি আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল, তড়িঘড়ি ঠিক করলেন। মাথার টুপিটা ঠিক করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনে বাঙালী'? এতক্ষণ আমাকে সে মাদ্রাজি বা বিহারি ভেবেছিল। একটু পরে ঢাকার বড় ইঞ্জিনিয়ার কর্তা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। 'আপ্নে বাঙালী'? 'হ্যাঁ'। এবার আলাপ পর্ব শুরু হল। বাড়ি কোথায়। পশ্চিমবাংলা। আরে, কোন থানা বলুন? মুর্শিদাবাদ। আরে ওটা তো জেলা। থানা বলুন। আমি এবার বললাম 'আপনি কোনটা চেনেন'? সব চিনি। এবার আর থানা নয়। গ্রামের নাম করলাম–কুমারপুর। এবার আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বললেন জহিরউদ্দিন সরকার কে হয়! আমার নানা। ভাবুন তখন আমার কি অবস্থা। তিনি বললেন, আমাদের বাড়ি দেবীপুর অঞ্চলের সিপাহির চক্। তখন আমি কলকাতায় পড়তাম। একদিন রাত্রে সবাই ঠিক করল 'এদেশে' আর থাকা যাবে না। চাক কে চাক রওনা দিলাম পাকিস্তান। পড়ে রইল মাটি জমি বাগান

গোয়ালঘর সাধের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী। আমার মা উঠোনের একমুঠ মাটি আঁচলে বেঁধে কাঁদতে কাঁদতে চোদ্দ পুরুষের ভিটা ছেড়ে রওনা দিলেন। প্রথম রাজশাহী তারপর আমরা এখন ঢাকাতে স্থিতু হয়েছি। বাড়ি গিয়ে আপনার নানাকে আমার কথা বলবেন। চিনতে পারবে। কারণ আমাদের আপনাদের বাড়ি যাতায়াত ছিল। আর কাঁটাবাড়ি ইউনিয়ন বোর্ডে আপনার নানা প্রধান ছিলেন আমার বাবা সদস্য ছিলেন। সব শুনতে শুনতে বুকটা কেঁপে উঠেছিল। তিনি সরকারি 'ডিউটি' তে আছেন। বেশি কথা হলনা। সব 'প্রটোকল' ভেঙে পরের সকালে তার বাড়িতে নাস্তা দাওয়াত দিলেন। আমার প্রথম এবং একমাত্র জিজ্ঞাসা 'কেমন আছেন'? স্ত্রীও আছেন। বললেন—ভালো, খুব ভালো। ছেলেমেয়ে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে। তারা বিদেশবাসী। ফিরবে কি না ফিরবে তারাই জানে। ঢাকার সম্ভ্রান্ত এলাকায় বাড়ি। বাংলো করেছেন। বাগান করেছেন। একাধিক কুকুর। বেশ দামি। খুবই রুচিসম্পন্ন এবং সম্ভ্রান্ত। হাসি ঠাট্টা খাওয়া দাওয়ার মধ্যে মধ্যে বলে ফেললেন, 'এখনও মনে হয় একছুটে চলে যাই দেবীপুর, মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে ফজরের আজান হলে।' আমি নির্বাক এত সমৃদ্ধির মধ্যেও এক মনখারাপ করা, বিবর্ণ সময় বয়ে যাচ্ছে। এক ধূসর প্রান্তরে সম্মুখীন। মা গত হয়েছেন অনেকদিন। কিন্তু মায়ের তুলে আনা জন্মভিটার মাটিটুকু যত্ন করে রেখে দিয়েছেন সুদৃশ্য কাচের বয়েমে। আবারও বললেন, 'এখানে না এলে হয়তো এমন ব্যবস্থা, সমৃদ্ধি হতো না। কিন্তু এতদিন বাদেও আমরা বিদেশিই রয়ে গেলাম।'[৩]

কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে যারা এদেশে চলে এল, তাদের স্মৃতিতে রইল শুদু দাঙ্গা, নরহত্যা, লুণ্ঠন, নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার আর বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম এবং এক মুহূর্তে বদলে যাওয়া চিরপরিচিত প্রতিবেশী। মোহনরাকেশের 'ধ্বংসস্তূপের অধিস্বর' গল্পে দেখা যায় আবাল্য বন্ধুই বন্ধুর বুকে ছুরি বসাচ্ছে। হাজা মহম্মদ আব্বাসের ভাষায়, ''সারা জীবনের বন্ধু সাথী এবং পাড়া প্রতিবেশী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।''[৪]

শুধু বড়োরা নয়। শঙ্খ ঘোষের 'সুপারিবনের সারি'-তে কিশোর হারুণ দেশভাগের সময় হিন্দু প্রতিবেশী বন্ধুকে বলেছিল, ''এয়া তো আর তোগো দ্যাশ নয় তোরা তো অ্যাহন অইন্য দেশের লোক।''[৫] কিন্তু মুসলমানদের এই রাতারাতি বদলের মূলে শুধু দেশভাগই দায়ী নয়। হিন্দু জমিদার চিককালই মুসলমানদের হীন নজরে দেখেছে। তাদের 'ম্লেচ্ছ' বলে অপমান করে এসেছে। দেশভাগ যেন তাদের সামনে তারই বদলা নেবার সুযোগ এনে দিয়েছে। মুসলমানরা সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের এখন শোনাতে পারছে, ''কর্তা, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে মনে রেখো, আমরা আর ছোটো নেই।''[৬]

কিন্তু বর্ণহিন্দু ও জমিদারদের এই অত্যাচারের ফল ভোগ করতে হচ্ছিল সাধারণ হিন্দুদের। কারণ এইসব জমিদাররাই পরিস্থিতি বুঝেছিল আগে। ফলে তারাই আগে দেশ ছেড়েছিল। প্রতিবেশীর সঙ্গে হৃদয়ের যোগও ছিল তাদের কম। কিন্তু সমস্যা হল সাধারণ

হিন্দুদের। তারা মাটির কাছের মানুষ। চির পরিচিত স্বদেশভূমি থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে তারা সহজে পারলো না। ফলে প্রকৃত অত্যাচার তারাই ভোগ করল। কোটি মানুষের নিদারুণ দেশত্যাগের অপমান আর বর্ণনাতীত দুঃখ, দাউদাউ করে পুড়ে যাওয়া ''কোটি কোটি মানুষের ক্ষেত-খামার আর বাড়িঘরের তপ্ত চিহ্ন, লক্ষ লক্ষ নরহত্যার তাণ্ডব, লক্ষ লক্ষ বলাৎকারের পাপ...।''[৭] এসবের স্মৃতি নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষগুলোর পক্ষে দেশের মায়া ত্যাগ করে চলে আসা সহজ ছিল না। চলে আসার আগে পিতৃপুরুষের ভিটেতে শেষ রাতটার স্মৃতি তাদের জীবনে জ্বলজ্বল করবে আমৃত্যু। কোন যন্ত্রণা তাদের কাছে বড়ো, দেশ ছাড়ার নাকি পালিয়ে প্রাণ রক্ষার, এটা ভাবতে ভাবতেই শেষ হয়ে গেল রাতটা। দেশের মাটিতে, জন্মভিটায় কাটানো শেষ রাত।

আর এক অভিজ্ঞতা হলো, শিয়ালদহ স্টেশনে শুধু বেঁচে থাকার জন্য পশুর মতো জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খোলা আকাশের নীচে বসবাস, খোলা জায়গায় মেয়েদের স্নান সেইসঙ্গে কলেরা-ডাইরিয়া মহামারির আকার নেয়। এরমধ্যে মরে গিয়ে বাঁচলেন অনেকে, যারা মরলেন না তারা রইলেন স্মৃতির দহন-যন্ত্রণা নিয়ে। হাসান আজিজুল হকের কথায়, ''যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হয়েছিল তার একটা কুফল আছে তো! যে সম্প্রদায়ের লোকেরা সাংঘাতিক নির্যাতিত হয়েছিল উৎখাত হয়েছিল, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—তারা সংখ্যালঘু হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়। এখানকার যে বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তারা affected-ই হলেন না।''[৮]

দাঙ্গা যখন থেমে গেল মানুষ এদেশে বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রাম পেরিয়ে একটু সুখের মুখ দেখল, তখন শুধু হল অন্য এক অনুভূতির লড়াই। যে মানুষ একদিন দেখেছিল চোখের সামনে লক্ষ মানুষের মৃত্যু, সন্তানহারা মায়ের যন্ত্রণা, মা-বোনের বলাৎকার-মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তারা কখনো সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেনি। স্বজন হারিয়ে কঠোর সংগ্রাম করে যে প্রজন্মকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছিল একদিন, সেই প্রজন্মের কাছে এই যন্ত্রণার কাহিনী যখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে তখন শুরু হয় আর এক সংকট। স্বদেশ হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করাতে না পারার যন্ত্রণা। এ সময় নিজেকে যেন বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রজন্ম অর্থাৎ তাদের সন্তান যে দেশভাগ বিষয়ে সম্পর্ণ উদাসীন তা কিন্তু নয়। মা-বাবার মুখে শুনে ছোটবেলা থেকে স্বদেশ সম্পর্কে একটা ধারণা, হয়তো কিছুটা মমত্বও জন্মেছে তাদের। বাবা-মা যে নদী-মাঠ-গাছগাছালির কথা বলত তা তারা চিনত না। অথচ শুনে শুনে মনে মনে একটা চিত্র তারা নির্মাণ করে নিতে পেরেছিল। দেশ ছেড়ে আসা মানুষের সঙ্গে তার পরের প্রজন্মের অনুভবের ফারাক কালগত কারণে, সভ্যতার অগ্রগতির কারণে আসতে পারে। কিন্তু আপন পরিবারে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ইতিহাস সে মনে মনে অনুভব করবে না, বোঝার চেষ্টা করবে না তার পরিজনে যন্ত্রণা, সে আপনজন হয় কি করে? এখানেই রয়েছে পরিবারের মধ্যে থেকেও একাকীত্বের সংকট।

আর তৃতীয় প্রজন্ম? যারা ভুক্তভোগী নয়, দেশভাগের যন্ত্রণা দেখেনি, শোনেনি, শুধু বই পড়ে দেশভাগের যে ধারণা তাদের জন্মেছে তাতে একটা ঐতিহাসিক জ্ঞানলাভ ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয়নি। দেশভাগ তাদের কাছে ইতিহাসের আর পাঁচটা ঘটনার মতো পাঠ্যবিষয় হয়ে উঠেছে। বিষয়টিকে এককথায় বলা যায়, প্রথম প্রজন্ম ভুক্তভোগী, দর্শক ও শ্রোতা। দ্বিতীয় প্রজন্ম ভুক্তভোগী নয়, দর্শকও নয়, শুধু শ্রোতা। আর তৃতীয় প্রজন্ম এই তিনটির কোনোটিই নয়, সে কেবল পাঠক। তারা ভাবতেই পারে না যে, তার নিজের পরিবারের এই একই ইতিহাস। বাংলাদেশ এখন তাদের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশ।

উপসংহার

যে ছিন্নমূল মানুষগুলি হাজার অত্যাচার সহ্য করে, কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশে পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, পরবর্তী প্রজন্মের এই ঔদাসীন্য যে যন্ত্রণা বহন করে আনে, তা দেশভাগের যন্ত্রণার থেকে কোনো অংশে কম নয়। তাই তাদের জীবনের ইতিহাসকে শুধু বিষয় হিসাবে নয়, সহানুভূতির সঙ্গে তাদের যন্ত্রণাকে অনুভব করতে হবে। বুঝতে হবে, তারা কেন জীবনের অধিকাংশ সময় এদেশে কাটানোর পরও বলে, ফরিদপুরের অমুকবাবু, বরিশালের অমুক দাদা ইত্যাদি। বুঝতে হবে কেন তারা এখনও বিবাহের চিঠিতে ব্যবহার করে তাদের পূর্ববঙ্গের গ্রামের নাম। এইটুকু বুঝলেই অনুভব করা যাবে, স্বদেশ ভূমি থেকে মানুষকে পরবাসে বসবাস করতে বাধ্য করানো যায় কিন্তু তার মন থেকে স্বদেশকে মুছে ফেলা যায় না।

গ্রন্থঋণঃ

১। সুনীতি কুমার ঘোষ, ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর', সাতচল্লিশের দেশভাগ ২০১৬, (সম্পা, বুদ্ধদেব ঘোষ ও দেবব্রত বিশ্বাস), ব্যঞ্জনবর্ণ, কলকাতা, পৃঃ ৪০

২। সেলিনা হোসেন, 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', সময় প্রকাশন, ঢাকা, অখণ্ড সংস্করণ, ২০০৩, পৃঃ ২৮

৩। মইনুল হাসান, 'দেশভাগঃ আমরা-ওরা', সাতচল্লিশের দেশভাগ, ২০১৬ (সম্পা, বুদ্ধদেব বসু ও দেবব্রত বিশ্বাস), ব্যঞ্জনবর্ণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪

৪। খাজাআহম্মদ আব্বাস, 'ভারতমাতার পাঁচ রূপ', কমলেশ সেন সম্পাদিত 'দাঙ্গাবিরোধী গল্প', রত্না প্রকাশনী, ১৯৯১, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪০

৫। শঙ্খ ঘোষ, 'সুপারিবনের সারি', করুণা প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০, কলকাতা- পৃঃ ৫৮

৬। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু', নবপত্র, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃঃ ১৫

৭। হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যের কথকতা, একুশে, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৫

৮। হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার, 'রাজনীতির দুষ্টচক্রে বঙ্গ বিভাজন', নিরন্তর, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃঃ ১৫

হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানে বাংলা ও বর্ধমান জেলা: (১৯১৫-১৯৪৭)

শচীন্দ্র ঘোষ*

সংক্ষিপ্তসার

এই মতামত অনেকেই ব্যক্ত করেন যে মুসলিম শাসনকালে মুসলমানদের অবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু আসলে এই তথ্য ভুল কারণ মুসলিম শাসন কালে কয়েকজন শাসক ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের কোন অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। শাসকশ্রেণী তাদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থাকে বজায় রেখে তাদের রাজস্ব আদায়ের লক্ষে অবিচল ছিল। ফলে যারা সুবিধা পেয়েছিল তারা হল অভিজাত মুসলিম ও ধনী হিন্দু শ্রেণীর মানুষ। ব্রিটিশ শাসন কালে এই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলিম তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন রকম বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধারণ মানুষ এক সাথে পথে নামেন। ফলে তাদের মধ্যে এক সহবস্থানের চিহ্ন ফুটে উঠে। এই সহবস্থান ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ঘটেছিল ঠিক তেমনি বাংলাদেশের একটি অঞ্চল বর্ধমান জেলাতেও ঘটেছিল। এই গবেষণা পত্রিকাতে কিভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিজীর আগমনের সময় থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত কিভাবে বিশেষ করে খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনে, ভারতছাড়া আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন ও বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন বর্ধমান জেলার বিভিন্ন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম উভয় একত্রিত হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রগুলি তাদের সহবস্থান ঘটাতে সাহায্য করেছে তা আলোচনা করা হবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেছিলেন - ''আমরা বহু শত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলো ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমরা এক ভাষায় কথা বলি, আমরা একই সুখ-দুঃখে মানুষ; তবুও প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এই পাপকে ঈশ্বর কোনো মতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।''[১]

ইংরেজ শাসকবর্গ খুব চতুরভাবে হিন্দু ও মুসলিম এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের বিভেদ নীতি ব্যাবহার করে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলিমরা যাতে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ

*গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিরোধী কোন সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারে। এবং তারা অনেকাংশে সফল হয়েছিল ইতিহাস তা প্রমাণ।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এক নতুন দিক উন্মোচিত হল গান্ধিজীর আবির্ভাবে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। ভারতবর্ষে তখন রাজনীতির জটিল পরিস্থিতি নরমপন্থীরা পরিচালনা করছেন জাতীয় কংগ্রেস এবং তাদের তেমন কোন কর্মসূচী ছিল না ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অন্যদিকে মুসলিম লীগ আলাদা অবস্থান করেছেন এইরূপ পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর আগমন ঘটে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আঙিনায়।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হতে লাগল তখন তার প্রভাব বর্ধমান জেলাতে পড়ল এবং এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে এই জাতীয় আন্দোলনকে ভর করেই বর্ধমান জেলার হিন্দু ও মুসলমানদের সমন্বয়ের ভাবধারা গড়ে উঠল। খিলাফৎ আন্দোলন ও পরবর্তী পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বর্ধমান জেলার সমস্ত মানুষ ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। ১৯১৯-২০ সালে বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের সভাপতি ছিল মহম্মদ ইয়াসিন ও সম্পাদক ছিল যাদবেন্দ্র পাঁজা এবং বর্ধমানের মহারাজা ও জমিদারি শ্রেণীর মানুষেরা এই অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধীতা করেন তাসত্ত্বেও বর্ধমান জেলার সমস্ত শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়। ১৯২০ সালে কলকাতায় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পাশ হয়। সেখানে বর্ধমান থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন যাদবেন্দ্র পাঁজা। বর্ধমান জেলার খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মহম্মদ ইয়াসীন। গ্রাম এলাকাগুলিতে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়ে মহম্মদ ইয়াসিন, মৌলবী আবুল হায়াত, শ্রীহর্ষ মুখার্জ্জী আদালত বর্জন করলেন।

মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ স্বরাজ পার্টি নামে একটি পৃথক দল তৈরী করেন কংগ্রেসের মধ্যে তারা অসহযোগ নীতির পরিবর্তনের পক্ষে ছিল। বর্ধমান জেলা আইন সভায় স্বরাজ পার্টির দুটি প্রার্থী ছিল যারা পরাজিত হয় অন্যদিকে কংগ্রেসের মহম্মদ ইয়াসীন জয়ী হন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ই মে মহাত্মা গান্ধী বর্ধমানে এলেন, ওনাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। দলে দলে সাধারণ লোক তাকে দর্শন করতে আসেন।

বর্ধমান ছাত্র-যুব আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হয়েছিল। এই ছাত্র যুব আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রথম ব্যানার্জী, গোলাম রহমান, বিনয় বসু, অম্বিকা, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বিপ্লবী রাজেন্দ্র লাহিড়ী শহীদ হলে ওনাকে স্মরণ করে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয় সেখানে সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ ইয়াসিন। বর্ধমান জেলার তরুণদের মধ্যে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠে। ওদের কাজ শুধু রাইফেল সংগ্রহ ও অর্থ লুণ্ঠন ছিল না, এরা গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এছাড়াও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখার জন্য উদ্যোগী হয়। এই সমস্ত তরুণরা দুর্ভিক্ষ ও বন্যা কবলিত এলাকায়

ত্রাণ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এখানে কোন ধর্মের প্রভেদ ছিল না, ফলে এই সমস্ত তরুণরা হিন্দু-মুসলমান সব মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিল।

বর্ধমান জেলায় যুব সম্মেলনের সূচনা হয় উদ্বোধন করেন মহারাজ উদয়চাঁদ। এই সম্মেলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন প্রণবেশ্বর সরকার, আমোদ বিহারী বসু দশরথীতা, ফকির রায়, আব্দুর সাত্তার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমান জেলায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কয়েকজন মুসলিম তরুণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। 'ইয়ং মেনন্স ক্রীশ্চান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কয়েকজন মুসলমান তরুণ এই সংস্থা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সেবামূলক কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিবিহীন, ব্যায়াম, পাঠাগার স্থাপন ও সমাজ সেবামূলক কার্যের জন্য এই সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেকোন সম্প্রদায়ের মানুষ এই সংস্থার সদস্য হতে পারতেন।

বর্ধমান জেলার হিন্দু-মুসলমান সমস্ত কৃষক সম্প্রদায় ধীরে ধীরে নিজের প্রয়োজনে একত্রিত হতে থাকল। বর্ধমান জেলার দামোদর ক্যানেল খনন করা হয় এবং প্রচুর কৃষিজমি নষ্ট হয় এই ক্যানেল খননে এবং এর জলকর ধার্য করা হয় এক একরে ৫.৫০ টাকা। এবং এর প্রতিবাদে জেলায় নানান স্থানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আবদুস সাত্তার 'রায়ত এ্যাসোসিয়েশন' তৈরী করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হাটগোবিন্দপুর নামক স্থানে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস এই সময় এই করের প্রতিবাদে চরম পন্থার বিরোধী ছিল। তারা অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। আর বামপন্থীরা চাইলেন চরমপন্থী আন্দোলন। এরফলে বামপন্থীরা শাহেদুল্লাহ সাহেব এর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সাবকমিটি হিসাবে এই ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকেন। হাটগোবিন্দপুর, কুড়মুন, ভাতার, প্রভৃতি অঞ্চলে ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়। এইখানে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আন্দোলনে সামিল হন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এর সভাপতিত্ব করেন মুজফফর আহমেদ। যদিও এই সম্মেলনের বিপক্ষে ছিলেন বিভিন্ন জমিদার গোষ্ঠী।

গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন সভা করা হয়, এই ক্যানেল করের বিরুদ্ধে। যাদবেন্দ্র পাঁজা এই আন্দোলনের বিরোধীতা করেন ফলে কংগ্রেস এর সঙ্গে বামপন্থীদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। স্বাধীনতা আন্দোলন সফল করতে হলে শুধুমাত্র শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষকে নিয়ে থাকলে হবে না এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে গ্রামের মানুষজনকে। আর গ্রামের মানুষকে যুক্ত করতে হলে তাদের সমস্যাগুলি প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের সামনে ব্রিটিশ শাসকদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। এই জন্যই গান্ধীজী গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বর্ধমান জেলায় এক্ষেত্রে বামপন্থীরা গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ বৃদ্ধিতে সক্রিয় হলো। যার ফলে বামপন্থীদের উদ্যোগে বর্ধমান জেলার হিন্দু-মুসলমান সাধারণ কৃষক শ্রেণী এক হতে শুরু করল।

অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদ ও আন্দোলনকে গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন ভাবনার সূচনা হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ কারাবরণ করেন। ১৯২০ সালের পরবর্তী সময়ে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বর্ধমান জেলার হিন্দু-মুসলমান আরো বেশি করে একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ''১৯৩০-এ সমগ্র বর্ধমান জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন পরিব্যপ্ত হয়। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে যাঁরা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের সাম্যবাদী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং শহীদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বানোয়ারি লাল ভালোটিয়া, কমিউনিস্ট কর্মী হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়; পরবর্তীকালের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোনার এবং সরোজ মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান শহরের ডাক্তার অরিণ গুপ্ত; ভামিনীরঞ্জন সেন; পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবী সৈয়দ শাহেদুল্লাহ; মহম্মদ ইয়াসিন, আবদুস সত্তার এবং দাশরথীতা।"[২]

সাম্প্রদায়িকতার বিষ সম্পর্কে বর্ধমান জেলার মানুষ সচেতন ছিলেন। এই কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ও পাঠশালা নির্মাণে দুটি সংগঠন গড়ে উঠে। এই সংগঠন দুটিকে পরিচালনার দায়িত্বে নেন অম্বিকা নাগ, অন্নদা চক্রবর্তী, গোলাম রহমান যিনি কচি মিঞা নামে পরিচিত ছিলেন, মহম্মদ ইয়াসীন, আশুতোষ চৌধুরী। কচি মিঞার যে সংগঠন গড়ে উঠে তারা সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে মন্মথ সেনের নেতৃত্বে যে সংগঠন গড়ে উঠে তা মূলত গান্ধীবাদী।

যেহেতু বর্ধমান জেলা কৃষি প্রধান এলাকা এবং এই জেলায় ধান উৎপাদনে বাংলা তথা ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ হিন্দু-মুসলিম এই কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল ফলত তাদের কাছে এই ক্যানেলকর উচ্চহারে করের ফলে তারা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় তাদের জীবনজীবিকার স্বার্থে সংঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত ক্যানেল করের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেন। সুভাষচন্দ্র যে বক্তব্য সেটি বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক ভাস্কর দাশগুপ্তের সংগ্রহেও সৈয়দ শাহেদুসাহ-এর বর্ধমান জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গে পুস্তকে প্রকাশিত উদ্ধৃতি সংকলিত। এই অংশ থেকে এককড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার গ্রন্থ বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির' প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন — ''বর্ধমান জেলার দামোদর ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকগণ অতিরিক্ত ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দোলনের সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। গত বৎসর আমি এই কর একর প্রতি দেড় টাকা ধার্য হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম

আমি জানিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি এক ক্যানেল কনফারেন্সেও শর্তমূলক ভাবে ক্যানেলকর একর প্রতি দেড় টাকা স্বীকার করিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং আরেক স্থির হইয়াছে যে, গর্ভণমেন্ট দেড় টাকার অধিক ধার্য রাখিলে তাহার বিরুদ্ধে আবার সংগ্রাম চালানো হইবে। আমি আশা করি গভর্ণমেন্ট উহা মানিয়া না নইলে এবং আন্দোলনের প্রয়োজন হইলে সকলে উহাতে যোগদান করিবেন।"[৩]

পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকার ক্যানেল কর আদায়ের জন্য জোর দেওয়া শুরু করে এবং ফৌজদারি মামলার মাধ্যমে তা আদায় করার কথা ঘোষণা করার পর বর্ধমান জেলার কংগ্রেস ও বামপন্থীরা একত্রিত হয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করেন কর না দেওয়ার জন্য। ফলে সরকার অত্যাচারের পথ বেছে নেয় যেমন ঘর ভাঙা, প্রহার ও গালিগালাজ করা এমনকি গরু, ছাগল, বাসনপত্র নিলামে বিক্রি করে অর্থ আদায় করে। বর্ধমানের মাহাচাঁদা, পারহাট, সজা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক সত্যাগ্রহী হিন্দু-মুসলমান উভয়েই গ্রেপ্তার হয়। অবশেষে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও মুসলীম লীগের প্রতিনিধি আবুল হাসেমকে নিয়ে বোঝাপড়া হয় এবং সরকার দমন নীতি ত্যাগ করবে এবং দুই টাকা নয় আনা হারে একর প্রতি কর নেবে এবং সরকার আবুল হাসেমের দাবী মেনে নেয়।

বর্ধমান জেলার ক্যানেল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক বিশাল রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষের বেশি মানুষ সরকারি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। পুলিশের থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার সবরকম পর্যায়ে সরকার গিয়েছিল। এরপর আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। যার আঁচ এসে পড়ে বর্ধমান জেলাতে। ১৭ই আগস্ট বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল আসতে শুরু করে এবং কোর্টের সামনে উপস্থিত হয়। পুলিশ মিছিলের উপর লাঠিচার্জ শুরু করে এবং অনেক নেতৃত্বকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর সারা জেলা জুড়ে এমনকি গ্রামাঞ্চলেও হরতাল পালন করা হয় নেতৃত্বদের মুক্তির দাবীতে। চারিদিকে সরকারি অফিস ভাঙচুর, ইলেকট্রিক তার কেটে দেওয়া হয়। টেলিফোন ও রেলের যোগাযোগ নষ্ট করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষই এই কর্মকান্ডে বেশি যুক্ত ছিল।

বর্ধমান জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির অসহযোগিতার ফলে ভারতছাড়ো আন্দোলন বর্ধমানে জেলায় সেরূপ শক্তিশালী প্রকাশ করতে পারেনি। কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব নাম্বুদ্রিপাদ তার গ্রন্থ 'স্বাধীনতা ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে বলেছেন — ''কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি গান্ধিজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। আর আমাদের মনে হয়েছিল ব্রিটেনসহ ফ্যাসি বিরোধী বিশ্বশক্তি মানবসভ্যতার জঘন্যতম শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। এই অবস্থার ঐক্যবদ্ধ ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রামে বাধা দিলে আমাদের নিজেদেরই মারাত্মক

ক্ষতি হবে। তবে এই সঠিক অবস্থান নিয়েও ভারতছাড়ো আন্দোলনের সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে 'ফ্যাসীবাদীদের সহচর' বলে চিহ্নিত করা আমাদের দিক থেকে গুরুতর ভুল হয়েছিল। ফলে সাময়িকভাবে আমরা ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম।"[৪]

তবে একথা সত্য যে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় এবং বর্ধমান জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ ভারছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসই অন্যরকম ভাবে রচিত হতো। এই বিরোধিতার ফলও বর্ধমান জেলার অন্যক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল। এই সময় থেকে বর্ধমানে মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটতে থাকে যা সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সেখানে এই আন্দোলন ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল।

১৯৪৩ সালে বর্ধমান জেলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। যার ফল হয়েছিল মারাত্মক। গ্রামে গ্রামে খাদ্যের জন্য হাহাকার দেখা যায়। ১৯৪২ সালে ভালো ফসল হয় নাই এবং ১৯৪৩ সালে সব ধান পোকায় নষ্ট করে দেয় এরূপ পরিস্থিতিতে ধামের দাম দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। যেখানে ধানের দাম ছিল দেড় মনে দু'টাকা নয় আনা সেখানে ২০ টাকা দেড় মনের ধানের দাম হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কালোবাজারিদের মজুত করার বিষয়টি। অন্যদিকে ইংরেজ সরকার উচ্চ দরে ধান কিনে নেয় তার সৈন্যবাহিনীর জন্য, ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ খাদ্যের জন্য ওলকচু ও শাক জাতীয় সমস্ত গাছকে ব্যবহার করে। দলে দলে মানুষ হিন্দু-মুসলমান সকলেই গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুঠে আসে একমুঠো ভাতের আশায়। এই সময় ধর্ম সম্প্রদায় ভুলে সাধারণ মানুষ একত্রে তাদের অবস্থান পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। জেলার বিভিন্ন মহকুমাগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য ফুড কমিটি গঠন করা হয়। বর্ধমান শহরে যে ফুড কমিটি গঠিত হয় তার সম্পাদক ছিলেন ভুডাঙ্গ সেন ও সদর মহকুমার সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ শাহেদুল্লা। কালনা মহকুমায় একটি খাদ্য সম্মেলনে আয়োজন করা সেখানে সমস্ত সাধারণ মানুষ হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়। কুসুমগ্রাম অঞ্চলে খাদ্য সম্মেলন করেন আবদুল হাসনাৎ, কাটোয়ার মুশা মিঞা মহাশয়ের উদ্যোগে একটি খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই ফুড কমিটি ও খাদ্য সম্মেলনের মাধ্যমে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যে খাদ্যের হাহাকার উঠেছিল তা মেটানো সম্ভব হয়নি। তবুও হিন্দু-মুসলিম প্রত্যেকের প্রচেষ্টায় এর কিছুটা সুরাহা হয়েছিল। এই পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছিল জীবনে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য কতটা প্রয়োজন, সেখানে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কোন ভেদ থাকে না।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রমাকান্ত চক্রবর্তী তার 'বর্ধমান জেলার স্বাধীনতা আন্দোলন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — ''বর্ধমান জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মতবিরোধ প্রবল হলেও, দক্ষিণপন্থার ও বামপন্থার বৈপরীত্য থাকলেও সমস্ত ব্যাপক আন্দোলনে এবং একটি

সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচনে, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য বর্ধমান জেলার সাম্প্রদায়িকতা কখনই প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি।"[৫]

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাংলায় একটি কৃষক আন্দোলন আগুনের মতো গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটি হল তেভাগা আন্দোলন। এবং এই তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ বর্ধমান জেলায় এসে পড়েছিল। এবং এই তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল বর্ধমান জেলার হিন্দু ও মুসলমান তাদের নিজেদের স্বার্থে। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন শুরু হলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে প্রায় ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছিল। ভাগচাষীরা দুই তৃতীয়াংশ ফসলের দাবীতে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল গ্রামের দরিদ্র ভাগচাষী ও প্রান্তিক চাষিরা। মূলত নেতৃত্ব দিয়েছিল এই আন্দোলনে কৃষক সমিতি তথা কমিউনিষ্টরা।

তেভাগা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর কিন্তু খাদ্য আন্দোলন। এবং এই খাদ্য সংকট সৃষ্টি করেছিল জমিদার মহাজন ও ইংরেজ সরকার। ... যখন খাদ্যের জন্য গ্রামে গ্রামে হাহাকার পড়ে গেছে তখন গুদামে হাজার হাজার বস্তা ধান মজুত থাকত। খাদ্য আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে তাদের প্রধান শত্রু জমিদার শ্রেণী। এবং এই জমিদারদের কাছ থেকে জমি না কেড়ে না নিলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। তার জন্য ইংরেজদের থেকেও বেশি ক্ষোভ ছিল জমিদারদের প্রতি। এই আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিল জমিদার ও জোতদার ও তাদের উচ্ছিষ্ট ভোগকারী কিছু ব্যক্তি, তাদের সংখ্যা ছিল নগন্য। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়ে এই কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করলেন। নিজ নিজ খামারে ধান তোল' — এই স্লোগানকে সামনে রেখে তারা আন্দোলনে এগিয়ে গেল। পুলিশের অত্যাচার যত বাড়তে লাগল ততই আন্দোলনের প্রভাব বাড়তে লাগল। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে স্লোগান গড়ে উঠল—

''লাঙল যার জমি তার - ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।
মিথ্যা কেসে বন্দি করা চলবে না - চলবে না।
ভাত চাই - রুটি চাই - খেয়ে পরে বাঁচতে চাই।
জোতদার-জমিদার-হুঁশিয়ার-হুঁশিয়ার।"[৬]

বর্ধমান জেলার তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সমঝোতা তৈরী হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল তাদের জীবন জীবিকার বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে মূলশত্রু হচ্ছে এই জোতদার, জমিদার ও তাদের সাহায্যকারী ইংরেজ শাসকবর্গ এই কারণে তারা ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে সাম্প্রদায়িকতা ভুলে একত্রিত হয়ে আন্দোলনে সামিল হয়।

তবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ও নিজেদের স্বার্থে বর্ধমান জেলায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেও সহবস্থান তৈরী হলেও বিভিন্ন কুচক্রি জটিল মানুষের সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছিল; ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ঘটেছিল ঠিক তেমনি বর্ধমান জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম হয়েছিল কিছু এলাকায় কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষের সহায়তায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলিকে আটকানো গিয়েছিল। যেখানে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে বর্ধমান জেলা এই সাম্প্রদায়িকতার বিষয়কে আটকাতে সফল হল। এক্ষেত্রে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বর্ধমান জেলার মণ্ডলগ্রাম অঞ্চলে হাটতলার এক মেলায় মুসলিম মিষ্টান্ন বিক্রেতার মিষ্টি বিক্রি নিয়ে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে এক দাঙ্গা বাধার উপক্রম দেখা যায় কিন্তু একালাকর কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তায় শাহেদুল্লা সাহেব, বিজয় ভট্টাচার্য, হেলারাস চট্টোপাধ্যায়, রশিদ সাহেব, হিন্দু-মহাসভার শ্রীকুমার মিত্র ও মুসলিম লীগের আবুল হাসেম, পুলিশের ইন্সপেক্টর ও ডি.এস.পি অমরবাবু ও বঙ্কিমবাবুর এদের প্রচেষ্টায় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাত থেকে নিস্তার পায়। এছাড়াও এইসময় বর্ধমান শহরে কালি প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। বর্ধমান ফৌজদারি কালীর জ্বলন্ত উদাহরণ। আলমগঞ্জ অঞ্চলে মহরমের তাজিয়া নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত ঘটনাগুলির সমস্য সমাধানে এগিয়ে এসেছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

এর পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রেহ। এবং ব্রিটিশ সরকার ক্লীমেন্ট এটলী ভারতীয় নেতৃত্বদের আলোচনার জন্য তিনজন মন্ত্রীকে পাঠালেন। মুসলিম লীগের বিরোধীতায় ক্যাবিনেট মিশনের কাছে কোন ঐক্যবদ্ধ দাবি পেশ করতে পারল না। অন্যদিকে ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণায় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস মেনে নিল না। কংগ্রেস সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদে যোগদানে সম্মতি প্রদান করে। ক্যাবিনেটের ঘোষণায় পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনায় লীগ আনন্দিত হয়। কংগ্রেস ওয়াভেলের সরকার গঠনে যোগদান না করায় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, যে কারণে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় যার পরিনামে এক সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার সূচনা হয়।

মহম্মদ আলি জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে সারা দিয়ে কলকাতায় সুরাবর্দীর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালিত হয় যার ফলে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রচুর মানুষ এতে মারা যায় এবং ঘর ছাড়া হয়। এর আঁচ এসে পড়ে বর্ধমান জেলায় মুসলিম লীগের কিছু নেতৃত্ব যেসব অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব এলাকায় মসজিদে মসজিদে গোপন মিটিং শুরু করে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তালিত, আলমপুর, হরিবাটি, আউস গ্রাম থানায় কয়রাপুর, ভোঁতা, এছাড়াও বড়দিখী, ক্ষেতিয়া কাশেমনগর, শেখপুর, বিজুর, মঙ্গলকোট ইত্যাদি এই সমস্ত অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই উত্তেজনা প্রশমনে এগিয়ে এলেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। যাদের প্রচেষ্টায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আটকানো সম্ভব হয়েছিল এই সমস্ত ব্যক্তিরা হলেন শাহেদুল্লাহ সাহেব, বিনয় বসু, আব্দুল সাত্তার, যাদব পাঁজা, বিজয় ভট্টাচার্য এরা জেলার বিভিন্ন এলাকা একযোগে ঘুরে

পরিস্থিতি শান্তি করার চেষ্টা করলেন। তবে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের গুজবও ছড়িয়ে পড়ে। যদিও দাঙ্গাবাজ সমাজ বিরোধী, ঘৃণ্য চক্রান্তকারী পশুগুলো বর্ধমান জেলার সংঘাত ঘটাতে সক্ষম হয়নি। কলকাতায় যেটা সম্ভব হয়েছিল সেটা বর্ধমান জেলার পল্লীগ্রামে সফল করতে পারেনি।

বর্ধমান জেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এখানে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বই প্রগতিশীল ও শান্তিকামী এবং মুসলিম লীগের যে সমস্ত উগ্রপন্থী নেতৃত্ব ছিল তাদের সংখ্যাটাও অতি ক্ষুদ্র এবং তাদের কোন প্রভাবও ছিল না ফলে জিন্না যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল, তা বর্ধমান জেলার কার্যকারী হয় নাই।

এই গবেষণাপত্রে তুলে ধরা হয়েছে বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারতছাড়ো আন্দোলকে কেন্দ্র করে কিভাবে হিন্দু-মুসলিম একত্রিত হচ্ছে। এবং তাদের নিজেদের স্বার্থে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হচ্ছে, অন্যদিকে যেখানে সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে আঘাত করছে সেখানে বর্ধমান জেলায় তা কিভাবে প্রশমিত করা হচ্ছে। মূলত এই গবেষণাপত্রে বিংশশতকে বিশেষ করে গান্ধিজীর আগমনের সময় থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বর্ধমান জেলার হিন্দু-মুসলমানদের সহাবস্থানের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. সৈয়দ, আব্দুল হালিম, ২০১৬, বাঙালি মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙালি জাতির বিকাশের ধারা (তৃতীয় খণ্ড), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ: ১৩।

২. কোঙার, গোপীকান্ত, সম্পাদনা, বর্ধমান সমগ্র, ২০১, চৌধুরী, রমাকান্ত, বধর্মমান জেলার স্বাধীনতা আন্দোলন, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পৃ: ৩৪০।

৩. চট্টোপাধ্যায়, এক কড়ি, ২০০০, বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড), র‍্যাডিকাল, কলকাতা, পৃ: ৪৪৯।

৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র, পৃ: ৪৫৭।

৫. চৌধুরী, রমাকান্ত, বর্ধমান চর্চা, বর্ধমান জেলার স্বাধীনতা আন্দোলন, অভিযান গোষ্ঠি, পৃ: ৫৬।

৬. কোঙার, গোপীকান্ত, সম্পাদনা, ২০০১, বর্ধমান সমগ্র, 'তেভাগা আন্দোলন' ঘোষ, শক্তিপদ, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পৃ: ৪৪৮

বিশ শতকের বাংলা আধুনিক গানে নজরুলের অবদান

মধুমিতা সরকার*

সারসংক্ষেপ:

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গানের চর্চা ও জনপ্রিয়তার কালে বাংলা সংগীত জগতে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্যদের প্রভাবের মাঝেই তিনি আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠেন। বিষয়গত, শৈলীগত ও সুরগত বৈচিত্র্যে ভরপুর তাঁর গান বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে যুগরুচি অনুযায়ী গড়ে ওঠে। তাঁর সৃষ্ট সংগীতে বাণীর পূর্ণ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পাশাপাশি সুর সৃষ্টি করে ইন্দ্রজীল। দেশী-বিদেশী শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতের মিশ্রণে গড়ে ওঠা নজরুলের গান সুরের ঝর্ণাধারা বইয়ে দেয়, যে ধারায় প্রতিষ্ঠা ঘটে বাংলা আধুনিক গানের।

মূল শব্দ: বিশ শতক, নজরুল, আধুনিকগান, শ্রম-বিজ্ঞান, সেতুবন্ধ, মুক্তিদাতা, সুরস্রাণ।

মূল আলোচনা:

শতাব্দী হলো নিরবিচ্ছিন্ন ও বিবর্তমান এমন এক সময় সমূহ যাকে কোনো সীমায় বদ্ধ করা যায় না। তাই কোনো এক শতাব্দীতে তার পূর্ববর্তী শতাব্দীর বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতসহ সম্যক দিক যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনি তার পরবর্তী শতাব্দীতে বয়ে যায় সেই শতাব্দীর নানা দিক, নানা ভাবনার সূত্র। যা উত্তরাধিকারী হিসাবে বহন করে সেই শতাব্দী এগিয়ে যায় পরবর্তী শতাব্দীর দিকে। এ-এক এমন চলমান প্রক্রিয়া যাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বিশ শতকের সংগীত নিয়ে আলোচনায় স্বভাবতই চলে আসে তার পূর্ববর্তী ঊনিশ শতকের সংগীতের প্রসঙ্গ যা তার পূর্ববর্তী বা তারও আগের অতিবাহিত হওয়া শতকের প্রভাব দ্বারা পুষ্ট হয়ে পরিণতি লাভ করেছে।

হিন্দু শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন 'প্রবন্ধ' সংগীত থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাগসংগীত নানা গ্রহণ বর্জনের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগে এসে মুসলিম সংগীত রসিকদের শাস্ত্রভাঙ্গা নিয়মভঙ্গা হস্তক্ষেপে হিন্দুস্থানী সংগীত হিসাবে ভাস্বর হয়ে ওঠে। বিবর্তনের ধারায় ধ্রুপদ খেয়াল বাংলায় অভিজাত সংগীতের জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এ সমস্ত সংগীতের স্বল্প কথা ও সুরের লীলায় বাঙালী ভেসে গেলেও তাঁর কবি স্বভাবী হৃদয় পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে না বাণীর অভাবের কারণে। যদিও টপ্পা - ঠুমরী অভিজাত

*সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, বাগাটি, মগরা।

সংগীতের জগতে প্রথম সারিতে স্থান পায় না (তবে টপ্পা অনেকটা এগিয়ে থাকে)। অপরদিকে বাংলা গানের নিজস্ব ধারা অশিষ্ট বাণীর আঘাতে ও রাগসংগীতের সুরের দাপটে প্রায় কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় বেশ কিছু সময় ধরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে বাংলা গানের অভিজাত রূপ প্রদানের প্রয়াসে অনেকেই এগিয়ে আসেন। তবে বাংলা অভিজাত সংগীতের পূর্ণ রূপ লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে, যদিও তাঁর আগে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর্বে নানা গুণীজনের বিভিন্ন প্রয়াস লক্ষিত হয়। যাই হোক বাণী ও সুরের হর গৌরী মিলনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানকে সমস্ত মলিনতার হাত থেকে রক্ষা করে এক পরিশীলিত রূপ ও কাঠানো দেন যে ধারায় অভিজাত বাংলা গান এগিয়ে চলে। তবে এ সংগীত বাঙালীর প্রাণের পাওনা মেটাতে সক্ষম হলেও মনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল না। সেই অভাব পূরণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬)। অকিঞ্চিৎ কথা ও বিস্ময়কর সুরে ভরা এবং সুরবিহারী খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরীর মূল ধারার পাশাপাশি রকমারী সুরের উত্তর ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন রূপ কাজরী, হোরী, লাউনি, কাওয়ালী, গজল, চৈতী ইত্যাদি সম্বলিত সংগীত ধারার উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকারী হলেন নজরুল। এ সমস্ত সংগীত ও মধ্যপ্রাচ্যের সংগীতের প্রভাবে বাংলা অভিজাত সংগীতের মূল ধারাকে তিনি যে পথে প্রসারিত করেন সেই পথে এগিয়ে এবং বিভিন্ন গ্রহণ-বর্জন বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বাংলা আধুনিক গানের ধারা পেয়েছে তার রূপ যার চরম পরিণতি স্বর্ণযুগের বাংলা গানে।

নজরুল সাহিত্যিক হিসাবে যতটা জনপ্রিয় তার থেকে অনেক বেশী জনপ্রিয় সংগীতকার হিসাবে। ফলে বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে চলে আসছে তাঁর গানের চর্চা ও উপভোগ্যতা। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদের গানের চর্চা ও প্রবল জনপ্রিয়তার মাঝেই নজরুল আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে এগিয়ে যান। তিনি নিজের অনেক গানে সুর দেননি। আবার ঐতিহ্যবাহিত এবং গতানুগতিক প্রচলিত বাংলা গানের নিজস্ব সম্পদ কীর্তন, ভাটিয়ালী, বাউল, ভক্তিসংগীত ইত্যাদি ধারায়ও তিনি অনেক গান, রচনা করেছেন। কিন্তু তবুও বাণীর বিশিষ্টতা ও ভাবমাধুর্য এবং সুরের মোহময়ী আবেশ তাঁর গানকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য এবং একই সঙ্গে আধুনিক বাংলা গানের পথকে করেছে প্রশস্ত।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের বাংলা সংগীত জগতের অন্যতম প্রধান পুরুষ হয়ে ওঠা নজরুলের সৃষ্টিশীল জীবন ১৯২০-৪২ খ্রী পর্যন্ত। মৌলিক সৃজনী প্রতিভা দ্বারা তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গানকে অনেকটাই নিজের অনুকূলে বদলে দিতে পেরেছিলেন এবং সৃষ্টি করেছিলেন নিজস্ব এক নতুন ধারা। তাঁর গান বৈচিত্র্যে ভরপুর–সুরগত ও বিষয়গত দিকে, আবার শৈলীগত বৈচিত্র্য বর্তমান। তাঁর গানের বাণী ও সুরে ছিল এমন উন্মাদনা, উষ্ণ আবেগ ও আবেশ যার জন্য তাঁর গান প্রচুর জনপ্রিয়তা

পায়। অনর্গল গান লেখার বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল তাঁর। গ্রামোফোন কোম্পানি ও রেডিওর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে যুগরুচি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য গান তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে অক্লান্ত ভাবে। নজরুল এদেশে প্রথম জীবিকার টানে পেশাদারী ভিত্তিতে সংগীত সৃষ্টি করলেও সৃষ্টির তাগিদ ও ব্যকুলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট গানের প্রকার বিবিধ–গজল, প্রেমসংগীত, বিরহের গান, দেশাত্মবোধক গান, বিদ্রোহের গান, কুচকাওয়াজের গান, কীর্তন, ইসলামী সংগীত, শ্যামাসংগীত, হাসির গান, উত্তর ভারতীয় ও বাংলার লোকসংগীতের আদলে গান, বিদেশী সুর ভঙ্গীর গান, রাগাশ্রয়ী বা রাগপ্রধান গান, শিশু সংগীত ইত্যাদি। তাঁর গানের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, কারো মতে চার হাজার , কারো মতে তিন হাজার, কারো মতে আড়াই হাজার, মতভেদ যাই থাকুক সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন যে, রীবন্দ্রনাথের থেকে তাঁর গানের সংখ্যা বেশী।

এক যুগসন্ধিক্ষণের সংগীতকারের মত পুরাতন ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং তার সঙ্গে নতুনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক নতুন ধারার সংগীতের পথপ্রদর্শক হিসাবে নজরুলের আবির্ভাব। বাংলা গানের ঐতিহ্য বাণী ও সুরের সমান প্রাধান্যে গান গড়ে তোলাকে সম্মান জানিয়েই তিনি গড়ে তুলেছেন নতুন এক স্বতন্ত্র ধারার গান। উত্তর ভারতীয় মুসলমানী দরবারী সংগীতের ঐতিহ্য, বিদেশী সংগীত বিশেষ করে আরব ইরানের গানের সুরের মাদকতা ও লোকায়ত সংগীতের সহজ সরল আবেগ-আবেদন মিশিয়ে সৃষ্ট নজরুলের গান আশ্চর্য সুরময় এক আবেশ তৈরী করে, যে গানে বাণীর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও সুর সৃষ্টি করে ইন্দ্রজাল। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সংগীতে শাস্ত্রানুগত্য কম। সুর খেলাবার স্বাধীনতা বেশী। এই শ্রেণীর গানে সুরের বিশুদ্ধি রক্ষার থেকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয় গানের ভাব। লীলা ও আবেশ ফুটিয়ে তোলার দিকে, যা গায়কের দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফলে এ সমস্ত গানে গাম্ভীর্য অপেক্ষা স্ফূর্তি বেশী এবং সুর শতধারায় বিকশিত হয়ে সম্মোহন সৃষ্টি করে। এই ধারায় নজরুল তাঁর গানের মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন বাংলা গানের জগতে। এক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যের অনুবর্তন যেমন করেছেন, তেমনি নতুনকেও সাদরে গ্রহণ করে উভয়ের সংযোগ রচনা করেছেন।

আধুনিক গান হলো এক বিশেষ প্রকৃতির বাংলা গান যে গানের সূচনা বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে। ১৯৩০ খ্রী থেকে 'বাংলা আধুনিক গান' অভিধা বেতারে চালু হয়। এ গানের বাণী সহজ সরল। বিষয় বাস্তবমুখী। আর শাস্ত্রীয় সংগীত, লোকসংগীত ও দেশী-বিদেশী আঞ্চলিক অভিজাত সংগীতের সুর- বাদ্যের মিশ্রণ এ সংগীতের আঙ্গিককে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কাব্যসম্পদ থেকে মুক্ত সুর রচনা ও সংযোজনার স্বাতন্ত্র্য আধুনিক গানের বিশেষ দাবি। এই ধারাপ্রাণ পেয়েছে নজরুলের হাতে। গীতি রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে সুরজগৎ কল্পনা, সুর সংযোজন ও প্রযোজনা রচয়িতার পক্ষে বিশেষ ধরণের কর্মদক্ষতা দাবি করে, যে দাবি অনুযায়ী নিজেকে চালিত করে নজরুল বাংলা আধুনিক গানের মুক্তি ঘটান। বাংলা গানের জগতে বাণীর মর্যাদা রক্ষা করেই সুরের সুরধুনী বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সুরের এই ধারায় সূচনা যদিও অতুলপ্রসাদে ঘটেছিল কিন্তু একে প্রতিষ্ঠা দেন নজরুল। আর এই প্রতিষ্ঠিত ধারাতেই পরবর্তী বাংলা আধুনিক গানের জগৎ শত ধারায় বিকশিত হয়েছে, পেয়েছে পরম পরিণতি। আধনিক গানের যুগে মানুষ শুধু গান শোনে না, গান গাওয়াটাও শোনে। তাই তো দেখা গেছে যে, আধুনিক গানের জগতে এমন অনেক গান জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছে যেগুলোর বাণী অংশ উল্লেখযোগ্য না হলেও অসাধারণ সুর আর অসাধারণ গায়কীর দ্বারা তা সমৃদ্ধ। এই সুর গড়ে উঠেছে দেশী-বিদেশী ও লৌকিক নানা গানের মিশেলে, যা নজরুলের দেখানো পথের অনুসরণ। দেশী-বিদেশী অভিজাত ও লৌকিক নানা সংগীত গ্রহণ, বিষয়গত নানা বৈচিত্র্য আনয়ন, সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি, বাণীর সরলতা ও রোমান্টিকতা, গায়কীর বিশেষত্ব ইত্যাদি নানা দিকের প্রয়োগ বাংলা গানে নজরুল বাংলা গানকে চতুর্দিকে পাড়ি-জুমাবার মতো মুক্তি দিয়েছেন, আধুনিক গানের পথ সৃষ্টি করেছেন।

বিশ শতকের ত্রিশের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গানের জগতে গীতিকার - সুরকার- গায়ক হতেন একই ব্যক্তি। অর্থাৎ যিনি গান লিখতেন তিনিই সুর দিতেন এবং নিজেই গান গাইতেন। বাণীর গভীরতা, আবেগময় সুরের বাঁধনী ও গায়কীর দরদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আধুনিক বাংলা গানে এসে শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। এ গান ভিন্ন গীতিকার সুরকার - গায়কের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠে। এই বিভাজন শুরু হয় নজরুল থেকে। তাঁর বেশ কিছু গানে অন্য সুরকার সুর দিয়েছেন – আব্বাসউদ্দীন, নিতাই ঘটক, কমল দাশগুপ্ত প্রমুখ। আর তাঁর গান গেয়েছেন গায়ক-গায়িকার যা প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নজরুলের গানের জনপ্রিয়তার পেছনে অবশ্য প্রচার মাধ্যমের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ১৯২৮ খ্রী. তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন স্থায়ী সুরকার, সংগীত পরিচালক ও মিউজিক ট্রেনার হিসাবে। ১৯৩১ সাল নাগাদ তিনি মঞ্চ ও সিনেমার জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে যুক্ত হন রেডিও'র সঙ্গে। প্রচার মাধ্যমে যোগ দেওয়ার ফলে প্রচার মাধ্যমগুলির জন্য তাঁকে প্রচুর গান লিখতে, সুর দিতে ও শিল্পীদের তা শিখিয়ে দিতে হতো। পেশাদার গীতস্রষ্টার ভূমিকায় তিনি গানকে নতুন এক শিল্পে পরিণত করেন আর তাঁর হাতেই গান হয়ে ওঠে আধুনিক অর্থে 'কনজিউমার গুড'। নানা শিল্পীর কণ্ঠের উপযোগী গান রচনা করে শিল্পীদের যেমন আকৃষ্ট করলেন এই শিল্পকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করতে, তেমনি গড়ে তুললেন অবিশ্বাস্য বিপুল এক শ্রোতৃমণ্ডলীকে। তাঁর গান আস্বাদন-উপভোগ করার কান তৈরী হয়, গানের কেনাবেচার চাহিদা জোগানোর বড় বাণিজ্যিক বাজার তৈরী হয়। গ্রামোফোন-রেডিওর প্রচার মাধ্যমে

যোগ দিয়ে জনরুচির চাহিদা অনুযায়ী সংগীত রচনার মধ্য দিয়ে নজরুল হয়ে ওঠেন বাংলা গানের প্রথম ও সার্থক প্রযোজক। 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থে দিলীপকুমার রায় নজরুলের গান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, কম্বোজিশন কাকে বলে তা-ই আমরা ঠিকমত এযাবৎ জানতাম না, সবে আভাস পেতে শুরু করেছি, অর্থাৎ নতুন যুগে সম্পূর্ণ নতুন চাহিদা অনুসারে নতুন সঙ্গীত ধারার আগমন ঘটে নজরুলের হাত দিয়ে, যে ধারার চূড়ান্ত পরিণতি স্বর্ণযুগের বাংলা আধুনিক গানে।

নজরুল পূর্ববর্তী আভিজাত্যে বাঁধা পড়া বাংলা গানের ধারাকে সাধারণ মানুষের রসতৃষ্ণা মেটাবার উপযোগী করে অগণিত শ্রোতার কাছাকাছি নিয়ে আসেন। গানকে সহজ-সুন্দর ভাবনা দিয়ে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন সার্থকতার সঙ্গে, হয়ে উঠেছিলেন সর্বসাধারণের সুরকার ও কবি। বাংলা গানকে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন বৃহত্তর জনসাধারণের মুক্ত অঙ্গনে। সনাতনী সাহিত্য ভাবুকদের সংস্কারজনিত যে ধারণা, বিশুদ্ধ নান্দনিক আবেগের উৎস থেকে স্বতঃস্ফূর্ত না জমালে কোনো সৃষ্টি সৃষ্টিই নয়—এ কথা নজরুলের ক্ষেত্রে বদলে যায়।[৩] কারণ জনরুচি অনুযায়ী তাঁর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রচিত গান এই মত ধারাকে পুষ্ট করে না। তাঁর গানের জোয়ারে ভেসে যায় শ্রোতৃসমাজ। নজরুল অকালে নীরব হওয়ার ফলে গানের জগতে নবযুগের সৃষ্টি ধারার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন-মূল্যসংযোজন হয়তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কিন্তু তবুও বাংলা গানের যে যাত্রাপথ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন সেই পথেই এগিয়েছে বাংলা গানের জগৎ, তার নবনির্মাণ ঘটেছে পুরাতনকে স্বীকৃতি দিয়েই আর এই নূতন পুরাতনের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন নজরুল।

তথ্যসূত্র:

১. বসু অরুণ কুমার, বাঙালির গান ঃ বিশ শতকের প্রথমার্ধ, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ. ২৭৮
২. শাকুর আবদুশ, সঙ্গীত সংবিৎ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ. ৪৬, ৪৭
৩. গুপ্ত ক্ষেত্র, যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৬

গ্রন্থঋণ:

১. ঘোষাল অনুপ, নজরুল গীতির রূপ ও রসানুভূতি, নাথ পাবলিশিং, ২০০৯
২. চৌধুরী নারায়ণ, কাজী নজরুলের গান, ও মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রা. লি., ১৯৯৭
৩. বসু স্বপন ও দত্ত হর্ষ সম্পাদিত, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ২০০০
৪. শাকুর আবদুশ, সঙ্গীত সংবিৎ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭
৫. পত্রিক, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৬

ছেঁড়াতার ও কৃষিজীবী মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

সুমন্ত মণ্ডল*

সারসংক্ষেপ:

বিশ শতকের চারের দশকে উত্তাল বাংলার নানা পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টিশীল সংবেদশীল মানুষের মননে গভীর প্রভাব ফেলে। যার ফলশ্রুতি বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরোটারী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হ্যোমিওপ্যাথী', আর তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' ইত্যাদি। সমসাময়িক জীবনভাবনা, মানুষের যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষ আকাল, শাসন, নিপীড়ন, তাঁদের নাটকে প্রকাশ পেল। সাধারণ মানুষ মেহতি শোষক, শ্রমিক তাঁদের নাটকে প্রধান চরিত্র হল এবং সংঘবদ্ধ জনতা নায়কের মর্যাদায় ভূষিত হল। একেবারে নতুন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকেই এদের উদ্ভব হল। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকে দেখি এর বিষয়বস্তুতে, ভাবনার বিস্তারে, সমাজ দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে, চরিত্রগুলির অনুধাবনে, তাদের জীবন যন্ত্রণার সংলাপে আচরণে, কৃষক সমাজের প্রতিবাদ। এই নাটকে লক্ষ্য করি কৃষিজীবী জনপদের লোকজীবন, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষিজীবী মানুষের সংঘবদ্ধতা আর মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে বিকশিত করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ। এই নাটকে এই বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ ও এই আলোচনায় উঠে এসেছে।

মূলশব্দঃ- কৃষক, আন্দোলন, রহিমুদ্দী, হাকিমুদ্দী, ধানের গোলা, প্রতিবাদ, বিশ্বযুদ্ধ, লোকজীবন, সংঘবদ্ধজনতা, মন্বন্তর।

বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর প্রভৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে নানা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়; দেশীয় ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে, শিল্পে ও সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় রেখে যায় তার অম্লান প্রভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগ বাঙালীকে নানাভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক টালমাটাল ঘটনার সর্পিলগতি বাঙালীর ভাবজীবন ও তার প্রত্যক্ষ জীবনে যে বাত্যবিক্ষোভের সৃষ্টি করে তারই কিছু মুদ্রণ ধরা পড়েছে তৎকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্যে।

নাট্য সাহিত্যের আবেদন জন-মানসিকতার সঙ্গে ওতো প্রোতভাবে জড়িতা পরিবর্তমান জীবন পরিবেশে তাই নাটক ও সতত পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তন-বিবর্তন ধর্মিতা বাংলা নাটকে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছে। নাট্যসাহিত্যের পরিবর্তনশীল স্রোত মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে দেশীয়

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানভূম মহাবিদ্যালয়।

ভূমিজ মানুষগুলিকে। তবে সেই পরিবর্তনশীলতায় অপজাত, অবজ্ঞাত শ্রমজীবী-কৃষিজীবী জনতা নাটকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল সেই দিন, যেদিন সূত্রপাত হল গণনাট্য আন্দোলনের।

গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, নাট্য সাহিত্যের মধ্যে তা প্রতিফলিত। যেমন অত্যাচারী শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের আয়োজন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। আবার প্রলেটারিয়েটদের সমস্যা ও অসুবিধা দুর করা, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক হওয়া এবং সেই সংগ্রামে তাদের বিজয় প্রদর্শন করা। দুঃখের সাথে সাথে জয়ের আনন্দ দিতে পারে।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী মানবতাবাদী ও একটি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী থাকায় তাঁর নাটকে গণনাট্যের প্রভাব পড়েছে। তাঁর রচিত 'ছেঁড়াতার' নাটকের কাহিনীর পটভূমিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ১৩৫০ র মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের একটি কৃষিজীবী জনপদের লোকজীবনকে তুলে ধরেছেন। এই নাটকে একদিকে যেমন অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষিজীবী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতা বা সমাজ সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে বিকশিত করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই কাজেরে জন্য নাটক ও নাট্যকারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

ছেঁড়াতার নাটকে তিনি একজন কৃষককে নাটকের নায়ক করেছেন। নায়ক চরিত্রের মধ্যে একদিকে রয়েছে প্রতিবাদী মানসিকতা, অন্যদিকে রয়েছে মূল্যবোধ। ন্যট্যকার তুলসী লাহিড়ী পড়াশোনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে, কৃষকদের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে এ নাটকে মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরের ভয়াবহতা যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম পরিণতি মন্বন্তরের দিনে চিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাত কৃষিজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদী ভূমিকাকেও তুলে ধরেছেন খুব সহজেই।

ছেঁড়াতার নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যেই আছে যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে সরকার প্রজার কাছে চাঁদা চাইছে এবং সে চাঁদা দেবার মতো সাধ্য এই অঞ্চলের লোকেদের নেই, জাপানকে ঠেকাবার জন্যই এই চাঁদা। কিন্তু সরকার যাদের কাছ থেকে এই চাঁদা চাইছে তাদের শোষিত ছবি ধরা পড়েছে একটি কৌতুক উপকরণের মাধ্যমে যেমন ''জাপানী সৈন্য এসে যদি পড়েই, অন্নশূন্য বস্ত্রশূন্য কদাকার নারী দেখে তারাই লজ্জা পেয়ে যাবে।''

এই নাটকের গোবিন্দ চরিত্রটির মধ্যদিয়ে প্রথম প্রকাশ পাচ্ছে রহিম ও হাকিমুদ্দীর বিরোধের সূত্রপাত। গোবিন্দের উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে সরকারের প্রতিনিধি হয়ে হাকিমুদ্দী রহিমুদ্দীর নামে চাঁদা বাবদ কুড়ি টাকা ধার্য করেছে যা রহিমের মতো কৃষকের ক্ষেত্রে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। এই নিয়েই হাকিমের সঙ্গে রহিমের বিবাদ শুরু হয়। রহিম তাই নিজে মনে করে অত্যাচারীর অত্যাচার সহ্য করলেই তার প্রতাপ আরো

প্রখর হয়। ফলে 'ছেঁড়াতার' নাটকে প্রতিরোধ এসেছে বঞ্চিত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে নয়, একক মানুষের মানবতা সম্পর্কে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকে। তুলসী লাহিড়ী এই নাটকে প্রথমে অত্যাচারী চরিত্রের উত্থান, তারই অত্যাচার নিপীড়নের ক্রমোচ্চ সাফল্য দেখিয়েছেন। পরে অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সমবেত শক্তির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া; পরিশেষে সেই চরিত্রের পতন ও পরাভব ফুটিয়ে তুলেছেন।

এরপর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে আকাল। শ্রীমন্ত চরিত্রের সংলাপ থেকে জানা যায় 'আকাল' এসে পড়েছে এবং আকালে আসল বাঘ শেয়ালের চেয়ে মানুষরূপী বাঘ-শেয়াল অধিকতর হিংস্র। অথাৎ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে হাকিমুদ্দীর মতো কুচক্রী, লোভী স্বার্থপর চরিত্রের মধ্যে। আকালের আভা, এবং যুদ্ধে চাঁদার পরিমাণ-এই নিয়েই দুটি সুস্পষ্ট দল বিভাগ দেখা দিল নাটকে। একদিকে তিনগোলা ধানের মালিক এবং ধ্বজাধারী হাকিমুদ্দি, অন্যদিকে সমবেত ভাবে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান মানুষের জীবন সমস্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে হাকিমুদ্দির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। এইভাবে যুদ্ধকে পটভূমিকায় রেখে নাটকের মূল বিরোধটি তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

রহিমুদ্দীর সখের ফুলবাগান নষ্ট করে হাকিমুদ্দীর গোরু। তাই রহিমুদ্দী হাকিমুদ্দীর গোরুকে খোঁয়াড়ে দিয়েছে। এটাই হাকিমুদ্দীর রহিমুদ্দীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধের সূচনা করেছে। এছাড়া রহিমের বাপ করিমুদ্দীর হাজীকে সরল সহজ পেয়ে হাকিমুদ্দী তাদের অধিকাংশ জমিই আত্মসাৎ করেছে। দুজনের মুখোমুখি বিরোধ আরও ঘণীভূত হয়েছে। গ্রামের অনেকেই হাকিমুদ্দীর নিন্দা করে শোল্লোক অথাৎ 'শ্লোক' বলে থাকে। এতে এক মূহূর্তেই কাহিনীর বিরোধটি পারিবারিক ও ব্যক্তিক স্তর থেকে উর্ধ্বে উঠে একটি সার্বিক ও নৈর্ব্যক্তিক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে—যার প্রতিক্রিয়া এই দৃশ্যেই হাকিমের বিরুদ্ধে কালী নাচনের সঙের গানে ধরা পড়েছে। এইভাবে নাট্যকার বিরোধটিকে দুইবিপরীত মাত্রায় প্রসারিত করেছেন।

হাকিমুদ্দীর কৌশল ও আক্রমণকে রহিম বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। হাকিমের প্রভাব এবং প্রতাপ দুই-ই বেশী, একে একে গ্রামের দরিদ্রদের সে গ্রাস করেছে। শ্রীমন্ত ও গোবিন্দকে রহিম এই বিপদের সময় এক হতে পরামর্শ দেয়—

''সব গরীব যদি একত্রে হয় মাইরপার পারবে?'' নানা সংলাপের মধ্যদিয়ে রহিমের সাহস, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও কৌশল প্রকাশিত হয়েছে। হাকিমুদ্দী ভয় পাচ্ছে রহিমের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ জনতা তার ধানের গোলা লুঠ করতে পারে। তাই হাকিমুদ্দী তিস্তা-ঘাটের চুরির মামলায় মিথ্যে ভাবে রহিমুদ্দীকে জড়িয়ে জেল বন্দী করতে চায়। কিন্তু তদন্ত চলাকালে রহিম প্রতারক হাকিমুদ্দীর গলা ছাড়া পায় এবং হাকিমুদ্দীর পরাজয় ঘটে।

এরপর হাকিমুদ্দী রহিমের নেতৃত্বকে ভয় পেতে শুরু করে। তাই দেখা যায়,

হাকিমুদ্দী শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। সহরুল্লা, সুঘারু, এই ভৃত্যদের মাধ্যমে সে আকালের পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারে। ফলে উত্তরবঙ্গের মূল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান এই নাটকের ঘটনার ক্রমকে প্রভাবিত করেছে। হাকিমুদ্দী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে খবর পায় ''চাইরো পাকা হাহাকার। এই যুদ্ধে দ্যাশটাকে খাইবে। কোঠে লড়াই কোঠে কি, ধাম ধুমীৎ হামরা মইনো।...ওতি ফির শহরে ফিসফাস শুনি আইনো জাপান যুদ্ধে নাইমেছে তাত্ সরকার পোড়ামাটি কইবার চায়।''

তাই হাকিমুদ্দীর ভয় দুটি-এক যুদ্ধের জন্য তার গোলার ধান যদি সরকার 'সিস' করে নেয়; দুই-রহিমের নেতৃত্ব যদি গ্রামবাসী তার গোলা লুঠ করে এবং ভৃত্যরাও যদি সেই লুণ্ঠনকর্মে যোগ দিয়ে ফেলে। সরকারের কাছ থেকে ধান লুকিয়ে রাখতে পারলেও হাকিমুদ্দী জানে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ধানসরিয়ে রাখতে পারবে না। ফলে সে এক কূট কৌশল অবলম্বন করেছে। কুদরত্কে দিয়ে গ্রামের তরুণদের সে উত্তপ্ত করবার চেষ্টা করেছে, যাতে তারা তার গোলা লুঠ করতে আসে। আর তখনই তাদের কাছে হাকিমুদ্দী প্রস্তাব করে ঃ সে ধান কর্জ দিতে রাজী, তবে দেড় সুদ দিতে হবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হাকিম বলে 'সরকার থাকি নিলে দিবে ১০ টাকা মন, ঘাতকওয়ালের কাছে ফেরত পাবো ২০ টাকা মন করা'

আর এর সাথে সাথে গ্রামবাসীদের প্রতি হাকিমুদ্দীর সমবেদনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং আসন্ন ইউনিয়ন বোর্ড (বর্তমানে তাকে বলে পঞ্চায়েত নিবার্চন) জেতা সহজ হবে। খুব হিসেব করে হাকিমুদ্দী এখানে পা ফেলেছে। তার শঠতা ও ধূর্ততার চরম দিক ক্রমেই প্রকাশিত হয়েছে।

''আকালের সময় মামুদ, তামিজ প্রভৃতি যুবকেরা সক্রিয় প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত হয়। মামুদ বলে- 'যদি যাওয়ার লাগে ৩ সারা মুল্লুকে আগুন জ্বালেয়া দিয়া যাবো...তামাম মুল্লুকে মানুষ জোটামো।।''

কিন্তু মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ রহিমের পরামর্শ ভিন্ন। সকলে সমবেত হয়ে ধনীর গোলা লুঠ করলে দু-একদিন চলতে পারে, তার বেশী নয়। কাজেই রহিমের পরামর্শ লুঠ করা নয়, সরকারের কাছে 'লঙ্গরখানা' খোলার আবেদন কর অথাৎ প্রতিবাদ ব্যক্তিগত মানুষকে করলে তা আংশিকভাবে সমস্যা সমাধানে পথ পাওয়া গেলেও তা স্থায়ী সমাধান কিছুই হবে না। তাই রহিমের যুক্তি স্থায়ী সমাধান করতে হলে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য। এছাড়া রহিমের মতে মানুষের মূল্যবোধ ও মানবিকতা নষ্ট করে প্রতিবাদ করা উচিত নয়। সরকারের কাছে প্রতিবাদের মাধ্যমে আবেদন করলে মানুষের সম্মান কিন্তু বিপন্ন হবে না। সরকার নিজেই যদি

'ঠ্যাকায়' পড়ে প্রজার কাছে যুদ্ধের জন্য চাঁদা চাইতে পারে, প্রজারও তবে আবেদন করার ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে তাই রহিমের মতে– ''যেইঠে ন্যায্য মত দাবী আছে সেইঠে দাবী করি লড়াই কইল্লেও মান থাকে''।

তবে গ্রামবাসী ও রহিমের এই প্রতিবাদ পরিকল্পনা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কাজে রূপায়িত হবার আগেই শহরে গিয়ে হাকিমুদ্দী কর্তা ব্যক্তিদের ত্যালায়ে নিজের আয়ত্বে লঙ্গরখানার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রহিমুদ্দীর ভাষায় ''ইহারাই দুনিয়ায় আগুন লাগেয়া দিল''-হাকিমুদ্দীর মতো স্বার্থপর লোভী মানুষেরা সেখানে লাভের সন্ধান পায়, সেখানেই মান সম্মান বির্সজন দিয়ে হাজির হয়। এখানে হাকিমুদ্দীর সহযোগী চরিত্র প্রেসিডেন্ট সাহেব। এই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সহযোগিতায় হাকিমুদ্দীর তার ক্রিয়াকলাপকে পূর্ণতা দিয়ে।

এই নাটকে হাকিমুদ্দীর অত্যাচারের একটি অদৃশ্য দিকও পাঠকে কাছে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। সেটা হল ফুলজানের নিকাকে কেন্দ্র করে ফুলজানের মনের মধ্যে ভণ্ড হাকিমুদ্দী হাদীসের বিধানকে দৃঢ় করে প্রবেশ করিয়েছে। হাকিম ও হাদীশ একীকৃত ও অভিন্ন হয়ে ফুলজানের মনের মধ্যে ভীতিপ্রদ সংস্কারের সৃষ্টি করে নিজের লোভের ঘড়া পূর্ণ করে নিজে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই অদৃশ্য অত্যাচারটি জনতাকে সমবেত করতে ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে সমর্থ হয়েছে। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী, স্বার্থপর, লোভী, ক্ষমতালিপ্সু, মূল্যবোধহীন চরিত্র হাকিমুদ্দীর উপর তাই গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে চড়াও হয়েছে। সার মামুদ বলে ছিল-গাঁও শুদ্ধ সব একজোট হচ্ছি না'। হাকিমুদ্দীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সার মামুদের আরও একটি বক্তব্যে-

এ গাঁও এ গাঁও সে গাঁও থাকি সব আসি গেল বলিয়া। গোবিন্দর খুলীৎ (অঙ্গনে) আসি সব জমায়েৎ হইবে।'

এই পরিস্থিতিতে কানা ফকির ও হাকিমের মধ্যে তর্ক বেঁধেছে। হাকিমুদ্দী নিজে বলেছে– ''হুঁ। হেঁদু মুছলমান সব একজোট হয়েছেন দেখি...'।

'কলবর করে পাড়াপড়শীর দল হাকিমুদ্দীকে টেনে নিয়ে এল'-সমবেত জনতার এই ক্রিয়াকলাপে হাকিম আর উত্তেজনায় অশান্ত নয়। সমবেত জনশক্তির কাছে পরাভূত ও প্রশান্ত এক চরিত্র। শ্রীমন্তর তখন উত্তেজনা দাবী– ''দ্যাওয়ানী হছিস-ভালয় ভালয় আইজ রহিমুদ্দীর সব ঠিকঠিক করি দাও নিজে দাঁড়েয়া থাকিয়া। না কইলে তোক জীয়ন্ত কবর দ্যাওয়া হইবে।''

এইভাবে নাট্যকার ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমস্ত কৃষিজীবী নিপীড়িত মানুষদের বেদনাময় কাহিনীকে একত্র করে তুলে ধরেছেন। এখানে ব্যক্তি রহিমের প্রতি গ্রামের মানুষের ভালোবাসা, অত্যাচারী হাকিমুদ্দীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আগুন জ্বালিয়েছে। রহিমের

আত্মহত্যায় হাকিমুদ্দী নীরব থেকেছে। এই নীরবতাই তার চরম পরাভব স্বীকার।

রহিমের জীবনে একদিকে যেমন অত্যাচারীর প্রতি বিদ্রোহের বা প্রতিবাদের আগুন নাট্যকার দেখিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে নৈতিক উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য আত্মাহতির মতো ঘটনা ও ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানেই রহিমের প্রতিবাদ ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের ক্ষেত্রে উপনীত হয়। রহিম দেখেছে হাকিমের মতো দুবৃর্ত্তের দল ক্রমেই সাফল্য ও বিজয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই ঈশ্বর যখন হাকিমুদ্দীর মতো শোষক শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপে নীরব থাকেন, তখন ঈশ্বরের চেতনা সম্পাদনের জন্য মরণের প্রয়োজন স্বীকার্য। এখানেই রহিম কথিত ঈশ্বরের পরীক্ষা। অত্যাচারী মানুষের মধ্যে শুভচেতনা জাগ্রত হোক-রহিমুদ্দী সেই আশায় জীবন ত্যাগ করে। তাই ছেঁড়াতার নাটকে কৃষিজীবী মানুষের প্রতিবাদ সমকালের হয়েও চিরকালের বিশ্বমুখী প্রতিবাদের প্রতিফলন ঘটিয়ে কৃষিজীবী মানুষের প্রতিবাদের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে।

গ্রন্থঋণ:

১. নবান্ন, ছেঁড়াতার, দেবীগর্জন ভূমিজ মানুষের বাঁচার লড়াই-অনিরুদ্ধ আকতার, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০০৬,
২. তুলসী লাহিড়ীঃ ছেঁড়াতার-ভূমিকাঃ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, ভারতী বুকস্টল, ২০০০,
৩. মন্বন্তর ও সাহিত্যঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচয় চৈত্র ১৩৫১,
৪. ছেঁড়াতার ঃ তুলসী লাহিড়ী-সম্পাদিত ড. সনাতন গোস্বামী
৫. নাটক ও নাট্যকার-অজিত কুমার ঘোষ, দেজ পাবলিশিং , ২০০০
৬. বাংলা নাটকের আধুনিকতা ও গণচেতনা : ড. দীপক চন্দ্র, দেজ
৭. গণনাট্য আন্দোলন - দর্শন চৌধুরী, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪

বাংলা উপন্যাসে তৃতীয় লিঙ্গের আত্মকথা

অমল মোদক*

মুখবন্ধ

মহাভারতের অর্জুন অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজনে তৃতীয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে অন্তরিত রেখেছিলেন (তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ)। অর্জুন অজ্ঞাতবাসের সময় স্ত্রী-প্রকৃতির নপুঃসক সেজে বিরাট রাজার অন্তঃপুরচারণী মেয়েদের নাচ শেখানোর কাজ নিয়েছিলেন। অর্জুন তৃতীয়া প্রকৃতি—স্ত্রী ভাবে ছিলেন, তাই অর্জুন বৃহন্নলা। প্রাচীন ভারত যাকে জেনেছিল নপুংসক লিঙ্গের, অর্জুন নপুংসক না ভেবে প্রকৃতি বলে উচ্চারণ করলেন। এই উচ্চারণে সেই নির্দিষ্ট এবং পৃথক সম্মানটুকু নিহিত আছে, যে সম্মান আছে একজন পুরুষের এবং একজন নারীর। শুধু পুরুষ বা নারীর মৌল উপাদান থেকে অন্যরকমভাবে পৃথক বলে নয়, পূর্ণসত্তা বলেই এরা তৃতীয়া প্রকৃতির মানুষ (the third gender)। মহাভারতের অম্বা শিখন্ডিনী স্ত্রীভাবিনী থেকে যে-ভাবে পুংভাবিত শিখন্ডী হলেন, সেটা তো রূপান্তরকামী বা transsexual-এর ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনা করেছে। ধুন্ধুমার যুদ্ধের সময় শিখন্ডীর সেই লব্ধপৌরুষ জেদের কাছেই মাথা নুইয়ে দিয়েছিলেন পিতামহ ভীষ্ম। এক মেয়ে স্ত্রীরূপ থেকে রূপান্তরিত পুরুষে পরিণত হওয়ার ঘটনা বা লিঙ্গান্তর (sex-exchange)-এর প্রত্নবিপ্লব তো বটেই।

তৃতীয় লিঙ্গ কথা

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই এই সমাজে পুরুষ প্রথম লিঙ্গ আর নারী দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিভাজনের পাশাপাশি আর এক ধরণের মানুষ আছেন এই সমাজে, যারা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অনুযায়ী তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এই চেনা-জানা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই চার রকম সত্তাকে একসঙ্গে করে নাম দেওয়া হয়েছে 'এল জি বি টি'। 'এল জি বি টি' এখন একটা কমিউনিটি হিসেবে গড়ে উঠেছে। পুরো নাম লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডার। 'লেসবিয়ান' ও 'গে' সমকামিদের প্রকারভেদ মাত্র। সমকামি বলতে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের এবং নারীর সঙ্গে নারীর যৌন সম্পর্ক বোঝায় (whose sexual preferences are for members of his her own sex). মনোবিজ্ঞানীদের মতে সমকামিতা যৌন পছন্দের একটি ধরণমাত্র। সমকামির মধ্যে যারা নারীর সঙ্গে নারীর যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ তারা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'লেসবিয়ান'

*সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীপৎ সিং কলেজ।

(lesbian) নামে পরিচিত, আর যারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তারা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'গে' (gay) রূপে পরিচিত। সমকামিদের আধুনিক টার্মিনোলজিতে বলা হচ্ছে 'এম এস এম', মানে, 'ম্যান সেক্স উইথ ম্যান'। সমকামি হলেই কথাবর্তার ধরণ-ধারণ, হাঁটাচলা এবং হাত-মুখের ভঙ্গি মেয়েলি হয়না, সমকামিদের মধ্যে যারা মনে মনে নিজেদের মেয়ে ভাবে, কিংবা মেয়ে হলে ভাল হত এমনটা ভাবে, তাদের কথাবার্তার ধরণই মেয়েলি হয়ে থাকে সাধারণত। সমকামিদের মধ্যে যারা মেয়েদের মতো পোশাক আর মেয়েদের মতো সাজসজ্জা করতে ভালবাসে, ওদের বলে ট্রান্সভেটটাইট। তারা ওখানেই সীমাবদ্ধ না থেকে অনেকে নারী হতে চায়। এদের বলে রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডার। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শারীরিক লিঙ্গচিহ্নের সঙ্গে যাদের অন্তর্নিহিত সত্তার বিরোধ দেখা দেয়, যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারা নিজেকে নারী বলে মনে করে থাকেন বা পুরুষ বলে মনে থাকেন (The word transgender refers to those people who identify differently from their biological sex)। এরা মনে মনে মেয়ে, তাই বাইরেও মেয়ে হতে চায় আর ছেলেদের সঙ্গ কামনা করে বা শারীরিকভাবে পুরুষ থেকে নারীতে পরিবর্তিত হতে চায় (a transsexual is a person who physically transitionas from male to female or vice versa)। এই রূপান্তরিতকরণের জন্য তারা কখনও শরীরে বিভিন্ন ধরণের হরমোনাল হোমোথেরাপি (hormonal theraphy) বা কখনও সেক্স রেজিগমেট সার্জারি (sex reasignmet surgery)-র আশ্রয় নিয়ে থাকেন। উভকামি বা বাইসেক্সুয়াল বলতে যারা নারী ও পুরুষ উভয়কেই যৌনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়। আর, উভলিঙ্গ বা হারমাফ্রোডাইট জন্মসূত্রে উভলিঙ্গ চিহ্নের ধারক অর্থাৎ এদের দেহে একই সঙ্গে পুরুষ এবং নারী উভয়েরই লিঙ্গ চিহ্ন বর্তমান থাকে। জন্মগত কারণে অনেকেই অপরিণত লিঙ্গের অধিকারী হন, আবার অনেকেই লিঙ্গ চিহ্নও হয়ে থাকেন। আমাদের সমাজে যারা 'হিজড়' (hiras)-এ হিসাবে পরিচিত তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই প্রকৃতিগতভাবে উভলিঙ্গ চিহ্নযুক্ত বা লিঙ্গচিহ্নহীন। প্রায় বেশীরভাগ মানুষই লিঙ্গকর্তন করে 'হিজড়'-এ রূপান্তরিত হয়েছেন। হিজড়েরা তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই লিঙ্গান্তরকামী।

সেন্সাস ও সংবিধান

২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী, ভারতে ৪.৫ লক্ষ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বসবাস করেন। এর মধ্যে ৬৬% তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন, এবং ৩৪%, আরবান এলাকায় বসবাস করেন। এদের সাক্ষরতার হার প্রায় ৪৬%, যেখানে জাতীয় সাক্ষরতার হার ৭৪% । এদের কর্মসংস্থানের হার প্রায় ৩৭%, যেখানে সাধারণ জনসংখ্যার হার ৪৬% । সারা ভারতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের বসবাসের চিত্রটি মোটামুটি এরকমঃ জনসংখ্যার অনুপাতে উত্তরপ্রদেশে ২৮%, অন্ধ্রপ্রদেশে ৯% , মহারাষ্ট্রে ৮%,

পশ্চিমবঙ্গে ৬%, মধ্যপ্রদেশে ৬%, তামিলনাড়ুতে ৪%, উড়িষ্যাতে ৪%, কর্ণাটকে ৪%, রাজস্থানে ৩%, এবং পাঞ্জাবে ২% । সুতরাং সংখ্যাটা নগণ্য নয়।

২০১৪ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় আইনে রূপান্তরকামী বা লিঙ্গান্তরকামী (হিজড়া)-দেরকে 'তৃতীয় লিঙ্গে'-র বলে ঘোষণা করেন। বিচারপতি কে এস রাধাকৃষ্ণন তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, রূপান্তরকামী বা লিঙ্গান্তরকামীদের যে ভয়-ভীতি ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে আমাদের ভদ্রসমাজ কদাচিৎ তা বোঝার চেষ্টা করে না। বিশেষত যারা শারীরিভাবে রূপান্তরিত বা লিঙ্গান্তরিত। রূপান্তরকামী বা লিঙ্গান্তরকামীদের সামাজিক স্বীকৃতি না থাকায় এরা এতদিন আইনি সুরক্ষা পায়নি। ফলে রাস্তা-ঘাটে, বাড়িতে, জেলখানাতে, এমনকি পুলিশের কাছেও তাদেরকে হয়রানি হতে হয়, যৌন নিগ্রহের স্বীকার হতে হয়। সংবিধানের ১৪ নং ধারায় সাম্যের অধিকার এবং আইনের সুরক্ষার কথা বলা হলেও রূপান্তরকামী বা লিঙ্গান্তরকামীকে সামাজিক স্বীকৃতি এতদিন দেওয়া হয়নি। বিচারপতি রাধাকৃষ্ণনের ঐতিহাসিক রায়ে রূপান্তরকামী বা লিঙ্গান্তরকামীদের ভবিষ্যত অনেকটাই সুরক্ষিত হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

১৯৬১ সাল থেকে এদেশে ব্রিটিশদের তৈরী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী সমকামিতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। গত কয়েক দশক ধরে সমকামিতার অধিকার নিয়ে সরব হয়েছে গোটা বিশ্ব। ভারতেরও এই অধিকারের দাবি জোরালো হতে শুরু করে। ২০০৯ সালে নাজ ফাউণ্ডেশনের আর্জিতেই দিল্লী হাইকোর্ট ৩৭৭ ধারাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সমকাতিাকে অপরাধ মুক্ত করেছিল কিন্তু, ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ দিল্লী হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করে দিয়ে ৩৭৭ ধারা ফিরিয়ে আনে। ফলে সমকামিতা এখনও আইনি অধিকার লাভ করতে পারেনি। যদিও লড়াই এখানেই থেমে থাকেনি, সময় লাগবে সে অধিকার অর্জন করতে।

দুই ।।

উপন্যাসের বয়ানে-১

সমকামকে আমাদের সমাজ ভালো চোখে দেখেনি, অনেক সময়ে সমকামিতাকে মনোরোগী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। তাদের কপালে শুধু জুটেছে অপমান, বিদ্রুপ ও টিপ্পুনি। যেমন দেখি, ২০১০ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সমকামী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছিল আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক সিরাজকে। ৭ এপ্রিল রহস্যজনকভাবে মারা যান সিরাজ। শুধু সিরাজ নয়, এরকম কতই না ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। বাংলা উপন্যাসে সমকামীদের সুখ-দুঃখ, তাদের বেঁচে-বর্তে থাকার লড়াই এবং তাদের সামাজিক স্বীকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার দাবি রাখে। বাংলা উপন্যাসে সমকামি (তৃতীয় লিঙ্গের)-দের জীপনযাপন এবং তাদের যন্ত্রণার কথা সম্ভবত প্রথম তুলে ধরেন নবনীতা দেবসেন তাঁর উপন্যাস

'বামাবোধিনী'তে। উপন্যাসটি লেখা হয় ১৯৯৬ সালে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। এই উপন্যাস রবি আর সঞ্জুর সমকাম সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যন্ত্রণার সম্পর্কে উপন্যাসিক রবির চিঠিতে লিখেছেনঃ 'এই সমাজে আমাদের মতো ছেলেরা বড় অসহায়। আমাদের কোনো প্রকৃত বন্ধু নেই। আমাদের পরিবার? থেকেও নেই। ...সত্য একবার প্রকাশ পেয়ে গেলে আর কোথাও পা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। থাকবে কেবল উপহাস, সন্দেহ, ঘৃণা.....।' সঞ্জয় আর রবির সম্পর্ক পুরুষ সমকামের অর্থাৎ 'গে'র, আবার সঞ্জয় তার জীবনের প্রথম পর্যায়ে মালিনীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল এবং তাদের এক কন্যা সন্তানও ছিল অর্থাৎ নারীর প্রতি আকর্ষণ ছিল, পরবর্তীতে সে উপলব্ধি করেছে রবির সাথে তার সম্পর্কের গভীরতাকে। কেউ যদি অন্য ধরণের যৌনতা অনুশীলন করে, তার মানেই তিনি কিন্তু মানসিক অসুস্থ নন। যদিও সমকাম প্রতিষ্ঠা করাই এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়, নিজের যৌন পরিচয়ের কারণে ভয়ে ভয়ে থাকা জীবনকে তুলে ধরাই এ উপন্যাসের লক্ষ্য। প্রসঙ্গক্রমে তাই এসেছে রবি ও সঞ্জুর ঘুমভাঙা যাপনের অভ্যেস আর যাপিত জীবনের কথা।

লিঙ্গান্তরকামী ও হিজড়েদের নিয়ে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন মানব চক্রবর্তী। তাঁর উপন্যাসের নাম 'সন্তাপ'। বিশ শতকীয় নগর জীবনের বাইরে অচেনা অজানা পল্লীর সরুগলিতে কিংবা আড়ালে আবডালে থাকা লিঙ্গান্তরকামীদের কাহিনী সন্তাপ। এই উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন কেমন ওদের সমাজ, কেমন করে ওদের বেঁচে থাকা, কেমন করে না-মানুষী থেকে মানবী হয়ে ওঠা—এই নিয়ে উপন্যাস। তিতলি বসতির না-মানুষী মানুষগুলি বেঁচে থাকে সভ্যমানুষদের তির্যক চাহনি, ঘৃণা আর উপেক্ষা নিয়ে। এই সভ্যসমাজে তাদের জন্ম, এই মানুষের সমাজে তারা লালিত-পালিত তবুও এই সমাজে তাদের অধিকার নেই। নেই—কারণ, জন্মগত এক খুঁত। জন্মগত এক খুঁতের কারণে জননীর কোল থেকে, পারিবারিক জীবন থেকে, এই স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রেম-ভালোবাসার জগৎ থেকে তারা চিরকালের জন্য নির্বাসিত। কেমন চেহারা এই সমাজের! তিতলি গাছের অস্থায়ী ঝুড়ির মতো এলোমেলো ওদের সমাজ, অনাত্মীয়, অভিশপ্ত, পিছুটানহীন একদল মানুষ—যারা না পুরুষ না নারী। শুধু তিতলি বস্তিতেই নয়, সর্বত্রই রয়েছেন ওরা, আমরা ওদের চিনি না, জানি না, 'সন্তাপ'-এর লেখক মানব চক্রবর্তী তা আমাদেরকে দেখিয়েছেন, চিনিয়ে দিয়েছেন তাদের সমাজকে। 'সন্তাপ' শুধু অজানা বৃহন্নলা সম্প্রদায়ের নিজস্ব আচার-আচরণ, আনন্দ-যন্ত্রণার তীব্র কৌতুককর এক কাহিনিমাত্র নয়, শেষাবধি তা হয়ে উঠেছে মানুষেরই এক হৃদয়স্পর্শী আলেখ্য।

তিন।।

উপন্যাসের বয়ানে-২

রূপান্তরকামী বা লিঙ্গান্তরকামীদের জীবন সংগ্রামের এক দুঃসাহসিক উপন্যাস 'হলদে

গোলাপ'। এ উপন্যাসের কাহিনি বয়ানে তিনি তুলে এনেছেন 'সমাজের শরীর কিংবা শরীরের সমাজতত্ত্ব'। স্বপ্নময় চক্রবর্তী অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইতিহাস খুঁড়ে এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জিনেটিকস, এমনকি মিথপুরাণকে। এক নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি লিঙ্গ পরিবর্তনকামীদের সমস্যা মোটা দাগে রাঙিয়ে তুলেছেন। তৃতীয় লিঙ্গকে এতটা সহজে স্বীকৃতি দেয়নি এই সমাজ। সাদা-কালো, ভাল-খারাপ জাতীয় আর এক নারী-পুরুষ দ্বৈততায় বাঁধা পড়া সমাজ। এই উপন্যাসের যাত্রা এক থেকে একাধিক লিঙ্গ পরিবর্তনকামী গোষ্ঠীর দিকে। পৃথক পৃথক কথনে ক্রমশই সমাজের নানা অঞ্চল থেকে অন্ধকারের ওপর আলো ফেলার সদর্থক প্রচেষ্টায় উপন্যাসের অবারিত গতি। এই রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলয়ের মনোভাবাপন্ন সত্যানুসন্ধানী অনিকেত প্রশ্ন তোলে লিঙ্গ পরিবর্তনকামীদের সমস্যার নিয়ে। তথ্য ও তত্ত্বে তৈরী হয় একটি খোঁজ। একটি সন্ধানও।

উপন্যাসের আখ্যান শুরু ১৯৯৫ সালে। মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে তখন দুরদর্শন আসেনি, দীন অবস্থা আকাশবাণীর, গ্রামে-গঞ্জে তখনও শতকরা ৯৫% শতাংশ শ্রোতা আকাশবাণীর। আকাশবাণীতে কিশোর-কিশোরীরা গোপন সমস্যা নিয়ে চিঠি লেখে, পরামর্শ চায়। এই উপন্যাসের নায়ক অনিকেত আকাশবাণীরে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ের প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। তার চোখ দিয়ে ঔপন্যাসিক জীবজগতের বিবর্তন, কোষ, ক্রোমোজম, জিন, প্রজনন প্রক্রিয়ার বিবর্তন, মানবদেহ ও প্রজনন অঙ্গ, ডিম্বানু, শুক্র, বীর্য, ঋতু ইত্যাদি নিয়ে কতই প্রোগ্রাম করে; স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক যৌনতা, যৌনতা সম্পর্কিত কুসংস্কার, গর্ভপাত ও এর কুফল, যৌন স্বাস্থ্যবিধি, সম-লিঙ্গে সংযোগ (হোমো-সেক্সুয়ালিটি), বিপরীত লিঙ্গে সংযোগ (হেটেরো-সেক্সুয়ালিটি) ইত্যাদি নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মতামত জানায়। অনিকেত বলেছিল মানুষের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন-এর মধ্যে সমকামিতা হল একটা কালার, পিডোফিলরা তো সমকামিদের একটা স্তর, পিডোপিলরা শিশুদের সঙ্গে যৌনতা চায়। অনিকেত সমকামিদের পয়েন্ট অব্ ভিউ থেকে তুলে ধরতে চান সমাকামীদের বিসর্পিল যাপনচিত্রকে। সমকামীর খোঁজে অনিকেত কখনও শিয়ালদা ষ্টেশন, কখনও বাঘা যতীন কখনও বা মিডলটন রো-তে হাজির হয়। সেখানে অনিকেতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সমকামি রঞ্জন, অনির্বাণ, সঞ্জয় ও পবনদের। এরা সকলেই 'গে'। এরা উচ্চবিত্ত শ্রেণির, এরা গর্ববোধ করে বলেঃ 'উই ডোন্ট হেজিটেট টু ডিক্লেয়ার দ্যাট উই আর গে। বাট নট দ্যাট—উই আর প্রাউড অফ বিয়িং গে।' এরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। এরা অভিজাত, এরা ইংরেজী বলতে পারে, কেউ কেউ ভাল চাকরি করে, চাউ-পিৎজা-বার্গার আইসক্রিম খায়। ওরা 'গে'-দের অধিকার নিয়ে ভাবে, সামাজিক অপমানের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ারনেস তৈরী করে, এডস্ সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে।

এই উপন্যাস আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চার রকম সত্তার সমকামিদের

চিত্র উপস্থিত করেছেন। যেমন—এক, অনিকেতের বান্ধবী মঞ্জুর ছেলে পরিমল—পরি, সে ট্রান্সভেসটাইট। মেয়েদের মতো পোশাক আর সাজসজ্জা করে সে, ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে, ঠোঁটে লিপিস্টক লাগায়। পরি বলে, 'আমার গায়ে 'গে' স্ট্যাম্প লেগে থাকুক—এটা ভাল্লাগে না। আমি 'গে' না, আমি মেয়ে। বাইরের খোলসটা ছেলের'। পরি খোলস পাল্টাবে। তার মানে, কেটে ফেলে দিতে চায় সে ওর পুরুষ চিহ্ন। দুই, আবার জন্মসুত্রে বা শারীরিকভাবে পুরুষ, কিন্তু মনে মনে নারী, পুরুষসত্তা পছন্দ করে না, ভাবে মেয়ে হতে পারলে মানসিক তৃপ্তি পায়—যেমন দুলাল। দুলাল আসলে নারীই ছিল। XX ক্রোমোজম সম্পন্ন। বহিরঙ্গে পুরুষ, ভিতরে ভিতরে নারী। মনোবিজ্ঞানী কিন্সের তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের সবার মধ্যে অল্প-বিস্তর 'গে' ভাব আছে, কিন্সের স্কেলে যারা 'শূন্যে' থাকে, তারা পরিপূর্ণ বিষমকামী (হেটেরোসেক্স) মানে একেবারে সমকামী নয়, কিন্সের স্কেলে এক, দেড়, দুইয়ে অনেকেই থাকে। তিন হলে উভকামী, ছয় হলে পরিপূর্ণ সমকামী। কিনস্-এর স্কেলে দুলালকে 'পাঁচ'-এ ফেলা যায়, সে সমকামীই তবে একটু-একটু বিষমকামী। পরিবারের চাপে দুলাল বিয়ে করে বউ ঘরে আনে, সন্তানও হয় তার। একদিন দুলাল পালিয়ে গিয়ে ছিন্নি বা ক্যাস্ট্রেশন করে 'হিজড়'-এ দলে ভিড়ে গিয়ে দুলালী নাম নেয়। এই দলে আছে তারই মতো চাত্তারা, ময়ূরী, ময়না, হাসি, ফুলি, ছবি, ঝুমকী, ঝরণা, সফি। এরা সবাই 'কোতি' অর্থাৎ মেয়েদের হাবভাব সম্পন্ন ব্যাটাচ্ছেলে। তিন, জন্মসূত্রে স্ত্রী লিঙ্গ চিহ্নে তৃপ্তি মেয়ে। সে ওই লিঙ্গ চিহ্নে সন্তুষ্ট নয়, তৃপ্তি একটা পেনিস চায়, স্পর্শসুখ চায়, নিজেকে পুরুষ ভেবে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তৃপ্তির নিজের কথায়ঃ 'আমার তো নুনু ছিল না, চেরা ছিল, কে জানত ওটা ব্লাউড, কে জানত ওটা ফলস, কে জানত ওটা ধোকা? সবাই জানত আমি মেয়ে। আমিও। ...আমি তো মেয়েই ছিলাম। তাই তো জানতাম। খুঁতো মেয়ে, মাসিক না হওয়া মেয়ে। জানতাম বিয়ে হবে না, বর জুটবে না...।' কিন্তু তৃপ্তির পেটের ভিতরে ঘুমিয়ে ছিল অন্ডকোষ। প্রস্টেট। কিন্তু বাইরের হরমোনে জেগে উঠেছে ও দুটো। বিষ ছড়িয়েছে তার রক্তে। তার মধ্যে জেগে উঠে ছেলেত্ব। আর চার, আইভি—আইভি মেয়ে, মেনস হয়, পুরুষ নয়, তবে তার একটা ছেলেত্ব আছে। একটা পেনিস-বাসনাও আছে ওর। তবে ও ট্রান্সজেন্ডার হয়তো নয়, ক্রসড্রেসার বা ট্রান্সভেসটাইট—অর্থাৎ বিপরীত সাজসজ্জাকামী, এবং 'টপ' লেসবিয়ান বা অ্যাকটিভ লেসবিয়ান। সে থাকে একজন মেয়ে কনস্টেবলের সঙ্গে। মেয়েটি আবার তার স্বামীর অত্যাচারেই স্বামী ছেড়ে আইভির সঙ্গে শোয়, অর্থাৎ মেয়েটি লেসবিয়ান প্রকৃতির।

সমাজে এলজিবিটিরা প্রান্তিক, এবং সংখ্যালঘু, নির্যাতিতা ও উপেক্ষিত। তথাকথিত এলজিবিটিদের দুটি বর্গ—উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গ। রঞ্জন পবন ধবল মানবী আইভিরা উচ্চবর্গ। এদের জন্য এনজিও, সিনেমা, সংবিধান সংশোধন; আর নিম্নবর্গে হিজড়া, গুরুমা, লন্ডা, ঘাটু। উচ্চবর্গে এস আর এস (সেক্স রি-অ্যাসাইমেন্ট সার্জারী) আর নিম্নবর্গে ছিন্নি (ক্যাসট্রেশন) বা নির্বাণ। এরা খালাসি ড্রাইভার হতে চায়, 'খাবার সোডা বেকিং পাউডার

হতে চায়। মামলেট চায় ওমলেট হতে।' ব্যবসা করে সামান্য পয়সা হাতে পাওয়া বাগদি-বাউড়ি ঘরের পুজো-আচ্চায় দেহুরির বদলে, বামুন। আর ওরা! ভদ্রলোক—'ভদ্রলোক খই আর পয়সা ছিটিয়ে শবযাত্রা।'

কেমন এদের সমাজ! এদের সমাজ গোষ্ঠীবদ্ধ—আট-নয় জনের। গোষ্ঠীবদ্ধ হেজড়েরা যেখানে বসবাস করে সেটা ওদের ভাষায় বলে 'খোল'। এক একটা খোল এক একটা হিজড়ে সমাজ। খোলের দায়িত্বে যিনি থাকেন তিনিই গুরুমা। যে এক নম্বরের চ্যালা হবে, তার হাতেই খোলের দায়িত্ব। যে যে-খোলে কাজ করে, সেই খোলের নিয়ম-কানুন তাকে মেনে চলতে হয়। হিজড়েরা বাঁধাই খেটে যা রোজগার করে তার অর্ধেকই দিতে হয় গুরুমাকে। গুরুমার বয়স হয়ে গেলে বা রোগ ধরে গেলে তার প্রধান শিষ্যকে দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, এর পর নতুন হিজড়েরা প্রধান গুরুমাকে 'দিদিমা' বলে ডাকে, আর প্রধান শিষ্য বা শিষ্যা হয়ে যান 'গুরুমা'। অনেক সময় দেখা গেছে গুরুমা মরে যাবার আগে তার প্রধান চেলিকে সম্পত্তি উইল করে গিয়েছেন। গুরুমা যদি হঠাৎ মারা যান, গুরুমা হবার জন্য শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া-ঝামেলা হয়, অনেক সময় 'সংঘ' ভেঙে যায়। হিজড়ে বাড়িতে তিন ধরণের শিষ্য দেখা যায়—একজন প্রধান শিষ্য, কয়েকজন সাধারণ শিষ্য। এরা পরস্পরের গুরু-বোন। এছাড়া ঠিকে-হিজড়ে বা জন-হিজড়েও কিছু থাকে। জন-হিজড়েরা হিজড়ে খোলের সবচেয়ে কম আদৃত মানুষ। ওরা বাড়ির কাজ করে, বড় পরিবারে রান্নাবান্নার কাজ করে। কিন্তু জন-হিজড়েরা কোন নির্দিষ্ট খোলে বেশীদিন থাকে না, না-পোষালে অন্য খোলে চলে যায়। তবে অনেক সময় কোন হোটেলে বা চায়ের দোকানে এদের কাজ করতে দেখা যায়। সেখানে প্রচুর গঞ্জনা এবং খদ্দেরদের টিপ্পুনি শুনতে হয় বলে হিজড়ে খোলে কাজ করাই বেশী পছন্দ করে। জন হিজড়েরা কথাবার্তায় একটু দুর্বল, বাঁধাই খাটতে গেলে যেসব ছল-চাতুড়ি করতে হয়, সেটা তারা ভাল পারে না। এদের দেখতেও ভাল হয় না, হিজড়ে সমাজে এরা একটু শোষিত।

স্বপ্নময় ইতিহাস খুঁড়ে তুলে নিয়ে আনেন হিজড়েদের বহুচেরা দেবীপূজার কথা, তাদের সংস্কার ও লোকবিশ্বাসকে। বলরামবাটিতে হিজড়েদের একটা মেলা হয়—এই মেলায় হিজড়ে সমাগমের কারণ হিসাবে জনশ্রুতি। এক পিরসাহেব আরবের বোখারা থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে শেষে বসুবাটিতে এসে বসবাস করতে থাকেন। তিনি বহু অস্পৃশ্য চন্ডালকে কোলে স্থান দিয়েছিলেন।...অনেকে অস্পৃশ্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনেক হিজড়াও তাঁকে মুর্শেদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। বহুচেরাদেবীর মূর্তি পোড়ামাটির, মোরগবাহনা। কলকাতার কোন অঞ্চলে প্রাচীনকালেও ছিল বৃহন্নলাদের ডেরা? সুরাটেও ছিল ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি, সুরাটের কাছাকাছি কোথাও আছে ওই দেবীর মন্দির। ওই মন্দির ঘিরে গড়ে উঠেছে বৃহন্নলাদের ডেরা। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা তখন থেকে কিছু বৃহন্নলাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। সেই থেকে পূজিতা হচ্ছেন

বহুচেরা দেবী। লোকপুরাণে পুরুষ নারী হতে চেয়েছে বারবার। নারীকেই ভাবা হয়েছে সৃষ্টির প্রতীক। নারীই তো জন্ম দেয় , সৃষ্টি বেঁচে থাকে। আফ্রিকার কোনও কোনও উপজাতি এখনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে নারী সেজে নাচে। লিঙ্গস্থানে লাল কাপড় বাঁধে। যেন ঋতু। প্রাচীন মিশরের সূর্যদেবতা নিজেদের লিঙ্গদন্ড কেটে ফেলেছিলেন একবার। কর্তিত লিঙ্গরস থেকে জন্ম নিয়েছিল নতুন মানুষরা, একটা নতুন জাতি।

উপন্যাস তো শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশন করে না, জীবনের খোঁজ দেয়, জীবনের রহস্যকে সত্যের আলোয় উপস্থিত করতে চায়। স্বপ্নময় এই উপন্যাসে সংবাদ পরিবেশ করেনি, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সমকামী-বৃহন্নলাদের সুখ-দুঃখ, বেঁচে-বর্তে থাকার জন্য কঠিন সংগ্রাম দেখিয়েছেন। যেমন মঞ্জু। অনিকেতের বান্ধবী। সে সংসার চেয়েছিল, স্বামী চেয়েছিল, কিন্তু তার ফ্রিজিডিটি (কামশীতল)-র জন্য ওর বর ফুটেছিল, কম্পন কে না চায়, কে না চায় হিল্লোল, সমুদ্রের কাছে ছুটে যাওয়া ঢেউ কে না ভালোবাসে। মঞ্জু রাতের পর রাত বিছানায় শুধু গোঁঙায়, সে পরিমল, পরিকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছিল, সেখানেও বাধা, ছোটবেলা থেকেই পরির মনে হয়েছে ও ছেলে না-হয়ে মেয়ে হলেই ভাল হত। মনের মধ্যে একটা নারী ঢুকেছিল ছোটবেলা থেকেই। পবন ধল। পবন ধল বলেছিল, গোলাপের রং তো আমরা গোলাপি-ই বুঝি। পিংক। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে শিল্পীসত্তা আছে, পরের জন্য দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনা আছে, আবার হিংসা-পরশ্রীকাতরতাও আছে, শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা। বাসব। বাসব বলেছিল, ছোটবেলা থেকেই ওর মনে হয়েছে ও ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে ভাল হত। মনের মধ্যে নারী ঢুকেছিল ছোটবেলা থেকেই। সোমনাথ। সোমনাথ যেদিন তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি পেয়ে মেয়েদের বাথরুম ব্যবহারের অনুমোদন পায়, সেদিন তার যে কী সেই আনন্দ। '...যেবার প্রথম মেয়েদের বাথরুমে গিয়ে বসে হিসি করলাম, সেদিন মনে মনে যে কী তৃপ্তি হয়েছিল...কী আনন্দ তা-তা-থৈ থৈ। দেখি সেখানে গোপন জল স্নান হয়ে হীরে হয় ফের; সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে; গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন হেমন্তের কুয়াশায়...।' যেমন তৃপ্তি সামন্ত আর সুস্মিতা হালদারের সম্পর্ক লেসবিয়ান কেস নয়, হেট্রো-সেক্সুয়াল কেস। তৃপ্তি তো ছেলেই, কম-কম ছেলে। বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী তৃপ্তি মেয়ে, তৃপ্তি একটা পেনিস চায়, স্পর্শসুখ চায়। ফিটনেস বাড়ানোর জন্য সে হরমোন নিত, সেটাই ওর ছেলেত্বকে জাগিয়েছিল। একটা মেয়েকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। তার বুক-ফাটা যন্ত্রণা '...এখন আমার ঘরে কত মেডেল, কাপ, শিল্ড, সার্টিফিকেট, মনে হয় ওই সব ফালতু। জঞ্জাল। রাগ হয়। ভিতরটা হু-হু করে'। সে আরো বলে, 'আমার জিন রেজাল্ট এসে গিয়েছে, আমি নাকি...ছেলে। প্রতি কোষে ছেলে, অথচ আমার লিঙ্গ নেই, লিঙ্গহীন পুরুষ। অসমর্থ, অথচ রেপ কেসের

আসামী। কেসে হাজিরা দিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে আমার নেই, আমি পারি না...উকিল বলেছে, আমি ৪৬x-y, আমি প্রতিটি কোষে পুরুষ, রেপ না পারি, শ্লীলতাহরণ তো পারি, মলেষ্ট করতে পারি। ৩৭৬ না হোক, ৩৫৪ ধারা তো আছে...। তৃপ্তিকে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে না বাড়িওয়ালা। 'ওরা নাকি হিজড়েদের কিংবা লেসবিয়ান-টেসবিয়ানদের সঙ্গে থাকতে চাইছে না। পাবলিক এখনও কনফিউজড্ আমি লেসবিয়ান না হিজড়ে? আথলেট পরিচয়টা কোনও কিছু নয়।' এর বাইরে আছে অনভিজাত সমকামীরা। মানে 'ধুরানি-মারানি-মওগা' প্রভৃতি। তাদের কথায়, 'জীবনটা বড় ছেনাল মাইরি; আমি প্যাঁচড়া জীবন ছ্যাঁচড়া জীবনের কথা বলছিনা, জীবন ধাড়া, ধন ধরে দাঁড়া---সে জীবন নয়, আমি এই জন্ম-এক্কাদোক্কা-ভেলপুরি-ফুচকা জীবনের কথা বলছি, এই ধুরানি-মারানি- বিলুয়া - বাট্টু-ইলাবিলা জীবনের কথা বলছি, ওয়ান প্লাস ওয়ান জীবন মানে ম্যাদামারা জীবন, প্লাস কলকলানো জীবন মিলে যা হয়, সেই জীবনের কথা বলছি ...'।

বিশাল ক্যানভাসে এই উপন্যাসের আখ্যান। উপন্যাসে যেমন কাহিনীর বিস্তার থাকে তেমনি কাহিনীর পরিণতিও থাকে, পরিণতিতে সব ক্লান্তির শান্তি। এই উপন্যাসে সব চরিত্র, সব ধারা-উপধারার সঙ্গম এবং সব চরিত্র নিজ নিজ পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। দুলাল-মন্টু খুন হয়েছে। মঞ্জু আত্মধিক্কারে রেললাইনে শান্তি খুঁজে পেয়েছে। পরি সেক্স রি-অ্যাসাইমেন্ট সার্জারী করিয়ে নারী হয়েছে। পরি-চয়ন অনেক পথ বেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে। পরি ও চয়নের বিয়ে রেজিস্ট্রি হবে না, কিন্তু বিয়েটা করবে—মালাবদল, মাথায় মুকুট পরে। স্বপ্নময় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে জীবনকে নিয়ে লিখেছেন, তাকে তিনি আপাদমস্তক চেনেন এবং জানেন, তাই এই উপন্যাস কল্পিত নয়, ডকুমেন্টারি। একটি জীবনবোধ ও আত্মকথা তাতে সঞ্চারিত। এই আত্মকথাতেই উপন্যাসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। লিঙ্গান্তরকামীদের এই মানবিক সংকট ও জীবনসত্যের অন্বেষণ বিশ শতকীয় সমাজমানসে অহরহ আঘাত হেনেছে, যার প্রভাবে সাহিত্যচিন্তার অভিজ্ঞানের বদল ঘটছে, আর সাহিত্যের অভিমুখে তাদের আলোচনার দাবী জোরালো হয়ে উঠেছে।

উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রমানস - ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য

কৌশিক পাত্র*

বিষয়সংক্ষেপ ঃ ঔপনিষদিক তত্ত্ব ও দর্শনের চিন্তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রভাতবেলা থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত কবিমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সজ্ঞানে অথবা নির্জ্ঞানে উপনিষদের মর্মবাণী তাঁর সাহিত্য-সাধনায় বারেবারেই বিচিত্রভাবে এসেছে। কোথাও সেই ভাবের অভিব্যক্তি উপনিষদের মৌলিক ভাব-সুরের সঙ্গে অভিন্ন, কোথাও বা তা উপনিষদের তত্ত্ব-লালিত অথচ প্রাতিবিম্বিক অনুভবের নবীনতম ও আশ্চর্য প্রকাশরূপে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে তিনি ঔপনিষদিক দর্শনের মৌলভাব এবং সুরের শুধু অনুসরণ করেননি, নিজেও নতুন নতুন দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর মৌলিকতা। উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ও বিচিত্র সম্পর্কের পরিচয় দুইভাবে পাওয়া যায় - (১) প্রত্যক্ষভাবে ও (২) পরোক্ষভাবে। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম', 'শান্তিনিকতেন', 'ধম', 'বিশ্বভারতী', 'শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি প্রবন্ধমালায় উপনিষদ্ প্রীতি ও ঔপনিষদিক ভাবকর্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে। আর পরোক্ষ পরিচয় অজস্র ছড়িয়ে আছে তাঁর 'নৈবেদ্য' (কাব্য), 'উপনিষদ্ ব্রহ্ম', 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশ', 'ভারতবর্ষ', 'খেয়া' (কাব্য), 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'শারদোৎসব' (নাটক), 'গোরা' (উপন্যাস), 'গীতাঞ্জলী' (গান) ইত্যাদি কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও গানের (১৯০১ - ১৯১১ এর মধ্যে রচনা) মধ্যে। উপনিষদ্ রবীন্দ্রনাথকে ভাবরসে রসায়িত করে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার বিকাশে সহায়তা করেছে, তাঁকে প্রেরণার উপকরণ যুগিয়েছে প্রচুর, আর সেই উপকরণ দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতস্বাদ নব রসায়ন পরিবেষণ করেছেন।

ঔপনিষদিক ভাবাদর্শের প্রেরণায় সৃষ্ট রচনাগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। 'অহং ও আত্মা', 'সুখ-দুঃখ', 'জীবন-মৃত্যু', 'প্রেম' প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার, এক কথায় তাঁর জীবন-দর্শনের মূল কথাগুলি ঐসব আলোচনাগুলির মধ্যে পাই। ঔপনিষদিক চেতনা কবিকে মানবচেতনা থেকে দিব্যচেতনায়, কবিত্ব থেকে ঋষিত্বে উন্নীত করেও তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অন্য যেভাবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা হল উপনিষদের ভাষা ও ছন্দ। উপনিষদের গদ্য ভাষার মধ্যে যে অপূর্ব ছন্দ ও অর্থসামঞ্জস্য বা 'Balance' রয়েছে কবিজীবনে তিনি তা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। উপনিষদের গদ্য ছন্দোময়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য কবিতায় এই ছন্দের ঐশ্বর্য আমদানী করলেন। ঔপনিষদিক ছন্দে তিনি 'জয়পরাজয়'

*এম.ফিল. সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রভৃতি গদ্যছন্দের রচনা লিখেছিলেন এবং ইংরাজী গীতাঞ্জলির গানগুলিও গদ্যছন্দেই রচনা করেছিলেন। আত্মাকে ছন্দোময় করার কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে - 'আত্মানং ছন্দোময়ং কুরুতে।' দীর্ঘজীবনের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ আত্মাকে শুধু ছন্দোময় নয়, আনন্দময়, অমৃতময় করে গেছেন।

সূচকশব্দ ঃ মর্মবাণী, স্বতন্ত্র, মৌলিকতা, নিবিড়, বিচিত্র, অমৃতস্বাদ, রসায়ন, মানবচেতনা, অর্থসামঞ্জস্য, ঐশ্বর্য, ছন্দোময়, আনন্দময়, অমৃতময়।

১. ভূমিকা ঃ

আর্য-ভারতের সনাতন জ্ঞান ও মনীষার অফুরন্ত আকর 'বেদ'। ঋক্-সাম-যজুঃ-অথর্বাদি বেদ চতুষ্টয়ের মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ্ এই চার ভাগ। উপনিষদ্ ভাগ-বৈদিক দর্শন। 'উপনিষদ্' শব্দের নানা অর্থ। আভিধানিক অর্থে উপনিষদ্ - সদ্গুরু-সমাহৃত গূঢ়-গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। বিশেষ অভিনিবেশ আছে এমন সুযোগ্য শিষ্যই এই জ্ঞানলাভের অধিকারী। সাধারণ অর্থে উপনিষদ্ - গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান - সংক্রান্ত দার্শনিক গ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানবিক চিন্তার এক বিশেষ রূপ উপনিষদে পরিস্ফুট। ভারতীয় মনীষীদের জ্ঞানানুসন্ধিৎসার পরিণতি রূপে আবির্ভূত হয় উপনিষদ্ সাহিত্য। উপনিষদ্ বেদের শেষ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলে 'বেদান্ত' নামেও অভিহিত হয়। উপনিষদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য - এই ১০টিকে প্রামাণ্য ধরা হয়। কারণ আচার্য শংকর এই ১০টি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এই উপনিষদগুলির সঙ্গে কৌষীতকী, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, মৈত্রায়ণী কে নিয়ে এই ১৪টি কে প্রামাণ্য ধরা হয়।

ঔপনিষদিক তত্ত্ব ও দর্শনের চিন্তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রভাতবেলা থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত কবিমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সজ্ঞানে অথবা নির্জ্ঞানে উপনিষদের মর্মবাণী তাঁর সাহিত্য-সাধনায় বারেবারেই বিচিত্রভাবে এসেছে। কোথাও সেই ভাবের অভিব্যক্তি উপনিষদের মৌলিক ভাব-সুরের সঙ্গে অভিন্ন, কোথাও বা তা উপনিষদের তত্ত্ব-লালিত অথচ প্রাতিবিম্বিক অনুভবের নবীনতম ও আশ্চর্য প্রকাশরূপে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে তিনি ঔপনিষদিক দর্শনের মৌলভাব এবং সুরের শুধু অনুসরণ করেননি, নিজেও নতুন নতুন দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর মৌলিকতা।

উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ও বিচিত্র সম্পর্কের পরিচয় দুইভাবে পাওয়া যায় - (১) প্রত্যক্ষভাবে ও (২) পরোক্ষভাবে। প্রথমটির আলোচনায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ সরাসরি উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রের অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নয়, তাই তার একটি সূচী এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে।

উপনিষদের অনূদিত অংশ[১] ঃ-

১. ''যো দেবো২গ্নৌ যো২প্সু...''	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্	২.১৭
২. ''সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম...''	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্	২.১.১
৩. ''আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি...''	মুণ্ডক উপনিষদ্	২.২.৭
৪. ''শান্তং শিবমদ্বৈতম্...''	মাণ্ডুক্য উপনিষদ্	৭
৫. ''তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্...'' - তিনটি মন্ত্রের অনুবাদ	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্	৬.৭-৯
৬. ''এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা...''	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্	৪.১৭
৭. ''স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্...''	ঈশোপনিষদ্	৮
৮. ''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ...''	শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্	২.৫
৯. ''সত্যকামো২জাবালো জবালাং মাতরং মামন্ত্রয়াচক্রে...''	ছান্দোগ্য উপনিষদ্	৪.৪

'নৈবেদ্য'-র কোনো কোনো কবিতায় তিনি উপনিষদের মন্ত্র হুবহু তুলে দিয়েছেন। যেমন -

(১) 'নৈবেদ্য'-র (৫৭ সংখ্যক কবিতা) ''হে সকল ঈশ্বর পরমেশ্বর...'' অংশে ''অগ্নিতে জলেতে'' এই বিশ্বচরাচরে বনস্পতি ওষধিতে একদেবতার অখণ্ড, অক্ষয় ঐক্য। এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ''যো দেবো২গ্নৌ যো২প্সু...''ইত্যাদি মন্ত্র।

(২) 'নৈবেদ্য'-র (৬০ সংখ্যক কবিতা) ''একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে —'' অংশে ''শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ'' - এর সঙ্গে তুলনীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ...'' শীর্ষক মন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম', 'শান্তিনিকতেন', 'ধম', 'বিশ্বভারতী', 'শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি প্রবন্ধমালায় উপনিষদ্ প্রীতি ও ঔপনিষদিক ভাবকর্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে। আর পরোক্ষ পরিচয় অজস্র ছড়িয়ে আছে তাঁর 'নৈবেদ্য' (কাব্য), 'উপনিষদ্ ব্রহ্ম', 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশ', 'ভারতবর্ষ', 'খেয়া' (কাব্য), 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'শারদোৎসব' (নাটক), 'গোরা' (উপন্যাস), 'গীতাঞ্জলী' (গান) ইত্যাদি কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও গানের (১৯০১ - ১৯১১ এর মধ্যে রচনা) মধ্যে।

২. <u>উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রমানস - ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য ঃ</u>

মানসিকতা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবসাযুজ্য অনুমতি হয়। বৈদিক ঋষিকবির মন আর রবীন্দ্রনাথের কবিমন যেন একই ভাব ও সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালের ব্যবধান সেই ভাব-সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বৈপরীত্য সৃষ্টি করেনি।[২]

সত্যদ্রষ্টা 'ঋষিকবি'[৩]পরমসত্যের স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। বৈদিক ঋষিকবি সত্যকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন করে অনুভব করেন নি। পূর্ণ ও সমগ্রের মধ্য দিয়ে সত্যকে তাঁরা দর্শন করেছিলেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবির মতো রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ''বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না - তখনই প্রত্যেক খণ্ড পদার্থ, প্রত্যেক খণ্ড ঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি - তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেইক্ষণেই, সেই মিলানেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই - 'নিখিলে তব কী মহোৎসব! বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।''[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ভাবরসে আপ্লুত হয়ে আনন্দলোকের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজেছিলেন। 'আত্মপরিচয়'-এ তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, ''আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি; ভালো লাগল আমার।''[৫] সুতরাং তাঁর ধর্ম একান্তই কবিধর্ম। উপনিষদের আলোকে সেই ধর্মের অভিপ্রকাশ মাত্র।

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের 'যাজ্ঞবল্ক্য - মৈত্রেয়ী - সংবাদ'[৬] -এ সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণীকে ডেকে তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার কথা বললে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে বলেছিলেন - ''যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।'' (বৃহদারণ্যক - ২/৪/৩) - ''যা দিয়ে আমি অমৃতকে - আনন্দকে পাব না, তাই দিয়ে আমি কি করবো।''

কঠোপনিষদে বালক ব্রহ্মচারী নচিকেতাও যমকে বলেছিলেন - ''ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।'' (কঠ ১/২৭) - ''আমি অনিত্য বিত্ত চাই না, শাশ্বত আনন্দ চাই।'' নচিকেতার জ্ঞানদৃপ্ত এই কথা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর উক্ত কথারই প্রতিধ্বনি।

কবি রবীন্দ্রনাথও তাই প্রার্থনা করেছেন - ''হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এসো সংসারের-উপকরণ-পীড়িতের মধ্যে তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুরকণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও। নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।''[৭] কবির এই প্রার্থনা থেকে মনে হয় যেন তিনি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কাব্যভাবনা ও আধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা এক হয়ে গেছে।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'অমৃত' কবিতায় মৈত্রেয়ীর দৃপ্তবাণীটি নতুন করে বিঘোষিত হয়েছে। এখানে অমৃত হল ভালবাসা - 'ভালোবাসাই সেই অমৃত, উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ।'

মৈত্রেয়ী ভোগ, উপকরণ অপেক্ষা অমৃত - ভালোবাসা-প্রেম-আনন্দকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'অমৃত' কবিতাটিতে কবি দেখিয়েছেন, তাঁর কল্পিত প্রেমময়ী নায়িকা 'অমিয়া'কে নায়ক 'মহীভূষণ' উপকরণের দুর্গ থেকে উদ্ধার করে মৈত্রেয়ীর বাণীকে সার্থক করে তুলেছে।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের ৭/২৩ অধ্যায়ে 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ'[৮]-এ এই ভূমাতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। সেখানে সনৎকুমার মহাগ্রন্থপারগ নারদকে উপদেশ দিয়েছেন, ''যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্।" (ছান্দ্যোগ্য ৭/২৩/১) - ভূমা-ই (আনন্দই) সুখ, অল্পে (অন্য কিছুতে) সুখ নেই, সুতরাং ''ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছান্দ্যোগ্য ৭/২৩/১) - ''ভূমাই তোমার উপলব্ধির বিষয় হওয়া উচিত।" সুতরাং উপনিষদের চরম কথা এই ভূমার কথা।

'মানুষের ধর্ম'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই ভূমানন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভূমাকে 'আহারে-বিহারে, আচারে-বিচারে, ভোগে-নৈবেদ্যে, মন্ত্রে-তন্ত্রে' লাভ করা যায় না। তাকে পেতে হয় 'বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে।'[৯]

'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার ''.....মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা, মৃত্যুরে না করি শঙ্কা ..." ইত্যাদি অংশেও সংসারের সুখে-দুঃখে, কর্মের মধ্য দিয়ে ভূমাকেই লাভের কথা বলা হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ভূমাতত্ত্বের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক মনন-শীলতার ছাপ পড়েছে। তাঁর মতে, ভূমাকে লাভ করার জন্য লোকালয় ত্যাগ করে গিরি-গহ্বরে যাবার প্রয়োজন নেই। ভূমার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা মানবিক সাধনা।

ঈশোপনিষদের একটি মন্ত্র তত্ত্ব ও সাধনার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋষি 'পূষন্'কে - জগৎপোষক সূর্যকে সম্বোধন করে বলেছেন, ''হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।" (ঈশ ১৫) - ''স্বর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের মুখ আচ্ছন্ন। হে পূষন্, সরিয়ে নাও তোমার কুহেলির আচ্ছাদন। আমি সত্যসন্ধ - সত্যকে উপলব্ধি করতে চাই।" মানুষের তাই চিরন্তন ক্রন্দন - অপাবৃণু, অপাবৃণু - সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও। এরপর সত্যের আবরণমুক্ত কল্যাণময় রূপ দেখার বাসনা জেগেছে ঋষির মনে, বলেছেন,

''পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।" (ঈশ ১৬)

- শুধু তাই নয়, ''তোমার কল্যাণময় রূপ দেখে আমিও তোমার প্রাপ্ত হয়েছি, তুমি আর আমি একাকার হয়ে গেছি" - ''যোঽসাবসৌ পুরুষঃ। সোঽহমস্মি।" (ঈশ ১৬)

রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রটির অনুবাদ করেছেন - 'দেখি তোমার আমার মাঝারে যে পুরুষ সে এক।' রবীন্দ্রনাথ 'সোঽহম্' তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'সোঽহম্' শব্দের মর্মার্থ হল 'আমি তাঁর সঙ্গে এক, যিনি আমার চেয়ে বড়ো।'[১০] এই সরল অর্থ ছেড়ে যাঁরা ভ্রান্তপথে

চলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিদ্রূপ করেছেন - ''আমাদের দেশে একদল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা 'সো২হম্' তত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্য ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন, জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্য, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকে অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাকে ভূমা বলেন, তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সবকিছু হতে বার্জিত। সুতরাং তার মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি 'পৌরুষং নৃষু' - মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ড কর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকীজ্ঞানবল ক্রিয়া চ - যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি কর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।"[১১] সুতরাং সাধক তখনই মাত্র বলতে পারেন "I and my father are one" (মানুষের ধর্ম, ৩য় অধ্যায়), যখন তিনি ব্যক্তি - আত্মার মুক্তির জন্য নয়, সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র হিসেবে 'সো২হম্' তত্ত্বটিকে গ্রহণ করতে পারেন।

প্রত্যেক মানুষের অভিব্যক্তি দুই প্রকার - একটি তার অহং, অপরটি তাঁর আত্মা। অহং 'আপনাতে আপনি সীমাবদ্ধ', আত্মা 'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত'।[১২] অহং-সংকীর্ণ আমি, খণ্ড আমি, সীমাবদ্ধ আমি, আত্মা বৃহৎ আমি, অসীম-অনন্ত আমি, অখণ্ড আমি। এই দ্বিতীয় আমি বা আত্মা অমৃত, শাশ্বত। ব্যক্তি অহং-এর ঢাকাটা সরে গেলেই আত্মা বেরিয়ে আসে।

মুণ্ডকোপনিষদে অহং ও আত্মা নামান্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা - এদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে -

''দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদত্ত্যনশ্নন্যো২ভিচাকশীতি।।"

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩/১/১)

- ''দুই পরস্পর - সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পাখী একই গাছ আশ্রয় করে আছেন। তাঁদের একজন মিষ্টফল আহার করেন, আর একজন অনশনে থেকে কেবল দর্শন করেন।" এখানে পাখী দুটির মধ্যে যিনি স্বাদু ফল আহার করেন তিনি জীবাত্মার প্রতীক, আর যিনি অনশনে থেকে কেবল দর্শন করেন তিনি পরমাত্মার প্রতীক।

'সোনারতরী'র 'দুই পাখি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথও অহং ও আত্মার প্রতীক দুটির বৈষম্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পাখী দুটির মধ্যে একটি - বন্ধন-তুষ্ট খাঁচার পাখী - সংসারের প্রাত্যহিকতাবদ্ধ সংকীর্ণ ব্যক্তি - জীবাত্মা বা অহং, আর অন্যটি বনের পাখী - যে মুক্তবন্ধন - পরমাত্মা।

'জাপান-যাত্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুণ্ডকোপনিষদের পূর্বোক্ত শ্লোকের আলোকে মানুষের নিজের মধ্যেই দুই পাখির অস্তিত্ব অনুভব করে লিখেছেন - ''উপনিষদে লিখছে, এক

ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর এক পাখি দেখে। যে পাখী দেখছে তার আনন্দ বড়ো আনন্দ, কেননা তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে। এক পাখির প্রয়োজন আছে, আর এক পাখির প্রয়োজন নেই। এক পাখি ভোগ করে, আর এক পাখি দেখে। যে পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরী করা, অর্থাৎ যেটা তৈরী হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরী করা - নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর, সৃষ্টি করা অন্য কোনোকিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে সর্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা, এই জন্য ভোগী পাখি যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির উপকরণ হচ্ছে আমি পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।"[১৩]

উপনিষদের মতো রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন, ''হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।" (ঈশোপনিষদ্ ১৫) - স্বর্ণপাত্রের মুখের ঐ ঢাকনাটি অনাবৃত করলেই সত্যের সথার্থ স্বরূপ অনুভবগোচর হবে। এখানে হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ বা ঢাকনাটি অহং-এর প্রতীক; আর এই অহংকে ত্যাগ করলেই আত্মার বিকাশ। ঈশোপনিষদ্ তাই বলেন, ''তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা" (ঈশোপনিষদ্ ১) - ''ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর।" এই ত্যাগ রবীন্দ্রনাথের মতে অহংকে ত্যাগ। 'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্বর্ণপাত্রের এই ঢাকনাটি উন্মোচিত হয়েছিল, অহং-এর সীমা থেকে অনন্ত বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে কবি-আত্মা মুক্তিলাভ করেছিল। এখানে আত্মাকে কবি চিরবহমান নির্ঝরের সঙ্গে উপমিত করেছেন। 'মানুষের ধর্ম'-এর শৈশবস্মৃতির বর্ণনায় একই কথা কবি আরও পরিষ্কার করে বলেছেন।[১৪]

'গীতাঞ্জলী'র 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে' গানের মধ্যে 'অহং' থেকে মুক্তির কথা আছে - 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।' ('গীতাঞ্জলী' ১) 'গীতাঞ্জলী'র ৪১ সংখ্যক গানে অহংকে মলিন বস্ত্র হিসাবে কল্পনা করে সেই অহংকার বিসর্জন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে - 'এই মলিনবস্ত্র ছাড়তে হবে গো এইবার - আমার এই মলিন অহংকার।' 'গীতাঞ্জলী'র ১৪৫ সংখ্যক গান - 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই'... ইত্যাদির মধ্যে অহং থেকে মুক্তির কথা আছে। অহং ও আত্মা, সীমা ও অসীমের বিরোধ রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির স্থিতি ও পুরুষের মুক্তভাবের কথা আছে। এই মুক্তভাবের বেদনা রবীন্দ্রকাব্যে অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'কচ ও দেবযানী' এবং 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়।

ঈশোপনিষদে আর একটি সাধনার কথা বলা হয়েছে - 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।' (ঈশ ১) - 'বিশ্বজগতের

যাহা কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে - এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না।' (রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ, দ্রঃ 'ধর্ম' প্রবন্ধ) মন্ত্রটি কবির কাছে প্রিয় ছিল। সর্বভূতে ঈশ্বরের ছায়া এবং তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত বিষয়কে ভোগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের যে উপাসনা - রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ইহাই সত্যকারের সাধনা। যে বিশ্বজাগতিক শক্তিকে উপনিষদে 'ঈশা' বলা হয়েছে - তিনি এই জগতের 'বাহকশক্তি', 'কল্যাণশক্তি'। এই কল্যাণশক্তিকে জাগ্রত করাই তপস্যা।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে - 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ এবং ত্বয়ি নান্যথেতো২স্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।' (ঈশ ২) এই মন্ত্রে আবার কর্মের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের শতবর্ষ পরমায়ু দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন? - ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করবার জন্য এবং কর্মের মধ্য দিয়ে, প্রেমের মধ্য দিয়ে মানুষকে ভালোবাসার জন্য। অর্থাৎ মানবসেবা ও মানবকল্যাণের জন্য। কর্মে ও প্রেমে বিশ্বমানবের কল্যাণকামনা - সে তো মনুষ্যত্বেরই সাধনা। এই সহজ কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Religion of Man' বক্তৃতার মধ্যে পরিষ্কার করে বলেছেন। লোক-কল্যাণকর কর্মে, স্বার্থত্যাগে ও আত্মবিসর্জনে নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণ সত্ত্বার জাগরণই তো মানুষের ধর্ম। ঈশা-আদর্শের পরিকল্পনায় উপনিষদ্ আমাদের এই মহতী শিক্ষাই দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Religion of Man' -এ তাই লিখলেন -

"The Isha of our Upanishad, the super soul, which permeates all moving things, is the God of this human Universe whose mind we share in all our true knowledge, love and service and whom to reveal in ourselves through renunciation of self is the highest end of life."

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল-কামনা' কবিতার সেই 'ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে। আকাঙ্খার ধন নহে আত্মা মানবের' - ইত্যাদি অংশের মূল কথাটি হল - মানবাত্মার সেবা ত্যাগে ও প্রেমে। তাই 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্' - ঋষিকবির এই উপদেশ। রবীন্দ্রনাথও বললেন - "মানব-সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোট বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক - কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা - সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।" [১৫]

কোনোপনিষদের ঋষি বললেন, 'যহচেদ্ বেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদীহান্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।' (কেন ৩।৫) অতএব 'ইহলোকেই ঈশ্বরকে জানো এবং সেই জানার মধ্য দিয়েই নিজেরা সেই 'আবিঃ'র মতো নিত্য প্রকট হও। এতেই কল্যাণ হবে।' - উপনিষদের এই আদেশ। উপনিষদ্ আরও বলেছেন, "যস্তু

সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।" (ঈশ ৬) - ''যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত।" পাশ্চাত্যজগতের বিজ্ঞানদম্ভী মদমত্ততা ও ভেদজ্ঞানের সামনে প্রাচ্যজগতের প্রকাশের এই আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। (দ্রঃ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ) এই জানা ও প্রকাশের ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথও বলেছেন একটি গানে - 'আমি যে সব নিতে চাইরে/আপনাকে ভাই মেলবো যে বাইরে।' সমস্ত উপনিষদের পাতায় পাতায় এই একই কল্যাণাদর্শ, একই অভয়বাণী বারবার ধ্বনিত হয়েছে।

মানবধর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে দেখতে হবে, জানতে হবে। 'Religion of Man'-এ রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট করে লিখলেন -

''My Religion is the reconciliation of the super personal man, the universal human spirit in my own individual being."[১৬]

'মানুষের ধর্ম'-এর ভূমিকায় কবি একই কথা আরও প্রাঞ্জল করে বলেছেন - ''আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তার প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।... সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।' সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন - স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"[১৭]

ঈশোপনিষদের আর একটি কথা ঐক্যের কথা, সমন্বয়ের কথা। কিসের সমন্বয়? - বিদ্যা এবং অবিদ্যার সমন্বয়, জ্ঞান এবং কর্মের সমন্বয়। বিদ্যা অর্থাৎ পরাবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা। আর অবিদ্যা - জড় বিদ্যা, ভৌতিক বিদ্যা। অবিদ্যা - বিজ্ঞান আর বিদ্যা - পরাজ্ঞান বা প্রজ্ঞান। অবিদ্যা - কর্ম, বিদ্যা - মোক্ষ। অবিদ্যা জাগতিক কামনা-বাসনার উপকরণ জোগায়, আর বিদ্যা মুক্তির প্রেরণা দেয়। উপনিষদ্ তাই বলেন - যাঁরা মোক্ষাকাঙ্খী তাঁরা বিদ্যার উপাসনা করবেন, আর যাঁরা সংসারী, স্থূল-ভোগাকাঙ্খী তাঁরা করবেন অবিদ্যার উপাসনা। আর যাঁরা এই দুইয়ের সমন্বয় স্থাপন করতে পারবেন তাঁরা অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অমৃতকে লাভ করবেন - ''বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।।" (ঈশ ১১) জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই সমন্বয়ের আদর্শ রবীন্দ্রনাথও লাভ করেছিলেন উপনিষদ্ থেকে। প্রাচ্য জগতে - ভারতবর্ষেই প্রথম এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মিলনের আদর্শ গড়ে উঠেছিল। গীতাঞ্জলির

১০৬ সংখ্যক গানে - 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে - রবীন্দ্রনাথ ভারতের মহামিলনের আদর্শটি তুলে ধরেছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ অবিদ্যা বা বিজ্ঞানের উপাসনা করে জ্ঞানের শীর্ষে আরোহণ করেছিল। আর প্রাচীন ভারত বিদ্যা উপাসনার সমুন্নত শীর্ষে আসীন ছিল। কিন্তু বর্তমান ভারত জ্ঞানের সাধনায় পরাঙ্মুখ। তাই কবি বলেছিলেন - প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের, বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় ঘটাতে হবে যেমনটি ঘটেছিল প্রচীন ভারতে। অতএব কবির প্রত্যয় -

''পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে -
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।'' ('ভারততীর্থ')

এই মিলনই পূর্ণাঙ্গ মিলন। এই মিলনের নির্দেশ আছে উপনিষদে। 'শিক্ষার মিলনে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন - ''পূর্ব-পশ্চিমের মিলন মন্ত্র উপনিষদ্ দিয়ে গেছেন। বলেছেন - বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নতে। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ - এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্যমিদং সর্বং - এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা ঋষি বলেছেন। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব, আর মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, নিরানন্দ।''

'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'অনন্ত জীবন' কবিতাটিতে যে অখণ্ড বিশ্বজীবনের কথা কবি বলেছেন তার সঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদের 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে২স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়' (মুণ্ডক ৩/২/৮) ইত্যাদি মন্ত্রটির ভাবগত মিল লক্ষ্য করা যায়।

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে বিশ্বসৃষ্টিপ্রবাহের পশ্চাতে অখণ্ড 'অক্ষর প্রশাসনের' কথা আছে - 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। (বৃহদারণ্যক ৩/৮/৯ ইত্যাদি) সেকানে বলা হয়েছে - এই অক্ষর প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য, দ্যুলোক-ভূলোক, নিমেষসমূহ, মুহূর্তসমূহ, অহোরাত্রসকল, অর্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ বিধৃত হয়ে আছে। (বৃহদারণ্যক ৩/৮/৯) নদী-পর্বতাদি তাঁরই নির্দেশে স্যন্দমান, 'তদ্ বা এতদ্ অক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট-শ্রুতং শোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ... এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।' (বৃহদারণ্যক ৩/৮/১১) এই অক্ষর প্রশাসনের কথায় উপনিষদ্ আরও বলেছেন, 'অগ্নি ইঁহার ভয়ে তাপ দিতেছেন, ইঁহার ভয়ে সূর্য তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু - ইঁহার ভয়ে ইহারা সকলে ধাবিত হইতেছে।' [১৮]

রবীন্দ্রনাথ অক্ষরব্রহ্মের প্রশাসনের মধ্যে ভয়ের দিকটিকে - 'মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' দিকটিকে স্বীকার করেও তাঁর আনন্দ ও অমৃতময় প্রকাশরূপকে - 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'কে সযত্নে বরণ করেছেন। সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তরালে ঐ আনন্দস্রোত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

'প্রভাতসঙ্গীত'-এর 'মহাস্বপ্ন' ও 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় কবি- অক্ষর-প্রশাসনের কথা বলেছেন। এ ধারার পরিণতি ঘটেছে 'গীতিমাল্য'-এর 'এই তো তোমার আলোক ধেনু' (গীতিমাল্য ১০৩) গানে। 'নৈবেদ্য'র ভক্তিমূলক কবিতায় অক্ষরব্রহ্মের উল্লেখ করে তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে গভীর যোগ অনুভব করেছেন। অত্যন্ত সচেতন ভাবে উপনিষদের সেই 'একঃ'-এর প্রকাশের পরিচয় আছে 'নৈবেদ্য'র ২৩ ও ২৬ সংখ্যক কবিতায়।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদের জাবাল-সত্যকামের কাহিনী থেকে জানা যায়, গৌতমশিষ্য সত্যকাম ব্রহ্মতত্ত্ব জেনেছিলেন মনুষ্যেতরদের কাছ থেকে, প্রকৃতির কাছ থেকে। অনুভূতির আলোকে প্রকৃতির সঙ্গে যোগে সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায় - 'মানুষের ধর্মে' এই কথাটা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ - ''আমার ধর্মানুভূতির প্রথম স্তর দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ উদ্বোধে।''[১৯] রবীন্দ্রমানসের এই অনুভবকে সমালোচক 'প্রকৃতি রহস্যবাদ' (Nature-mysticism) আখ্যা দিয়েছেন।[২০] রবীন্দ্রসাহিত্যে এই মৌলিক প্রকৃতিচেতনা বিপুল বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. <u>উপসংহার</u> ঃ সুতরাং উপরি উক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যেতে পারে যে, উপনিষদ্ রবীন্দ্রনাথকে ভাবরসে রসায়িত করে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার বিকাশে সহায়তা করেছে, তাঁকে প্রেরণার উপকরণ যুগিয়েছে প্রচুর, আর সেই উপকরণ দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতস্বাদ নব রসায়ন পরিবেষণ করেছেন।

ঔপনিষদিক ভাবাদর্শের প্রেরণায় সৃষ্ট রচনাগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। 'অহং ও আত্মা', 'সুখ-দুঃখ', 'জীবন-মৃত্যু', 'প্রেম' প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার, এক কথায় তাঁর জীবন-দর্শনের মূল কথাগুলি ঐসব আলোচনাগুলির মধ্যে পাই।[২১] ঔপনিষদিক চেতনা কবিকে মানবচেতনা থেকে দিব্যচেতনায়, কবিত্ব থেকে ঋষিত্বে উন্নীত করেও তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অন্য যেভাবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা হল উপনিষদের ভাষা ও ছন্দ। উপনিষদের গদ্য ভাষার মধ্যে যে অপূর্ব ছন্দ ও অর্থসামঞ্জস্য বা 'Balance' রয়েছে কবিজীবনে তিনি তা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। উপনিষদের গদ্য ছন্দোময়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্য কবিতায় এই ছন্দের ঐশ্বর্য আমদানী করলেন। ঔপনিষদিক ছন্দে তিনি 'জয়পরাজয়' প্রভৃতি গদ্যছন্দের রচনা লিখেছিলেন এবং ইংরাজী গীতাঞ্জলির গানগুলিও গদ্যছন্দেই রচনা করেছিলেন।[২২] আত্মাকে ছন্দোময় করার কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে - 'আত্মানং ছন্দোময়ং কুরুতে।' দীর্ঘজীবনের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ আত্মাকে শুধু ছন্দোময় নয়, আনন্দময়, অমৃতময় করে গেছেন।

৪. <u>তথ্যসূত্র</u> ঃ

১. 'রূপান্তর' - 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮), ১৫শ খণ্ড।

২. ''তিন সহস্র বৎসরের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়াও এ মিল দেখা দিয়াছে অতি ঘনিষ্ঠ অথচ সহজভাবে।'' শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ'। দ্রঃ 'রবীন্দ্রায়ণ' (পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত)।

৩. ''বেদে 'কবিক্রতু' শব্দের অর্থ 'ক্রান্তপ্রজ্ঞ'। ক্রান্তদর্শী অগ্নি প্রভৃতি দেবতা ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণকে বৈদিক সাহিত্যে 'কবি' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। যাঁহার দৃষ্টিতে অতীত, অনাগত, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, সকল বস্তু সমানভাবে উদ্ভাষিত হইয়া থাকে, তিনি 'কবি'। সুতরাং 'ঋষি' ও 'কবি' - এই উভয় শব্দই সমানার্থক। প্রাতিভ প্রত্যক্ষই ঋষিত্বের এবং কবিত্বের লক্ষণ।'' 'কাব্যকৌতুক', বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ১৯৬৩, পৃঃ ২।

৪. 'মানুষের ধর্ম' - 'উৎসব' প্রবন্ধ, দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫।

৫. 'আত্মপরিচয়' (বিশ্বভারতী, ১৯৬১), ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ, পৃঃ ১০০। এর সঙ্গে তুলনীয় - ''এই ধুলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেকে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি - ঔষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।'' 'আত্মপরিচয়' (বিশ্বভারতী, ১৯৬১), ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৭৬।

৬. 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্' ২য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

৭. 'শান্তিনিকেতন', 'প্রার্থনা' প্রবন্ধ।

৮. 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্' ৭ম অধ্যায়।

৯. 'মানুষের ধর্ম', ৩য় অধ্যায়, ৫ম অনুচ্ছেদ।

১০. তদেব, ৩য় অধ্যায়। দ্রঃ 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৯৭।

১১. তদেব, পৃঃ ৫৯৭।

১২. তদেব, পৃঃ ৫৯৭।

১৩. 'রবীন্দ্ররচনাবলী', ১৯ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৯৭৬, পৃঃ ২৯৯।

১৪. 'মানুষের ধর্ম', সংযোজন, 'মানবসত্য', 'রবীন্দ্ররচনাবলী', ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃঃ ৬০৬, ৪র্থ অনুচ্ছেদ - ''সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির....'' ইত্যাদি।

১৫. 'ধর্ম', 'প্রার্থনা' প্রবন্ধ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ, ১৩৬৮ পৃঃ ৪৫।

১৬. 'রিলিজিয়ন অফ্ ম্যান' হিবার্ট বক্তৃতা।

১৭. 'মানুষের ধর্ম', ভূমিকাংশ দ্রঃ।

১৮. ''ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি....'' ইত্যাদি মন্ত্রের অনুবাদ।

১৯. 'মানুষের ধর্ম', সংযোজন, 'মানবসত্য', দ্রঃ 'রবীন্দ্ররচনাবলী', ১২শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ, ১৩৬৮।

২০. 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস।' - (১ম সংস্করণ, ১৩৬৮), শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২১. যেমন 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ধৃত 'পূর্ণ' ভাষণটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের পরিপূরক, আবার ১ম খণ্ডে ধৃত 'তপোবন' ও 'বিকারাশঙ্কা' ভাষণ দুটি 'প্রাচীনসাহিত্য' গ্রন্থের পরিপূরক। আবার ২য় খণ্ডে ধৃত 'বর্ষশেষ', 'নববর্ষ' ও 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' ভাষণ তিনটি 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষশেষ' কবিতার পরিপূরক। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রসমীক্ষা' দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা' পৃঃ ৮৬।

২২. 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম', ক্ষিতিমোহন সেন, দ্রঃ 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' (সাময়িকী), ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৪।

৫. <u>সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ</u>

১. আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৬১।

২. উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (১ম - ৩য় খণ্ড), সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩ (৫ম পুনর্মুদ্রণ)।

৩. উপনিষদ্ নবক, সম্পাদক অতুলচন্দ্র সেন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৫ (৩য় সংস্করণ)।

৪. উপনিষদ্ ভাবনা (১ম খণ্ড), মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট, ৩য় সংস্করণ।

৫. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৬৮ (১ম সংস্করণ)।

৬. কাব্যকৌতুক, বিষ্ণুভূষণ ভট্টাচার্য, ১৯৬৩।

৭. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৬০।

৮. প্রাচীনসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।

৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ।

১০. রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, সম্পাদক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৭৪।

১১. রবীন্দ্রায়ণ (১ম ও ২য় খণ্ড), পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত, ১৩৬৮।

১২. রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (জয়ন্তী উৎসর্গ), অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

১৩. রবীন্দ্র-সমীক্ষা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৬৮ (১ম প্রকাশ)।

১৪. রবীন্দ্ররচনাবলী (সমগ্র), পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮।

১৫. শান্তিনিকেতন (উপদেশমালা, ২য় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সংস্করণ।

১৬. The Religion of Man, Rabindranath Tagore, 1931.

১৭. '____', Rabindranath Tagore, 1949.

The Modern Age and T. S. Eliot

Aniruddha Sarkar*

Abstract:

In this essay the main point of discussion is the beginning of the modern age and how the modern age influenced the authors of that time. There are discussions also about the eminent poets of that time like W. B. Yeats and T. S. Eliot and how they were influenced by this age, their writing styles and their uniqueness. There is a detailed discussion about a particular poetic style T. S. Eliot used in his poetry and how that made him different than the other poets of his time and beyond.

Key Words: Modern, Poets, Eliot, Yeats, Poetry, Allusion, Education

The Modern age officially started from the beginning of the 20th century. The Victorian age ended with the death of Queen Victoria in 1901. The historians might pinpoint these eras with particular dates of historical events, but no one can divide the literary ages as sharp as the history. Though the Victorian age ended in 1901 the "idea and ideals were crumbling down much earlier, possibly form 1880."[1] So the twenty years between 1880 and 1900 can be marked both as the end of the Victorian era and the beginning of the Modern age of English Literature.

During the early 20th century or even in the late 19th century there was a massive development in the modern industrial societies and the cities grew rapidly along with them. That influenced not only the lifestyle of the people of that era but also the philosophical and cultural trends. It had a huge impact on literature especially in English literature. Not only the authors of England but also the authors of the other western countries like America, Scotland, Welsh, and Ireland were influenced by it and made a new type of flow in literature. The literature of this time period is usually called the Modern Literature.

*Researcher, Rabindra Bharati University.

Before this age education was quite unusual. But the Education act 1870 and the act 1902 made education available to everyone. And the youth took the advantage of it. And there was a huge demand of literary works. The "classics" were available before but there came "an entirely new demand for works in 'educational' fields – science,history and travel."[2] The literature offered a better prospect as a profession or as a business. So the authors as well as the publishers took full advantage of it. They produced huge quantity of literary works. They saw the massive amount of profit in this business and started producing works that were compromised for the sake of business. Even the biggest authors of that time could not resist the temptation of these hasty productions.

Along with the increasing education, there came the awakening of the national conscience to the evil which was the result of the industrial revolutionwhich influenced the authors to produce the "problem or discussion play and the novel of social purpose"[3]. For the first time in this era the novels became the dominant part of the English literature and the society. The prose style was more adoptable than poetry, so the dramas, just like the novels, after about a hundred years of insignificant works, became more popular than the poetry. The authors as well as the dramatists of this time used the contemporary social images in their works. Though at the end of this age some of the poetic dramas emerged, the prose remained the chief medium.

As for the literary style of this era, we cannot say there was a particular one. There were several works of different authors which had several individual styles.Almost noneof them had the traditional tone in their works; some even had completely different and innovative styles.Novelists, dramatists and even poets didn't hesitate to experiment freely with their works. And for the first time for many years poetry become the least important form in literary history.

Though the poetry of this era was dominated by prose, some poets left significant marks in the genre of poetry with their experimental signature style. Among them the most important

poets were G. M. Hopkins, Robert Bridges, W. B. Yeats, and T. S. Eliot. Hopkins made his own unique identity in the history of English literature by completely braking away "from both the Victorian elegiac mode as well as the Wordsworthian school of nature poetry."[4] He tried to rebuild the traditional poetic form. Though his best poems were not in a great number but the impact on English literature of those were huge. Two of his best known poems are "Felix Randal" and "Pied Beauty". The theme Robert Bridges used in his poems, like Hopkins, was nature. The main characteristics of his poems were sweetness and gracefulness. He experimented mainly with the meter of the poems. Some of his bestworks include "The Growth of Love", "Poems in Classical Prosody", "Later Poems", "New Verse" etc.

While talking about W. B. Yeats's poems D. Diches said "His Voice is always his own. It is haunting and magical and fascinating and sometimes terrible." His early poems revealed a simple and graceful style. As he got matured he became more skillful. Though his poems still had the delicacy and soft expressions, they had strong characters as well. Yeats did not experiment with the verse forms but he used interesting elements of colloquial conversation in his poems. Some of his finest works of this period were "Wild Swans at Coole", "No Second Troy","The Tower", "Sailing to Byzantium", "Responsibilities" etc. T. S. Eliot on the other hand dealt with complicated subjects in his poems. But this unique style of his works made him undoubtedly one of the most celebrated names in the history of English literature. The most important works that made Eliot famous were "The Waste Land", "The Love Song of J. Alfred Prufrock", "Hollow Men", "Gerontion" etc.

T. S. Eliot was American by birth. He was born in St. Louis, Missouri. Later his family moved to England. He did his schooling in Boston and Harvard University. After that he went to Paris, then to Marburg and Oxford to study Philosophy. He got married after the war began. "In 1927 the daring modern became a British subject, and proclaimed himself 'classicist in literature, royalist in politics, and anglo-catholic in religion'".[5]Eventually he became

really popular after his huge success of “The Waste Land”. He was awarded the Nobel Prize and the Order of Merit in 1948.

T. S. Eliot himself was one of the most if not the most well-read poets in history. And he liked to use allusions in his works, lots and lots of them. He was obsessed with Dante Alighieri, so we can find lots of allusions of Dante’s works in his poems. As he loved Dante, he thought everyone else loved him as much as he did. So when he used the allusions from Dante he did not bother to translate them from the original Italian text. He quoted them as they were. He thought the readers could make out the meaning from Italian as he could. Not only Dante, he also used allusions from “The Bible”, John Milton, William Shakespeare, Roman classical poets like Ovid and even Sanskrit classics.

In his “The Love Song of J. Alfred Prufrock” he began with an allusion. He used Dante, his favorite poet for that. The epigraph of the poem itself is a direct quote from Dante’s “Inferno”. These lines occurred in canto 27 of “Inferno”. The quote tells the story of a man named Guido da Montefeltro, who was suffering in the eighth circle of Inferno or Hell where he met Dante and told his story without knowing the fact that Dante was going to get out of Hell and write about everything and publish it to the world.

There is a reference of an Italian artist Michelangelo. So it seems like he not only alluded to literature, but also to History. He even used this reference more than once in this poem. After that he alluded to Andrew Marvell’s famous poem “To His Coy Mistress”. He actually used this allusion as a contrast to the situation of the speaker in the poem. He told us that the speaker had all the time in his hand to propose to the woman he was with which is completely opposite in the sense Marvell used in his “To his Coy Mistress”. Then he alluded to “Works and Days” by Greek poet Hesiod which is about the importance of working for a living instead of living a lazy and a pointless life. The next allusion he uses is from one of the most famous comedies of William Shakespeare, “Twelfth Night”. There was a phrase “dying fall” in the play which the main character hears in the music playing there. That “dying fall” reminded him of his love for one

of the other characters in the play. Similarly in "The Love Song of J. Alfred Prufrock" the speaker heard the voices "dying" or fading away as the music starts.

He used another allusion from Shakespeare a bit later in this poem. This time it's from a tragedy, "Hamlet". Here Eliot compared Prufrock, not with the main character Hamlet but with one of the minor characters, an attendant who served the king. He also alluded to "The Bible" in this poem. He used the reference of the biblical characters like Lazarus. Eliot's Prufrock compared his task of asking the question he was about to ask the woman he was with to Lazarus coming back from the dead.

In his other famous poem "The Waste Land" Eliot used several other allusions from "The Bible". According to him "The Bible" was an incredible device to understand the sense of life, and people didn't use it as much it should be used. He also alluded to Dante in this poem. He used "Inferno" and "Purgatorio" to set the scene of the poem and to compare it to the modern existence.

Much like Dante Eliot liked to allude to another writer. He is William Shakespeare. In this poem too, he used allusions from several Shakespearean plays like "The Tempest", "Antony and Cleopatra", "Hamlet" and "Coriolanus". He also alluded to the classic poem by John Milton "Paradise Lost", Roman poet Ovid's "Metamorphoses" and "Brihadaranyaka" from Sanskrit classic "Upanishad" among many others in "The Waste Land". There were some historical references like the Battle of Mylae and the Fire Sermon as well in this poem. There was even reference of the nursery rhyme "London Bridge is Falling Down" in "The Waste Land".

In his other poem "The Hollow Men" he also used his favourite literary device, allusion. Here too he used several sources to allude to. The main inspiration of this poem was once again his favourite Italian poet Dante's "Inferno". The poem starts with not one but two epigraphs. They both are allusions. The first epigraph is a direct quote from Joseph Conrad's "Heart of Darkness". The first epigraph reveals that the poem starts after

the death of the "hollow men", people like the character of the novel "Heart of Darkness", Mistah Kurtz. For the second epigraph, Eliot went way back to the Greek Myth. There he alluded to a mythological character Charon, an old and dirty ferryman in underworld who conveyed in his boat the shades of the dead people. He didn't forget to allude to his favourite poet Dante Alighieri here. He used the term "Death's other kingdom", meaning Heaven, exactly the opposite of the setting of this poem, The Inferno or Hell. There's another Dante allusion here in the poem. This time it's from "Paradiso". He used historical and religious references in this poem too. The historical reference he used was in the second epigraph of this poem which he took from an event in 1605, The Guy Fawkes Day and he took the religious reference from The Lord's Prayer. In this poem too Eliot used a nursery rhyme "The Mulberry Bush" as a reference.

So T. S. Eliot was one of the greatest poets in English Literature who with his unique style, hiscomplicated allusions and twisted wordplay created a completely new genre of poetry. Some critics also noted the difficulty of his poems. Even novelist Evelyn Waugh once complained about his poems that they were "marvellously good, but very hard to understand". Whatever the case may be Eliot was and still remains one of the finest poets in the history of English Literature and a perfect example of a Modern Poet.

References:

1. The History of English Literature, KalyannathDutta, Section Three, Page-3

2. History of English Literature, Edward Albert, Page-433

3. History of English Literature, Edward Albert, Page-434

4. Glimpses of the History of English Literature, Dr. AnasuyaGuha, Page-425

5. A History of English Literature, Michael Alexander, Page-346

Ebong Prantik is an International Refereed Multi-Disciplinary Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

http://ebongprantik.wordpress.com

₹ 250/-

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102
Ph : 9804923182, 9332358644
Email : ashis.jibonda.roy@gmail.com